মাইকেল মধুসূদন দত্ত

জীবন ও সাহিত্য

অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্র, এম. এ., পি-এইচ্.-ডি.
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা কবিতার নবজন্ম, বাংলা নাটকের
বিবর্তন প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক

স্টুডেন্ট ওয়েজ
৯, বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৭৭

প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ ওহিদ উল্লাহ্

ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ
বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
কাইয়ুম চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
উদয়ন প্রেস

মুদ্রাকর ঃ
সালেহ্ আহমদ খান
শেলী প্রেস
৮/২, ওয়াইজঘাট রোড, ঢাকা—১

উৎসর্গ

তোমাকে

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর একখানা স্বতন্ত্র বই লেখার বাসনা আমার বহুকালের। এর পূর্বে তাঁর সম্বন্ধে যে কিছু লিখি নি, তা নয়। লিখেছি, তবে সে সব লেখায় কবি ও নাট্যকার-রূপে মধুসূদনের পৃথক পৃথক পরিচয় ছিল। মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্য মিলিয়ে পড়ার আবশ্যকতা আছে। মধুসূদন যে উনিশ শতকের যোগ্যতম প্রতিনিধি, এ বিষয়ে আমার মত অনেকেরই মনে কোন সংশয় নেই।

আজ সেই আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অন্দরমহলে একটু বিশেষভাবে খোঁজখবর করলাম। খোঁজ নিতে গিয়ে সেখানে প্রচণ্ড বিপত্তির সম্মুখীন হলাম। মধু-জীবনীর অনেক তথ্যই সন্দেহমুক্ত নয়। তবু মধু-জীবনীর সকল লেখকের পরিশ্রমের মূল্য আমি স্বীকার করি। সর্বত্র নির্ভরযোগ্য না হলেও তাঁরা নমস্য।

জীবনীলেখক ছিলেন না তিনি, অথচ মধু-জীবনী রচনার জন্য আমরা তাঁরই কাছে সর্বাধিক ঋণী; সেই শ্রেষ্ঠ মাধব্য গৌরদাস বসাকের বন্দনা গেয়ে গ্রন্থ শুরু করলাম।

মধুসূদনের কাব্য ও সাহিত্য উপলব্ধির জন্য যতটুকু ঈপ্সিত, আমি হয়তো তার থেকেও বেশি মধু-জীবন-কথা তুলে ধরলাম, তবে অনেকখানি নতুন করে লিখেছি, এই যা সান্ত্বনা।

মধুসূদনের সাহিত্যসৃষ্টির ভিতরে কাব্য ও নাটকের মত তাঁর গদ্যগ্রন্থের গুরুত্ব আমি স্বীকার করেছি। তাঁর ইংরেজী লেখা (কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ) তাঁর বাংলা লেখার পাশাপাশি নয়, অগ্রবর্তী রূপে আমার কাছে বিবেচিত। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিই যে, তাঁর বাংলা লেখা তাঁর ইংরেজী লেখার ক্রমপরিণতি নয়।

তাঁর ইংরেজী কোন লেখাই আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি নি। এমন কি, তাঁর শিক্ষক জীবনও আমার কাছে অবহেলিত হয় নি; মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর 'ক্লাস-রুটিন' পর্যন্ত কাজে লেগেছে। একবার এক বিজ্ঞ ইংরেজ

গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, সেক্সপীয়রের ধোপা বাড়ির 'বিল' পাওয়া গেলে তাঁর সাহিত্য ব্যাখ্যায় সহায়তা করবে। আমার কাজ কতকটা সেইরকম দাঁড়িয়েছে দেখে বিজ্ঞতর পাঠক কৌতুক বোধ করতে পারেন। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার লক্ষ্য হোল মধুসূদনের শিল্প-ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা, আবিষ্কার করা নয়। (এত বড় মৌলিকতার দাবি সাহিত্যে চলে না।) এই কারণে মধুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত পর্যালোচনা করেছি। জীবনীকারদের ভুল ধরবার জন্য আমার এ প্রয়াস নয়, আমার প্রয়াস মধুকে বোঝবার জন্য।

এই কবির শিল্পধর্মের ব্যাখ্যায় ইউরোপের প্রসঙ্গে অনেকেই মুখর। আজকাল আবার প্রাচ্য প্রসঙ্গ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আমার কাছে ইউরোপ হোল আধুনিকতার সুতিকাগার। ভারতীয়তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। মধুসূদন সর্বতোভাবে আধুনিক।

মধুপ্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলেছি—মধু যেমন বাঙ্গালী, তেমনি ভারতীয়। তাই তাঁর সাহিত্যধর্মের ব্যাখ্যায় দক্ষিণ ভারতীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। মধুসূদন তামিল-তেলেগু জানতেন; ঐ দু'টি ভাষার সাময়িক পত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে রীতিমত তর্ক জুড়ে দিতেন। মধুর শিল্প-প্রতিভা ব্যাখ্যায় আমি দ্রবিড়ী শিল্প-সাহিত্য পরিত্যাজ্য মনে করি নি; তবে দক্ষিণী শিল্প-সাহিত্য অপেক্ষা দক্ষিণের সমুদ্র ও নগর আমার কাছে মধু-ব্যাখ্যায় অধিক প্রয়োজনীয় উপকরণ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্যত্র মধু-প্রসঙ্গে আমি যা লিখেছি, তার সঙ্গে এই সূত্রটি যুক্ত হবে।

আমার একটি সুস্পষ্ট অভিমত যে, উত্তর-পূর্ব ভারতীয় সাহিত্যে মধু হলেন নব্যতার প্রবর্তক। এমন কি বাংলার মসীয়া সাহিত্যেও মধুসূদনের প্রভাবে প্রায় দশখানি কাব্য রচিত হয়েছিল। বিষয়টি সম্পর্কে আমি পরিশিষ্টে বিস্তৃত তথ্য দাখিল করেছি। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে বিস্তৃততর গবেষণার সুযোগ আছে।

বই প্রকাশনার মুহূর্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন একটি প্রচলিত সদাচার। আমি কিন্তু মামুলী সদাচারের বশবর্তী হয়েই তামিলনাড়ু মহাফেজখানার সর্বাধ্যক্ষ শ্রীবদরীনাথ চতুর্বেদী আই. এ. এস. মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি না। তিনি যেভাবে প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, তার নজির মেলা ভার।

এ ছাড়া মাদ্রাজের কান্নেমেরা সাধারণ গ্রন্থাগার, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও তামিলনাডু রাজ্য সদর দপ্তর গ্রন্থাগার থেকেও প্রভুত সাহায্য পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজের বিখ্যাত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান বিন্নী এণ্ড কোম্পানীর অফিসার শ্রীসুশ্যামল নন্দী তাঁর আতিথেয়তা দিয়ে ও যাতায়াতে সহযোগিতা ক'রে আমাকে বাধিত করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীদ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত (সহ-গ্রন্থাগারিক, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা), ডক্টর কাহ্নুচরণ মিশ্র (অধ্যক্ষ, ওড়িয়া বিভাগ, বেরহামপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ওডিস্যা), শ্রীভূপেশরঞ্জন সেনগুপ্ত ও ডঃ বাবু সিংহকে (জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, ইম্ফল, মণিপুর)। এঁরা আমার বন্ধু ; তাই ধন্যবাদের মুখাপেক্ষী নন। শ্রীরামপুর কেরী গ্রন্থাগার, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার, প্রেসিডেন্সী কলেজ গ্রন্থাগার, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ মহাফেজখানা, কলকাতা হাইকোর্ট মহাফেজখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মিদেব জন্যও আমার প্রীতি থাকল।

পুরুলিয়া প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীমান সঞ্জীবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমান অজিতকুমার মিত্র, এম. এ. ও শ্রীমতী সীমা গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে অশেষ সাহায্য করেছেন। শ্রীমান অজিতকুমার পুরুলিয়ার সব কয়টি চিত্র বিনা মূল্যে তুলে দিয়েছেন—শুধুমাত্র মধুসূদনের খাতিরে। বন্ধুবর ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য (অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক শ্রীমান জ্ঞানেশ চন্দ্র মৈত্র, অধ্যাপক শ্রীমান বিশ্বজীবন মজুমদার, অধ্যাপিকা শ্রীমতী প্রতিমা মজুমদার, শ্রীমতী লক্ষ্মী ঘোষ, এম. এ. ও শ্রীমতী পারমিতা মৈত্র নানা সময়ে নানা বই সংগ্রহ ক'রে দিয়ে আমার পরিশ্রম বাঁচিয়েছেন। এ যুগের বিশিষ্ট মধু-গবেষক হলেন চতুষ্কোণ সম্পাদক শ্রীঅরুণকুমার রায়, শ্রীসুরেশ প্রসাদ নিয়োগী, অধ্যাপক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহ্সান ও ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। এঁদের গবেষণা থেকে আমি প্রেরণা পেয়েছি।

গ্রন্থে এবারও অনেকগুলি মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল। অপর কেউ দায়ী নন, দায়ী এই লেখক। আমার হস্তলিপি আমার ভাগ্যলিপির মতই দুষ্পাঠ্য শুধু নয়, অপাঠ্য। তার আর কোন সংশোধনের উপায় নেই। তবে একটা ভরসা আছে—বিষয় হোল মধুসূদন সম্বন্ধীয়। তাই সব প্রমাদ-পিপীলিকা

অগ্রাহ্য হয়ে যাবে মধুর আকর্ষণে। একটি ভুল তবু কবুল ক'রে রাখি। ৮৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের গ্রন্থটির নাম হোল 'মাইকেল জীবনীর আদিপর্ব', 'মাইকেল মধুসূদনের বাল্যজীবন' নয়। প্রকাশকবন্ধু শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাহা গ্রন্থখানিকে সজ্জিত করতে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। মধুসূদন তাঁকে কিয়ৎক্ষণের জন্যও অন্তত মধুমত্ত করে রাখুন, এই প্রার্থনা। ইতি,

বিনীত
সুরেশচন্দ্র মৈত্র

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জীবনীর জীবনী	১-১৬
চরিত-সাহিত্য ও চরিতকার—১-২ ; মধু-জীবন ও মধু-জীবনী —৩-৬ ; যোগীন্দ্রনাথ বসু—'মাইকেল মধুসূদনদত্তের জীবন-চরিত'—৬-৮ ; নগেন্দ্রনাথসোম—'মধু-স্মৃতি'—৮ ; শশাঙ্ক মোহন সেন—৮-১০ ; মোহিতলাল মজুমদার—১০-১১ ; প্রমথনাথ বিশী—১১-১২ ; নীরেন্দ্রনাথ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি—১২ ; মাইকেল-জীবনী রচনার সমস্যা—১২-১৬।	
প্রথম অধ্যায় : সাগরদাঁড়ি : শৈশব জীবন	১৭-২৭
জন্মস্থান—১৭-১৮ ; পিতৃকুল পরিচয় ও পরিবার—১৮-২১ ; বাল্যশিক্ষা—২১-২৪ , কলকাতা আগমন—২৪ ; কলকাতা ও সাগরদাঁড়ি—২৫-২৭।	
দ্বিতীয় অধ্যায় : উদ্ভবের কাল : কলকাতা	২৮-৮৮
খিদিরপুরের গৃহ—২৮-২৯ ; খিদিরপুরের ইংরেজী স্কুল : গ্র্যামার স্কুল ও মধুসূদন—২৯-৩১ ; হিন্দু কলেজে ভর্তির তারিখ—৩১-৩৩ ; ব্রজেন্দ্রবাবু ও 'দুই-মধুসূদন সমস্যা'—৩২-৩৩ ; বন্ধুদের সাক্ষ্য—৩৩-৩৪ ; কলকাতার তিন শিক্ষক—ড্রামণ্ড, ডিরোজিও ও রিচার্ডসন ; হিন্দুকলেজে মধুসূদনের শিক্ষাকাল ও ছাত্রজীবন—৩৫-৪০ ; সাহিত্য-চর্চার সূচনা—৪০-৪৯ ; লিটরারী গ্লীনারে মধুর কবিতা—৪৩ ; মধুর সাজসজ্জা—৪৯-৫০ সেযুগে সমাজবিধি ও মদ্যপান—৫১-৫২ ; তমলুক যাত্রা—৫৪-৫৫ ; বিলাত গমনের সঙ্কল্প—৫৭-৫৮ ; বিবাহের প্রস্তাব —৬০-৬২ ; মধুর ধর্মান্তর গ্রহণে নারীপ্রসঙ্গ : গৌরদাস বসাক,	

বিষয় পৃষ্ঠা

নগেন্দ্রনাথ সোম ও বনফুল—৬০-৬৭; মধুর দীক্ষা লাভ—৬৭-৭০; মধুর প্রার্থনাসঙ্গীত—৭০; মধুর ধর্মান্তর গ্রহণ ও খ্রীষ্টীয় পত্রিকা—৭১-৭২, সেক্সপীয়ার পাঠ গ্রহণ—৭৩; হিন্দু কলেজ ও ধর্মান্তরিত ছাত্র—৭৪, বিশপস্ কলেজে মধু—৭৬-৮৫।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রস্ফুটনের ঋতু ৮৯-১৪৮

কলকাতা ত্যাগ—৮৯-৯০; মাদ্রাজে আগমন—৯০; মাদ্রাজ মেল অরফ্যান এ্যাসাইলাম—৯১-৯২; মাদ্রাজ সার্কুলেটারে কবিতা প্রকাশ—৯৩-৯৪; রেবেকা ম্যাকটাভিচ্ ও মধুসূদন: কবিতার নতুন প্রেরণা—৯৪-৯৬; মাদ্রাজের কবিতা ও বাংলাদেশ—৯৬-৯৭; ক্যাপটিব লেডি—৯৮-১০০; রেবেকার সঙ্গে বিবাহ—১০০-১০১; মধু ও জর্জ নর্টন—১০২; সাংবাদিক মধুসূদন—১০৩-১০৯; মাদ্রাজে স্থানীয় ও বিদেশীয় নেতৃবৃন্দ—গজালু লক্ষ্মীনরসু চেট্টি ও বেঙ্কট্র রয়লু নাইডু, জর্জ ব্রুস নর্টন, মিঃ অক্টরলনী, জর্জ নর্টন, হেনরি মীড, মিঃ নেলর ও মিঃ কেনরিক—১০৩-১০৮; ইউরেশিয়ান পত্রিকা ও মধুসূদন—১০৮-১০৯; ক্যাপটিব লেডি ও কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ—১০৯-১১৪; ভিশন্‌স অব দি পাস্ট ও অন্যান্য কবিতা—১১৫-১১৬; প্রথম সন্তানের জন্ম—১১৬; ইউরেশিয়ান পত্রিকায় রিজিয়া নাট্যকাব্য প্রকাশনা—১১৬-১১৮; মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে চাকুরী—১১৮; হিন্দু ক্রনিকল ও মধুসূদন—১২০-১২৮; মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির কার্যকাল ও বিদায় গ্রহণ—১১৮-১৩২; আবার সাংবাদিকতা—১৩২-১৩৫; গৌরদাসের সঙ্গে যোগাযোগ, পিতার মৃত্যু খবর, কলকাতা-যাত্রার উদ্যোগ, 'এ্যাংলো-স্যাক্সন এণ্ড দি হিন্দু' রচনা—মধুসূদনের ধর্মমত—রেবেকা ও মধুসূদন—১৩৬-১৪১।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মাধুর্যের কাল ১৪৯-২১৩

মধুর কলকাতা প্রত্যাবর্তন ও হেনরিয়েটা প্রসঙ্গ—১৪৯-১৫৮; কলকাতায় চাকুরী—১৫৮-১৬১; রত্নাবলী নাটক অনুবাদ—

বিষয় পৃষ্ঠা

১৬১ ; শর্মিষ্ঠা—১৬২-১৬৬ ; পদ্মাবতী—১৬৬-১৭০ ; কৃষ্ণকুমারী—১৭০-১৭৪ ; তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—১৭৪-১৮৫ ; মেঘনাদবধ কাব্য—১৮৫-১৮৬ ; মেঘনাদবধ কাব্য ও উনিশ শতক—১৮৬-১৮৯ ; পুরাণ ও মেঘনাদবধ কাব্য—১৮৯-১৯০ ; রেনেসাঁস-পূর্ব মহাকাব্য ও রেনেসাঁস-উত্তর মহাকাব্য—১৯০-১৯১ ; নায়ক-কল্পনা—১৯২-১৯৩, লংকা ও রাবণ—১৯৩-১৯৪ ; দ্রবিড়ী শিল্প ও মেঘনাদবধ কাব্য—১৯৪-১৯৮ ; সমুদ্র, মেঘনাদবধ কাব্য ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ—১৯৮-২০০ ; অলংকার ও মেঘনাদবধ কাব্য—২০২-২০৪ ; মেঘনাদবধ কাব্য থেকে বীরাঙ্গনা কাব্য—২০৪-২০৫ ; প্রমীলা ও অন্যান্য নারী-চরিত্র—২০৫-২০৬ ; বীরাঙ্গনা কাব্যের নারী-চরিত্র—২০৬-২০৭ ; মধুসূদনের সাহিত্য-সাধনা ও ভারতীয় সাহিত্য—২০৭-২১০ ; কবির বিষয়-জীবনে পরিবর্তন ও বিলাত যাত্রার সিদ্ধান্ত—২১০-২১২ ।

পঞ্চম অধ্যায় : আশার ছলনে ভুলি ২১৪-২৩৭

বিলাত যাত্রা—২১৫ ; গ্রে'জ ইনে মধুসূদন—২১৬ ; আর্থিক অনিশ্চয়তা ও কলকাতা—২১৮-২২০ ; মধুসূদন, মনোমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথ—২২২-২২৬ ; ফ্রান্সে মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর—২২৬-২২৮ ; মধুসূদন ও গৌরদাস—২২৮-২৩০ ; চতুর্দশপদী কবিতাবলী—২৩১-২৩৫ ; রূপক কবিতা—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও সুভদ্রাহরণ—২৩৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : চাক ভাঙার কাল ২৩৮-২৭৪

গ্রে'জ ইনে মধুসূদন ও ব্যারিস্টারী সনদ লাভ—২৩৮ ; কলকাতা যাত্রা—২৩৮-২৩৯ ; হাইকোর্টে প্রবেশ—২৩৯-২৪১ ; মাইকেলের অর্থাভাব ও তাঁর প্রকৃতি—২৪১-২৪৮ ; ব্যারিস্টারী ত্যাগ ও চাকুরী গ্রহণ—২৪৯-২৫০ ; ঢাকায় মধুসূদন—২৫০-২৫১ ; হেক্টর বধ প্রকাশ—২৫২-২৫৫ ; পুরুলিয়া গমন—২৫৫-২৫৬ ; পুরুলিয়া খ্রীস্টীয় মিশনে সংবর্ধনা—২৫৭-২৫৮ ; কলকাতায়

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রত্যাবর্তন—২৬০, পঞ্চকোটের আমন্ত্রণ ও চাকুরী গ্রহণ—২৬১; কাশীপুরে গমন ও কাশীপুর থেকে বিদায়—২৬১-২৬৫; আবার কলকাতায় আগমন ও মায়া কানন রচনা—২৬৫-২৬৮; মায়াকানন ও পঞ্চকোট—২৬৮-২৬৯; জীবনের শেষ অঙ্ক: উত্তরপাড়া—কলকাতা-জেনারেল হসপিটাল। হেনরিয়েটার মৃত্যু ও কবির চিরনিদ্রা—২৭০-২৭৩।

পরিশিষ্ট ২৭৫-২৮৮

১. মাদ্রাজ ক্যাথিড্রাল মিশনের পত্র।
২. মাইকেল মধুসূদনের একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ—**Mussulmans in India.**
৩. উত্তর-পূর্বভারতীয় সাহিত্য ও মধুসূদন।
৪. রাজকুমারী চন্দ্রকুমারী রচিত ভানুগান।

নির্ঘণ্ট ২৮৯-২৯৪

চিত্রসূচী

		পৃষ্ঠা
১.	কবির প্রতিকৃতি	১
২.	কবির হস্তলিপি	৩
৩.	বিশপ্স্ কলেজ রেজিস্টারে মধুসূদন	৭৭
৪.	মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির পরিচালক সভা : শিক্ষকমণ্ডলী : মধুসূদন	১১৯
৫.	মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে মধুসূদনের 'ক্লাশ-রুটিন'	১২৯
৬.	বিলাত যাত্রার প্রাকালে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের পত্রের একাংশ	২১২
৭.	মধুসূদনের পিতৃসম্পত্তি বিক্রয়ের দলিলের প্রতিলিপি	২৪৪
৮.	পুরুলিয়ার জার্মান লুথেরীয় চার্চ-ভবন	২৫৭
৯.	পুরুলিয়ার গির্জায় 'গড ফাদার' মধুসূদন	২৫৮



জীবনীর জীবনী

॥ ১ ॥

পুরানো চরিতগ্রন্থের প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করি। অধ্যাপক ম্যাসন, রসেটি, টমাস মুর ও বঙ্কিম-লিখিত বিভিন্ন কবিদের জীবনী আমরা ছাত্রজীবন থেকেই পড়ছি। আগ্রহের সঙ্গেই পড়ছি। আগ্রহ যে শুধু বীরপূজায় শেষ হয়েছে, কবিকে কোথাও খুঁজে পাই নি, এমন কথা বলব না। যেটুকু পাই নি, সেটুকু পাওয়া যায় না বলেই কবিমহাশয়েরা কবি, মহাপুরুষ নন। কাব্যের মত কবি-জীবনীর কিছু অপ্রকাশিত এলাকা থাকে, অনুমানের অঙ্গন থাকে। আর তা ছাড়া, এক এক যুগ কবির কাব্যকে এক এক চোখে দেখে, এক এক মর্মে মর্মরিত করে। কাব্য যদি যুগ-ভেদে ভিন্ন অর্থে মর্মরিত না হোত, তা হলে তার কাব্য-মূল্য কি কিছু অবশিষ্ট থাকতো? একই প্রশ্ন কবি-জীবন সম্বন্ধেও উত্থাপিত হতে পারে।

অধ্যাপক ম্যাসন ও অধ্যাপক টিলিয়ার্ড এক কবিকে নিয়ে দুই পৃথক জাতের বই লিখেছিলেন; ক্রিস্টোফার ওয়ার্ডসওয়ার্থের আর কবি-সমালোচক হার্বার্ট রীডের ওয়ার্ডসওয়ার্থ-জীবনী দু'খানি একেবারে ভিন্ন আমেজের বই। কিন্তু আমরা বিভ্রান্ত হই না। বরং এই দ্বিবিধ আলাপন কাব্য-রসাস্বাদনে সহযোগিতা করে।

নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনে নতুন নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়, আবিষ্কৃত হয়, বা অবজ্ঞাত তথ্য মূল্যবান বিবেচিত হয়। এক যুগের সমালোচক যে-তথ্যের উল্লেখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন নি, আর এক যুগের সমালোচক তাকে অত্যন্ত জরুরী বলে সাব্যস্ত করেন।

কাব্যের মত কবির জীবনীও বহুরূপী। যিনি অবিচলিত থাকেন, তিনি বিচলিত হবার মত এবং বিচলিত করার মত কোন গুণের অধিকারী নন। যে-কাব্যের অর্থ যুগ-পরিবর্তনে পাল্টায় না, সে কাব্যের প্রাণশক্তি সম্বন্ধে (কাব্যমূল্য সম্বন্ধেও) সন্দেহ করতে হবে বৈকি। বাঁচার অর্থই পরিবর্তন, জীবনের অর্থই সঞ্চরণশীলতা। কথাটা জড়প্রকৃতির ক্ষেত্রে যতখানি সত্য, মানব-জগৎ ও কাব্য-জগতের ক্ষেত্রে ততটা সত্য।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে কবিকুলের কোন জীবনী ছিল না, জীবনী ছিল মহাজনদের। তাকে বলত 'Hagiography'। এই কারণে প্রশ্ন ওঠে যে, চণ্ডীদাস এক না তিন। কৃত্তিবাস নিজে তাঁর কাব্য লিখেছেন, না হাজার কবি তাঁর নামে তুলোট কাগজ ভরে তুলেছেন। প্রাক্-আধুনিক কাব্যে কবির মানবত্ব তত ফুটত না ; তাই কবির জীবনী লেখার তেমন প্রয়োজন দেখা দেয় নি। ব্যক্তিরই কেবল জীবনী লেখা হয় ; দেবতা বা অপদেবতার নয়।

মঙ্গলকাব্য বা জীবনী-কাব্যে কবিরা কেউ হাজিরা দেন না, সেখানে আছেন কে কত শাক্ত, বৈষ্ণব বা শৈব। চর্যাগীতিকার ভণিতায় সিদ্ধাচার্য-দের নাম আছে, কবিতার শরীরে নেই। সব কবিই সিদ্ধ আচার্য, কেউ শুদ্ধ কবি নন।

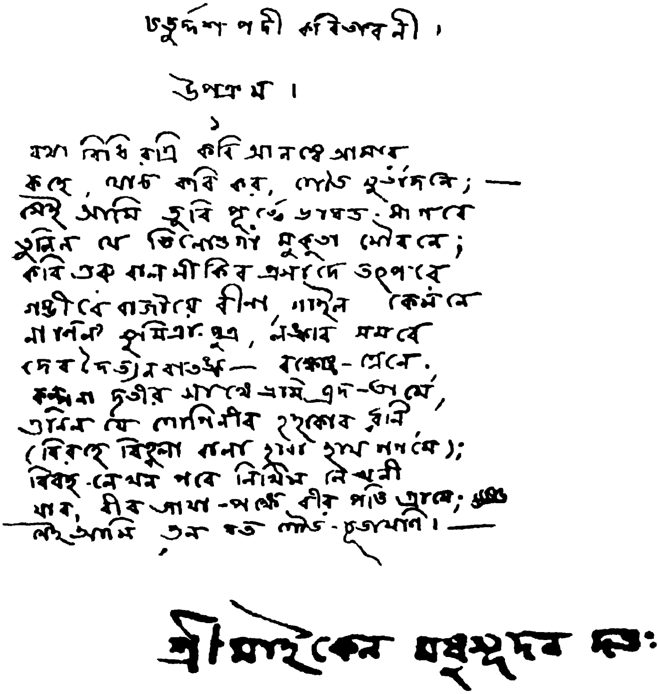
গীতিকাব্যে শাক্ত বা বৈষ্ণব এইসব বেশে কবিরা আছেন, স্ববেশে কেউ উপস্থিত নেই।

ভারতচন্দ্রের পর বাংলা কাব্যের প্রকৃতি বদলে গেছে। তাই বাংলা কাব্য-ব্যাখ্যার প্রকৃতিও বদলে যাচ্ছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত কবির কাব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক অনাবশ্যক কালহরণ না করে সোজা একেবারে অন্দর-মহলে প্রবেশ করেছেন—যেখানে দুর্গামণি কুরূপা, যেখানে দুর্গামণি অল্পবুদ্ধিসম্পন্না, যেখানে ঈশ্বরচন্দ্র প্রাক্-বিবাহকালে অন্য নারীকে পছন্দ করেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের নারী-বিরূপতা তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রবণতার অন্তরপট (শুধু প্রেক্ষাপট নয়)। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অতীব প্রত্যক্ষ-বাদী কবি।

কিছুকাল পূর্বে জনৈক অধ্যাপক-গবেষক রবীন্দ্রকাব্য বুঝবার জন্য রবীন্দ্র-জীবনীব স্বল্পালোকিত মহলে দৃষ্টি ফেলেছিলেন, যা সরকারী জীবনীতে কেবল উল্লিখিত, বিশদীকৃত নয়। অধ্যাপক মহাশয়ের গবেষণায় রবীন্দ্রকাব্যের নতুন তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয় নি, একথা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্য প্রসঙ্গে আমাদের যে-কৌতূহল তার পিছনে রয়েছে কবিকে চিনবার এবং তাঁর কাব্যকে বুঝবার আন্তরিক ইচ্ছা, গোয়েন্দা-সাহিত্যের নতুন পৃষ্ঠা যোজনার ইচ্ছা নয়।

কবিকে তাঁর কাব্যে নিশ্চিতই পাই, কিন্তু জীবনীতেও জীবন্মৃত নন।

(কবির হস্তলিপি)


চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

উপক্রম।

১

যথা বিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে
কহে, জোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে; —
সেই আমি ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে
তুলিল যে তিলোত্তমা মুকুতা যৌবনে;
কবি গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে
দেবদৈত্যনরাতঙ্ক — রক্ষেন্দ্র-নন্দনে.
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে,
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে);
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি গ্রামে;
সেই আমি শুন যত গৌড়-চূড়ামণি। —

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তঃ

॥ ২ ॥

মধুসূদনের কাব্যব্যাখ্যায় মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-পঞ্জীর খোঁজ করা দরকার।

যশোহরের বিদ্রোহী রাজা প্রতাপাদিত্যের মত মধুসূদন বহু জনের যশ হরণ করে যশস্বী হয়েছেন। তিনি বহু-আলোচিত কবি। ভারতচন্দ্রের পর তিনি বাংলা কাব্যে সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী নায়ক; ভারতচন্দ্রের কাব্যের যেমন বহু অনুকরণ, ও অনুসরণ দেখা যায়, মধুসূদনেরও তেমন। এক অর্থে ভারতচন্দ্র থেকেও তিনি বড; কারণ সচেতনভাবে তিনি প্রথম পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন।

এতকাল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা কাব্যমঞ্চ দখল করে বসে ছিলেন। মধুসূদন তাঁকে বিন্দুমাত্র আমল দেন নি; মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদা দেন নি; যদিও কবিবৃদ্ধের মৃত্যু হলে এক চিঠিতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং একটি সনেট লিখে পিঠ তাঁর চাপড়ে দিয়েছেন—'আছিলে রাখালরাজ কাব্য-ব্রজধামে।' রাখালরাজ যাঁদের চরাতেন, তাঁদের নাম উল্লেখ করাও তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নি। রঙ্গলাল ছিলেন তাঁর সমসাময়িক; কিন্তু রঙ্গলালের কবি-যশঃ প্রাপ্তিতে আদৌ ঈর্ষান্বিত হন নি—রঙ্গলাল-যে তাঁর মাকে 'মা' বলে ডাকেন।

মাইকেল বাংলা সাহিত্যের স্বল্পতম কালখণ্ডের কবি। এই স্বল্পকালে তিনি ছিলেন একেশ্বর। তিনি বাংলার সাহিত্য-জীবনে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করেছিলেন।

মধুসূদনের পরে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। মধুর জীবদ্দশায় বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি উপন্যাস বেরিয়েছে; মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হোল। বঙ্কিম তখন কেবল শিল্পী, তত্ত্ববিদ্ নন। তাঁর সাহিত্য তখন শুধু সুন্দরের পাদপীঠ; সাধকের পঞ্চমুণ্ডী নয়। 'বঙ্গদর্শনে' শেষ প্রস্তাব লিখতে গিয়ে বা 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ সাহিত্য-পরিক্রমা করতে গিয়ে বঙ্কিম স্বীকার করেছিলেন, মধুসূদন নতুন যুগের প্রবর্তক; বলেছেন, তিনি জাতীয় সাহিত্যের স্রষ্টা। এই মূল্যায়ন বারবার স্মরণযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'তে মধুসূদন আছেন, স-শরীরে নেই, স্ব-ভাবে আছেন। ভাষায় আছেন, বিষয়ের রূপায়ণে আছেন, সাহিত্যবোধে সর্বাধিক আছেন। কখনও 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য',

কখনও 'মেঘনাদবধ কাব্য', বা কখনও 'বীরাঙ্গনাকাব্য' থেকে আনীত কারুণ্য বা প্রসন্নতা সেখানে কার্যকরী। কখনও 'পদ্মাবতী' বা 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক-দ্বয়ের বাক্-চাতুরী সেখানে প্রতিধ্বনিত। জগৎসিংহ-মানসিংহের পিতা-পুত্রের শালীন সম্পর্ক রাবণ-ইন্দ্রজিতের ভব্য উদাহরণে পুষ্ট, স্বধর্মনিষ্ঠ অথচ বিশ্বাস-ঘাতক পশুপতির আচরণে বিভীষণের গোপন পরামর্শ আছে, কপালকুণ্ডলার সংসার-বিবিক্তিতে অন্যতমা বীরাঙ্গনা জাহ্নবীদেবী আছেন, পদ্মাবতী বা মতিবিবির রূপ-বর্ণনায় তিলোত্তমা-সম্ভবের ভারত-বিরোধী রীতির ছাপ আছে। বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'সীতার বনবাস' বা 'শকুন্তলা'য় মানব-জীবনেব এই সজীবতা ছিল না। অনুবাদ বা অনুসরণ-সাহিত্যে জীবনের মৌলিক ও বাস্তব দিকের প্রবেশ-অনুমতি থাকে না। বিদ্যাসাগবের রচনায় তিনি শিল্পী হিসাবে কি চাইছেন, তার স্বাক্ষর নেই। তাঁব সব রচনাই হোল পবের সন্তানকে স্তন্য দানে পুষ্ট করে তোলার ইতিবৃত্ত। বরং স্বাক্ষরহীন পুস্তিকায় তাঁর ব্যক্তি-স্বরূপ বেশি উদ্ঘাটিত। উত্তপ্ত রচনায় যুক্তি-তর্কের খই ফুটলেও ফুটতে পারে, শিল্পের কুসুম ফোটে না। বিদ্যাসাগর তাই শেষ পর্যন্ত কারুশিল্পী, শিল্পী নন।

সমাজ-জীবনের মত তিনি ভাষা-জীবনের সংস্কারক। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে শ্রদ্ধার পুষ্পার্ঘ্য সদা বর্ষিত। শিল্পীর জন্য শ্রদ্ধার ফুল চাই না, চাই ফুলদোলের ফুল।

প্যারীচাঁদ বাংলা গদ্য-রীতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন; এবং কথাসাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছেন। তিনি জীবন্ত মানুষের গল্প শুনিয়েছেন, কিন্তু তারা সবাই তাঁর কালের মানুষ, ভবিষ্যতের মানুষ নয়। তারা সকলেই সে-কালের মুৎসুদ্দী-বেনিয়ান অধ্যুষিত সমাজের কুশীলব; নিবাস গঙ্গাতীরবর্তী কলকাতার সন্নিহিত অঞ্চলে। বাবুরাম বাবু আর তাঁর পুত্র মতিলাল সমসাময়িক মতির প্রতিনিধি। শুধু ঠক্চাচা তাঁর কালেরও বটে, বিগত-কালেরও বটে। ঠক্চাচা উনিশ শতকের ভাঁড়ু দত্ত। কিন্তু ওঁরা কেউ ভবিষ্যতের জনপ্রতিনিধি নয়। ফলে প্যারীচাঁদ তাঁর কালের যথার্থ কথাকার নন, তিনি কালের সংবাদবাহী। মধুসূদনের নরনারী যতটা সমসাময়িক, ততটাই ভবিষ্যৎমুখীন। মধুসূদন নব্য সাহিত্যের প্রথম শিল্পী। তাঁর শিল্পের মতই তাঁর ব্যক্তি-জীবনও নিতান্ত কালবন্দী নয়, তিনি ভবিষ্যতের অভিযাত্রী। তাঁর বহু কার্যকলাপ বহু আচরণ সমসাময়িক যুগের

কাছে উচ্ছৃঙ্খলতা বলে বিবেচিত হয়েছিল, আজ সেগুলি স্বাভাবিক ও সাধারণ আচরণ। মধুসূদনের জীবন জীবন্ত নদীর মত বাঁকে বাঁকে বঙ্কিম, এবং তাই এক বাঁকের লোক অন্য বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। মাদ্রাজের রেবেকা কলকাতায় অনাবশ্যক।

এমন লোকের জীবনী লেখার আকর্ষণ আছে, কিন্তু বিপদ কম নয়। মধুসূদন প্রথম আত্মসচেতন ব্যক্তি। বিদ্যাসাগরের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রখরভাবে দেখা দিয়েছিল; কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় তিনি আত্মকামনায় মগ্ন থাকতেন না। বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র কাজের কথায় ভরা, মধুর চিঠি আত্মকথায় ঠাসা। তিনি যে-আত্মজীবনী লেখেন নি, তাতে কোন ক্ষতি হয় নি; কারণ তাঁর চিঠিপত্রই তাঁর অ-বিঘোষিত আত্মজীবনী। বিদ্যাসাগরের আত্মচরিতও আত্মজীবনী নয়।

"গৌরদাস, তুমি আমার জীবনী লিখবে, কারণ আমি ত একজন মহাকবি হবই।" ছাত্র-জীবনেই এই ফরমাজ তিনি দিয়েছেন। মধ্যবয়সে গৌরদাস লিখেছেন, "এখন আমি বলতে চাই যে আমি তোমার জীবনী লেখার জন্য আগ্রহী। তবে এখন আমি ছোট্ট একটা নিবন্ধ লিখব, কারণ কোন মানুষেরই জীবনী—তা তিনি যত বড়ই হোন না কেন, তাঁর জীবৎকালে লেখা যায় না। (আহা! আমি তোমার মৃত্যু-কামনা করছি, একথা ভেবো না!) কিন্তু তুমি অবশিষ্ট ব্যাপারটা জানো। আমি তোমার বাল্য-জীবন, জন্ম-তারিখ, পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু খুঁটিনাটি বিবরণ চাই। তোমার সুবিধামত চটপট এগুলি আমাকে জানাবে কি? আমার অনুরোধ শীঘ্রি জানাও।" গৌবদাস সে-জীবনী আর লিখে উঠতে পারেন নি, শুধু অবকাশের অভাব এর জন্য দায়ী, তা মনে হয় না। মধুসূদনের বিশ্বস্ত জীবনী সে-যুগের পাঠক সহ্য করতে পারত না। (আজই কি পারে?) মধু-জীবনীর প্রয়োজনীয় তথ্য তিনিই সরবরাহ করেছেন। পরম প্রীতিবশত তিনি তাঁর পরলোকগত বন্ধুর নানা বয়সের লেখা চিঠি, কবিতাদি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। তবু জীবনীকারদের হাতে মধুর লেখা সব চিঠিপত্র তিনি তুলে দেন নি বলে আমরা মনে করি। মাদ্রাজ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে লেখা মধুর প্রথম চিঠিখানি আমরা পেয়েছি, দ্বিতীয় চিঠি আমরা পাই নি; সে চিঠির গুরুত্ব অনন্যসাধারণ। গৌরদাস তাঁর কালকে জানতেন, তাই সে চিঠি প্রকাশ করেন নি; গৌরদাস তাঁর বন্ধুকে আরও বেশি জানতেন; তাই তিনি সে চিঠি প্রকাশ করেন নি।

মধুর জীবনী গৌরদাস লেখেন নি; মধুর জীবৎকালে প্রসন্নকুমার ঘোষ একটি ছোট্ট জীবনী লিখেছেন, অনেকটা ইংরেজীতে যাকে বলে 'Advertisement', সেই ধরনের লেখা। পাছে ভবিষ্যৎ বংশীয় হিন্দুরা মনে করে যে, "নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন ;"—তাই বোধ করি কাব্যের সঙ্গে ঐ জীবনী-সংযোজনার প্রয়োজন হয়।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে শোক-সংবাদ বা obituary বেরিয়েছে, তাতেও তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সত্যকাব জীবন-চরিত রচিত হয় তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বৎসর পরে। তারপব থেকে তাঁর জীবন সম্বন্ধে (তাঁর কাব্য নিরপেক্ষ নয়) একটা কৌতূহল পাঠকসাধারণের মধ্যে কোনসময়ই শুকিয়ে যায় নি।

মাইকেল-জীবনী বহু ব্যাখ্যার অধীন। তাঁর চরিত্রে নানা গুণের সমাবেশ ঘটেছে—সর্বজন একই ভাবে তার সমজদার হতে পারে না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অধীন যে চরিত্র, তার ভুল ব্যাখ্যাও সহজ। মাইকেল যেমন শান্ত, তেমনি অস্থির। যেমন প্রাণ-খোলা, তেমনি বিষয় বিশেষে একেবারে নির্বাক ; যেমন বেহিসাবী, তেমনি অত্যন্ত হিসাব দক্ষ, পুরুলিয়ার রাজকার্যে তার প্রমাণ।

মধুসূদন কবতক্ষতীরে জন্মেছেন, তিনি সমুদ্র-স্নাত। তাই তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত বিপরীত মূল্যায়নে বিপর্যস্ত।

বিপর্যস্ত বৃত্তান্তকে পর্যস্ত করা অবশ্য কৌশুলির কাজ, জীবনীকারের নয়।

॥ ৩ ॥

অন্ধ সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' কবির প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী।

১৮৭৩ সনে কবির পরলোক প্রাপ্তি ঘটে; আর ১৮৯৩ সনে যোগীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাধারণত কুড়ি বৎসরের ব্যবধান একটা বড় ব্যবধান নয়। কিন্তু পরাধীন দেশে সমাজ-জীবনের বিকাশ স্বাভাবিক নয়।

১৮৭৩ সনে অসবর্ণ বিবাহ বিল উপলক্ষ করে হিন্দু সমাজে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল—ফলে ব্রাহ্ম সমাজ দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল ; আদি ও নবীন দল। মাইকেল-বন্ধু স্বয়ং রাজনারায়ণ 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নিয়ে বক্তৃতা করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'প্রচারে' নেমে এলেন। শশধর তর্কচূড়ামণি, ও বঙ্গবাসী-গোষ্ঠী সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করলেন।

বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির বিরুদ্ধে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের বড় অংশ কলম ধরল; সভা-সমিতিতে বক্তৃতার তুফান তুলল। বাংলাদেশে একটা পিছু-টানের হাওয়া প্রবলবেগে বইতে লাগল।

এমন সময় এলো কালা কানুন (Black Act); দেশীয় জজদের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার অধিকার-সংক্রান্ত আইন। সাদা চামড়ার আপত্তি দেখে দেশীয়রাও কলরব করে উঠল। ইতিপূর্বে শিক্ষা প্রসারে শিক্ষিত দেশীয়দের মধ্যে বেকারের সংখ্যা দেখা দিয়েছিল। যাঁরা কর্মরত ছিলেন, তাঁদের চাকুরীও সম্মানজনক ছিল না। কালা কানুন দেশীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগাল। এই বিরোধী মনোভাব থেকে জাতি-বৈরের সূচনা হোল। হিন্দুদের মধ্যে রক্ষণশীলতা বাড়ল, হিন্দুয়ানীর প্রতি অনুরাগ দেখা দিতে লাগল। "1880 to 1890 was marked by a strong current of revival and social reaction which positively set back the movement of progress not only in Bengal but all over India."[১]

বিপিনচন্দ্র আরও বলেছেন, "Even Shivanath Shastri had commenced slowly and imperceptibly to shed his earlier rationalism."[২] কথাটা সত্য না-ও হতে পারে, কিন্তু মেজাজটা লক্ষ করবার।

এই বিশেষ পরিবেশেই মধুসূদনের প্রথম জীবনী রচিত হয়। ফলে যুক্তিবাদ-শূন্য জাতিপ্রেম ও ধর্মনিষ্ঠার কবলে পড়ে মধুসূদন প্রতি পৃষ্ঠায় ভর্ৎসিত হলেন। হিন্দুধর্মকে আশ্রয় করে থাকার জন্য যে-সব অপরাধ থেকে অনেকে ছাড়্ পেয়ে গেছেন, তার জন্য মধুসূদনের উপর সমালোচনার দণ্ড নেমে এল। না হলে যোগেন্দ্রনাথ বসুর মত জ্ঞানী লেখক কি করে এত বড় অলীক অভিযোগ উত্থাপন করলেন—"ইংরেজী সাহিত্যের প্রবেশে আমরা যে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, শৈশব হইতে নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজী সাহিত্যের অনুশীলনে আমরা জাতীয়তা বিসর্জন দিতে বসিয়াছি। মধুসূদনের ন্যায় আরও কত প্রতিভাবান পুরুষের জীবন ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। হিন্দুজাতির 'জাতীয়তা

ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে কেবলই ইংরেজী ভাষায় অনুশীলন করিলে চলিবে না। সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও অনুশীলন করিতে হইবে।"[৭]

যে-বিদ্যার অভাবের জন্য মধুসূদনের রচনায় লেখক জাতীয় ভাবের অভাব দেখেছেন, সে বিদ্যা মধুর কতখানি আয়ত্ত ছিল এ খবর তাঁর না জানবার কথা নয়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপর মধুর অধিকার অতি-পুরাতন ঘটনা। বিশপস্ কলেজে তিনি সংস্কৃত শিখেছেন, মাদ্রাজে তিনি মাতৃ-ভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগের অভিপ্রায়ে নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত শিখেছিলেন। এ সব কথা যে যোগীন্দ্রনাথ জানতেন না, তা নয়। তবু এ ভুল করেছেন কেন? সমসাময়িক ধুলোঝড় তাঁর চক্ষুপীড়ার কারণ।

যোগীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বহু বন্ধুর সংস্পর্শে এসে এমন বহু তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন, যা আর পরবর্তী কালে সংগ্রহ করা সম্ভব হোত না। তাঁর গ্রন্থ তাই একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে।

অপর পক্ষে নগেন্দ্রনাথ সোম গ্রন্থ রচনা করেছেন নিছক মধু-প্রেমে মত্ত হয়ে। তিনি বিচারক নন, শুধুই অনুরাগী পাঠক।

তাঁর গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে ১৯১৬ সনে। তখন হিন্দুয়ানীর সেই প্রবল উত্তাপ অনেকখানি প্রশমিত হয়ে গেছে। ১৯০৫ সনে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর মানসিকতার একটা পরিশুদ্ধীকরণ ঘটে গেছে। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রুদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দুনিয়া জুড়ে যে অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও চিত্তের বিভ্রান্তি চলেছে, বাঙ্গালী জাতি হিসাবে তার প্রভাবের বাইরে অবস্থান করতে পারল না।

১৮৯১ সনে সহবাস-সম্মতি-আইন নিয়ে বাঙ্গালী হিন্দু যে-উগ্রতার পরিচয় দিয়েছিল, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে পড়ে সেই জাত্যন্ধতাকে বড় করে আর ভাবতে পারল না। নগেন্দ্রনাথের গ্রন্থে কোন বিশিষ্ট মনোভাব না থাকতে পারে, কিন্তু কোন গোঁড়া রক্ষণশীল মনোভাব নেই।

তাঁর এ গ্রন্থ কবির জীবনের নানা উপকরণের অতুল সংগ্রহশালা। এই সংগ্রহের পিছনে যে-নিষ্ঠা ও যে-ভালবাসা আছে, তাতে মধুসূদনের নামের সঙ্গে-সঙ্গে সংগ্রাহকের নামটিও বেঁচে থাকবে চিরদিন।

নগেন্দ্রনাথ যেখানে পৌঁছান নি, সেখানে পৌঁছেছেন শশাঙ্কমোহন সেন।

শশাঙ্কমোহন তথ্য-সংগ্রাহক নন্, তিনি জ্ঞাত তথ্যের ব্যাখ্যাকারী। কবি-অধ্যাপক ছিলেন সাহিত্যের নানা শাখার সঙ্গে পরিচিত, নানা দেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত। তিনি মধুসূদনের প্রতিভার মূল প্রকৃতিটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন; কবির ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে কবি-জীবনকে মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছেন; রচনা করেছেন জীবনী নয়, জীবনভাষ্য। সাদা জীবনী লেখা সম্ভব কিনা জানি না, সব জীবনচরিতের মধ্যেই লেখকের নিজের রুচিবোধ অনেকখানি ঢুকে যায়; অর্থাৎ লেখকের অজ্ঞাতসারে জীবনী বহুলাংশে জীবনভাষ্য হয়ে ওঠে। এখানে লেখক বলে-কয়ে জীবনভাষ্য লিখছেন—শুধু জীবনের তথ্য-পঞ্জী সংকলন করেন নি। (১৯২১)

উনিশ শতকের নবীন বাংলার প্রতিনিধিরা সমাজের মুখ্য শ্রেণীর সন্তান কেউ নন, কেউ বড় ভূস্বামীর পুত্র নন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, মাধবচন্দ্র মল্লিক ব্যবসায়ীর সন্তান, রসিককৃষ্ণও তাই। রামগোপাল ঘোষের পিতার টেরিটি বাজারে ছিল সামান্য দোকান। রামতনু লাহিড়ী নায়েব-দেওয়ান গৃহের সন্তান হলেও বিত্তহীন; রাজনারায়ণ, ভূদেব, গোবিন্দ দত্ত, গৌরদাস সবাই মধ্যবিত্তের সন্তান।

একমাত্র দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন বড়লোকের বৃত্তিভোগী দৌহিত্র।

এইসব ছাত্রেরা তাঁদের মানস-ভুবনে একটা আলোড়ন অনুভব করে-ছিলেন নব্য শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে। তবে সে-আলোড়নের ফলে তাঁরা যত আলোড়িত হয়েছেন, মুক্তির ব্যাসার্ধ তত প্রশস্ত দেখতে পান নি। "তিনি পরকে আপনার করিতে জানিতেন; আত্মপ্রসার এবং পরের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। মানুষ তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অধীন হইয়া পড়িত—তাঁহার আপনার হইয়া, তাঁহার 'ভক্ত' হইয়া পড়িত। এই পর্যন্ত। তিনি কখনও পরকে আত্মদান করিতে, আত্মোৎসর্গ বা আত্মলয় করিতে জানিতেন না—পারিতেন না।"[৪]

লেখকের মতে মধুসূদনের পরকে ভালোবাসা "আত্মবিলাসের নামান্তর মাত্র।" "শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে বা প্রৌঢ়াবস্থায় বন্ধু, বান্ধব, জনক, জননী বা পুত্র, কন্যা, প্রণয়িনী, পরিবার-সমাজ-সংসার তিনি কখনও কাহারও সমক্ষে নিজের 'পান হইতে চুনটুকু খসাইতে' পারেন নাই। মধুসূদন চির-কালই মধুসূদন, তাঁহার আমিত্বটুকু কুত্রাপি কাহারও সমীপে এতটুকুন নত হইতে জানে নাই।"[৫]

"মধুসূদনের এই অন্তঃপ্রকৃতি বহু পরিমাণ পাশ্চাত্য-ব্যক্তিবাদ বা individualism বা আত্মপ্রতিষ্ঠা আদর্শেরই সম্পত্তি। সমাজে, সাহিত্যে— এই তন্ত্র ভারতবর্ষে নানা দিকে নূতন। মধুসূদনের পর হইতে বাঙ্গলার প্রায় সকল বড় কবিই কেবল এই অহমিকাতন্ত্রের সন্তান-সন্ততি রূপেই আত্মপরিচয় করিতেছেন।"[৬] ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অভ্যুদয়ের পিছনে যে-সমাজ-শক্তি কাজ করছে, লেখকের আলোচনায় তার উল্লেখমাত্র নেই। এই নতুন জীবনবোধ-যে মধ্যযুগীয় জীবনবোধের প্রতিদ্বন্দ্বী, সে প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয় নি। লেখক এই সব তত্ত্বকে কেবল পাশ্চাত্য-প্রাচ্য জীবনচেতনা বলে অভিহিত করেছেন। এইসব তত্ত্বের বুকে যে-বিশ্বজনীনতা আছে, ও কালাতিশয়তা আছে, সে বিষয়েও তিনি নীরব। জীবন বদলাবে অথচ জীবক বদলাবে না, এই রকম অদ্ভুত অনড়ত্ববোধ যুক্তিসম্মত নয়।

শশাঙ্কমোহনের 'এ্যাকাডেমিক' উচ্চ-ভাষণ বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে একটা নতুন স্বাদ এনেছিল। তাঁর মধুসূদন-জীবনভাষ্য কার্যত মধুসূদন-সাহিত্য ও জীবনী আলোচনার দ্বিতীয় যুগ সৃষ্টি করেছে।

শশাঙ্কমোহন মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনে ও কাব্যজীবনের উপর নিয়তির ভূমিকা স্বীকার করে লিখেছেন. "যে-নিয়তি বঙ্গসাহিত্যে এবং বাঙ্গালী জাতির অদৃষ্টকেও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, মধুসূদনের সাংসারিক জীবনে ও কবিজীবনে সেই নিয়তির প্রকৃতি ও স্বরূপ চিন্তা করিতেই সুতরাং চেষ্টা হইবে।"[৭]

রেনেসাঁসের সঙ্গে গ্রীক সাহিত্য-দর্শন-শিল্পকলার যোগ আছে। মধুসূদনের সাহিত্যে নিয়তির চক্রান্ত আবিষ্কার করে গ্রীক তত্ত্ব-চিন্তার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্যও খোঁজা হয়েছে।

এই অনুসন্ধানও খুব যুক্তিবিরোধী কাজ নয়। তবে শশাঙ্কমোহন এই তত্ত্ব-চিন্তাকে বাস্তব জীবনের কোন গভীর দেশ থেকে তুলে নেন নি। তাঁর অতিস্ফীত প্রতিবেদনে রোম্যান্টিকতার চাপই প্রবল।

মোহিতলালের 'কবি শ্রীমধুসূদন' (১৩৫৪) একই জাতের রচনা।

"সেই কাব্যের অন্তরালে যে নবজাত দেবশিশুর ক্রন্দনধ্বনি রহিয়াছে, এক নূতন মানুষের নূতন পিপাসা রহিয়াছে।"—তারই খবর মোহিতলাল আমাদের শুনিয়েছেন।

কিন্তু যখন লেখেন, "পাশ্চাত্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য কাব্যকলার অনুকরণে তিনি যে নব্য বাংলাকাব্যের সৃষ্টি করলেন, পরবর্তী বাংলা কাব্যে তদপেক্ষা

উৎকৃষ্ট কলা-কুশলতা ও কল্পনা গৌরব লক্ষিত হইলেও, খাঁটি বাঙালীর কাব্য হিসাবে কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।"[৮] 'খাঁটি বাঙালী' শব্দ দুইটি বঙ্কিম-কর্তৃক ব্যবহৃত হবার পরে বাংলা সাহিত্য-আলোচনায় ভয়ের ব্যাপার হয়ে উঠেছে, প্রাদেশিকতার প্রশ্রয়দাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধুসূদন বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যকে সর্বপ্রথম বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। বিশ্বজনীনতাই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভয় হয়, সেই উদার পটভূমি থেকে স্খলিত করে মধুসূদনকে মোহিতলাল বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরামের পরিবারভুক্ত করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ সবটুকু জেগে-জেগে কিনা তা বলা মুশকিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা যে বিশ্ব-সংলগ্ন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং বিশ্বসংলগ্নতাই তাকে নতুন জীবন-জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করেছে। স্বাদেশিকতার অর্থ কদাচ গ্রাম্যতা নয়। মোহিতলাল সমাজ-বিজ্ঞানের এই সব সহজ সরল প্রতিজ্ঞাগুলি হয় জানবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি, বা জেনেও সেগুলির গুরুত্ব স্বীকার করেন নি। শুধু স্থান নয়, তাঁর আপন কাল থেকেও মধুকে তিনি স্খলিত করেছেন। মধুসূদনের কাব্যের মধ্যে তিনি যে মহাকাব্যের রস পান নি, তার হেতু এখানে নিহিত। *মধ্যাহ্নের দিবাকর পরিব্যাপ্ত* বলেই ঔজ্জ্বল্যে প্রখরতর, এমনকি চান্দ্রিমাও পূর্ণ হলেই পূর্ণিমা। "রাজছত্র রবির পরিধি যেন।"

এই শাখার অন্যতম লেখক হলেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। "আমি মধুসূদনের সমগ্র সত্তার পরিচয় দিতে বসিয়াছি।"[৯] লেখক কোনরূপ পৌত্তলিক মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে গ্রন্থ লিখতে বসেন নি, একথা পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন।

"আমি মাইকেলকে দেবতা করিয়া তুলি নাই; তাঁহার দোষত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছি—এমনকি তাঁহাকে লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপও করিয়াছি; ইহাতে তাঁহার অসম্মান হইয়াছে মনে করি না—বরঞ্চ ইহার দ্বারা তাঁহাকে মানুষ মনে করিয়া সম্মান দেখানোই যেন হইয়াছে; মানুষকে ঠাট্টা করা যায়, ভালবাসা যায়; দেবতাকে ঠাট্টা করাও যেমন যায় না, তেমনি ভালবাসাও যায় না।"[১০]

বিশীমহাশয় 'এমিনেন্ট ভিক্টোরিয়ানস্‌'-র 'এমিনেন্ট' লেখক লিটন স্ট্র্যাচি-র নীতি অনুসরণ করেছেন।

অর্থাৎ কার্লাইলের বীর-পূজাকে প্রীতি-ভাজন মানুষের জীবন-চর্চায় নামিয়ে এনেছেন। বাংলা চরিতসাহিত্যের অঙ্গন থেকে ভক্তিবাদ বহিষ্করণে এই গ্রন্থের একটি বড় ভূমিকা স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া এমন সরস স্পষ্ট ভাষণও অন্যত্র নেই। শশাঙ্কমোহন নানা তত্ত্বকে 'এ্যাব্‌সলিউট' হিসাবে দেখেছিলেন; মধুসূদন সম্বন্ধে বিশীমহাশয়ের তেমন কোন 'এ্যাব্‌সলিউট' চিন্তা নেই। বিশী কী জীবনে কী মননে 'এক্‌লেক্‌টিক্‌'।

মধুজীবনীবচনার তৃতীয় যুগ শুরু হয়েছে গত বিশ বৎসরের মধ্যে। দ্বিতীষ বিশ্বযুদ্ধের অবসান ও ভাবত থেকে ব্রিটিশ শাসকদের অপসারণে একটা বড রকমেব মানস-পরিবর্তন দেখা দিল। একটা বিপুল চঞ্চলতা, অস্থিরতা এ-যুগের সর্বকাজেব সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

পূর্বতন বিশ্বাসগুলিব উপর আস্থা টুটে গেল; নতুন নতুন বোধের ডগাগুলি মাথা তুলতে লাগল। পূর্ব-যুগের বীর এ-যুগে অকেজো হাতিয়ারধারী বলে অবহেলিত হন। পানিপথের যুদ্ধে বাবর যে জিতেছিলেন, ভারতে বীরের সংখ্যা কম ছিল বলে নয়, বাবরের হাতে ছিল প্রচুর বারুদ, বুকে শুধু অপর্যাপ্ত সাহস নয়।

মধুসূদনের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের নব-মূল্যায়ন এবার হতে লাগল। সামাজিক কাবণ খুঁজে বের করার চেষ্টা হোল। নীরেন্দ্রনাথ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শীতাংশু মৈত্র এ-যুগের মধুসূদন-সাহিত্যের কৃতী ব্যাখ্যাকারী। কিয়ৎ পরিমাণে অধ্যাপক সুশোভন সরকারও এই কাজ করেছেন ইংরেজি ভাষায়। সামাজিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি আরও দুই-এক জাতের ব্যাখ্যা দেখা দিয়েছে; তাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ফ্রয়েডীয় রীতি।

॥ ৪ ॥

জীবনী-আলোচনার আসরে অভিনবত্ব আর নবীনত্ব এক নয়। এক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করা আর ফৌজদারী আদালতের কৌশুলির সওয়াল এক নয়।

জীবনীরচনায় তথ্যের মূল্য সর্বদাই থাকবে। কিন্তু সব তথ্যের নিজস্ব কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। অন্য ঘটনার শিকলের সঙ্গে গাঁথা হলে তবেই তথ্যবিশেষের মূল্য। নইলে মাইকেল তাঁর বাবার সট্‌কা টেনে ঘুম

পান করেছিলেন, পূর্ব-বিবাহ বাতিল না করে তিনি ফরাসী কুমারীকে নিয়ে পালিয়েছিলেন, মৃত্যুকালে এক গোপন ব্যাধিতে ভুগতেন,—এইপ্রকার খবর ছড়ালে বা ছিটালে বাজার-মত্ততা জাগতে পারে, কিন্তু মাইকেল-উপলব্ধিতে ছিটেফোঁটা এগুলো যাবে না। ব্রিটিশ সাহিত্যে আজকাল রাস্কিন ও ডিকেন্সকে নিয়ে এই জাতের বহু উত্তেজক তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। কিন্তু কবি আর কাব্যের মধ্যে গূঢ় যোগসাজস সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, এই স্বীকৃতি না থাকলে ঐ জাতীয় তথ্যসন্ধানের সার্থকতা কি? সব কবিই তাঁদের জীবনে নেই, কোন কোন কবি কেবল থাকেন।

মাইকেল একান্তভাবে আত্মপ্রকাশ-উন্মুখ—কী জীবনে, কী কাব্যে।

যিনি লক পড়েছেন, বেকন পড়েছেন, হিউম পড়েছেন, টম পেইন পড়েছেন, অথচ সাহিত্য ব্যতীত অন্য কিছু করলেন না, এটি এক বিস্ময়কর ঘটনা। মাইকেল উনবিংশ শতাব্দীর বশংবদ সন্তান, দত্তক পুত্র নন।

তিনি যেমন বহির্মুখী, তেমনি অন্তর্মুখী। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের সমর্থক, কিন্তু তিনি কোন সভায় বক্তৃতা দেন নি, কোন পুস্তিকা লেখেন নি। তিনি সদালাপী, মজলিশী ও উচ্চ হাসিময়, অথচ জীবনে কত বিষয়ে আদৌ আলাপ করলেন না। যে পিতা কৃষ্ণকুমারীর দুঃখে উন্মাদ হয়ে গেলেন, তিনি তো মধুসূদনেরই সৃষ্টি। সেই 'স্রষ্টা' নিজে মাদ্রাজে চার-চারিটি সন্তানকে ফেলে রেখে চলে এলেন, কোন দিন আর তাদের সংবাদ নিলেন না, তার কি কোন ব্যাখ্যা আছে? মৃত্যুর সময় মনুকে প্রতিশ্রুতি দিতে বলেছেন, 'আমি চলে গেলে আমার সন্তানেরা যেন অন্নাভাবে কষ্ট না পায় তুমি দেখো।' সেই মধুসূদন,—সেই পিতা মধুসূদন মাদ্রাজের ইতিবৃত্ত কি কোনদিন স্মরণ করেন নি?

চার-চারিটি সন্তান তাদের শৈশবের সমস্ত কাকলি নিয়ে নীরব হয়ে রইল। মাইকেলের সাহিত্যে যে কোথাও কোন শিশু নেই, তার কারণ কি? তাঁর সব সাহিত্যে কেন সদা অভিযোগের তর্জনী তুলে দাঁড়িয়ে আছেন কেবল নারীরা? এহেন কবির নাটকে শর্মিষ্ঠার সন্তানেরা নেপথ্যে তো থাকবেই! পিতা মধুসূদন বহির্মুখী, এ কথায় কি বলা যায়?

ভালোবেসে রেবেকাকে বিয়ে করেছিলেন; সেই ভালোবাসাই একদা রেবেকার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করেছিল।

অথচ ভালোবাসা তাঁর কাছে—কি জীবনে, কি সাহিত্যে—কখনও লঘু

বা হাল্‌কা খেয়াল নয়। পাত্র পরিবর্তনে মধুর স্বাদ বদলায় না। হেনরিয়েটা তাঁর দীর্ঘকালের সঙ্গিনী, কিন্তু জীবনের গূঢ়তম কথার ভাগিনী নন।

কঠিনতম সংগ্রামের সব দহনজ্বালা তিনি একা বহন করেছেন। সেখানে বন্ধু গৌরদাস কাছে নেই, রাজনারায়ণ শুধু সাহিত্য-প্রসঙ্গের আলাপচারী, বিদ্যাসাগর শুধু প্রয়োজনের আশ্রয় বা মহত্ত্বের আধার, যতীন্দ্রমোহন শুধু গ্রন্থরচনার উৎসাহদাতা। নিভৃত লোকের অভ্যাগত কেউ হলেন না।

সব ব্যথা একা বহন করে পথ চলা সুখকর নয়। মধুসূদন কোন এক সুবিপুল বোঝা একা বহন করে আত্মহনন করেছেন; ব্যথার অংশীদার নেই, কৈফিয়তের শ্রোতা নেই, সবই নিজের কাছে নিজের নিবেদন—সে বড় আত্মনাশী যজ্ঞ! মধুসূদন সেই যজ্ঞের রাজপুরোহিত। তিনি ধ্বংস নিশ্চিত জেনেও সংশোধন করেন নি, যজ্ঞ অসমাপ্ত রেখে উঠে যান নি।

তাঁর হাতে আত্মনাশী নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে। অর্ধসমাপ্ত ইন্দ্রজিৎ তিনি নন, তিনি পূর্ণ ইন্দ্রজিৎ। তাঁর অকাল-মৃত্যু তাঁর স্বকৃত মৃত্যু। স্বকালও বটে!

পৃথিবী জুড়ে যে-আলোড়ন চলেছে, পরাধীন ঔপনিবেশিক আত্মতুষ্ট (অল্পতুষ্ট?) জরদ্‌গব সমাজে জন্মেও মধুসূদন তাকে আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন—শুধু মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে, প্রতি রক্তকণিকায়। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত যে ভাব-আন্দোলন শুধু বহির্মুখী ছিল, তাকে তিনি তাঁর আত্মজীবনে অনূদিত ও অনুভূত করতে চেয়েছিলেন। শিল্পী তিনি। তাই নিজে না পুড়ে আগুনের দীপ্তি উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁকে একান্ত হয়েই সর্বান্ত হতে হবে।

কলকাতায় তিনি সম্মানজনক চাকরী পান নি; তবু এই কলকাতা হোল তাঁর লীলাভূমি। কলকাতা নতুন যুগের আবাসস্থল। এই শহরের মধ্যে যে-পরিমাণ গতিশীলতা আছে (mobility), মধু তার থেকে অধিকতর গতিশীলতা স্বীয় জীবনে অনুভব করেছেন; অঙ্গীকার করেছেন।

তাঁর কাকা, জ্যেঠা, পিতা সবাই গ্রামত্যাগ করেছেন জীবিকার তাগিদে। একা মধু জীবনের তাগিদে সদা চঞ্চল। কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁরই ঠিকানা থাকল 'যশোর সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে'। চির চঞ্চলতার মধ্যে অচঞ্চল নক্ষত্র ঐ একটি ঠিকানা। কলকাতা-সঙ্গ ব্যতীত মধুসূদন সম্ভব হতেন না। যে বিদ্বানশ্রেষ্ঠ কলকাতা থেকে কার্মাটাড়ে এসেছিলেন,

তিনিও কলকাতার লোক। বীরসিংহ ভুমিষ্ঠতার ভূমি ; আর কার্মাটাড়ে তিনি পলাতক।

অশান্তভাবে বাঁচার অর্থ অনিবার্যভাবে বাঁচা। সেইরূপ বাঁচার অনুকূল ভূমি হোল কলকাতা। মধু যতদিন বেঁচেছেন, ততদিন শুধু জীবিত থাকেন নি। দুঃখের কাঁটাবনেও তিনি অট্টহাসি করতে পারতেন, মৃত্যুকালেও হাস্য-পরিহাস করেছেন। ঋণ পরিশোধ না করে আবার নতুন ঋণ চাইতে পারতেন। উত্তমর্ণ তাঁর কাছে অধমর্ণ। রাবণ এবং নবকুমার হাত ধরাধরি করে চলেছে একটি দেহপিঞ্জরে। মধুসূদনের জীবন সর্ব বৈপরীত্যের জবাব। তিনি জানতেন না মানুষের সম্পদের মালিকানা সামাজিক, না ব্যক্তিগত, তিনি জানতেন না—মানুষ কত আয় করবে, কত ব্যয় করবে। তিনি বুঝতেন না যে, পুরুষ যে-রমণীর সঙ্গেই থাকুক, তার পিছনে সামাজিক স্বীকৃতি দরকার। তিনি মানতেন না, মিলন ও বিচ্ছেদ স্বেচ্ছাকৃত হতে পারে না।

তিনি হয়তো মনে করতেন খাদ্যপানীয়ের বিধি-নিষেধ থেকে মানুষের মনুষ্যত্ব অনেক বড়।

তিনি হয়তো মনে করতেন পুত্রত্ব ভ্রাতৃত্ব থেকে মনুষ্যত্ব অনেক বড়।

তিনি হয়তো মনে করতেন পিতৃত্ব পতিত্ব থেকে মানুষের মনুষ্যত্ব অনেক বড়। মধুসূদনের মনুষ্যত্বের সংজ্ঞাই কি তবে পৃথক?

বাংলা কাব্যে মানবমহিমার কথা ছিল, মনুষ্যত্বের কথা নেই। বিশ্ব-ইতিহাসে অনেক পরে মানুষের মনুষ্যত্বের দেখা মিলেছে। তাই জীবনের বিপুল উপকরণের মধ্যে বিহার করেও বিশদ হতে পারেন না মধুসূদন।

মধুসূদনের একটি মূর্তিই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে, সে হোল তাঁর মধুসূদন-মূর্তি।

তখন লরেঞ্জো দ্য মেদিসির মূর্তি তৈরী হয়ে গেছে। জনৈক দর্শক বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলেছেন, একি করেছেন মশাই! লরেঞ্জোর মত এটি তো দেখতে হচ্ছে না!

শিল্পী চটে গেলেন, হাতের বাটালি নামিয়ে রেখে বললেন, কি এসে যায়! হাজার বৎসর পরে কে মনে রাখবে লরেঞ্জো দ্য মেদিসি কেমন দেখতে ছিলেন! কার মত দেখতে ছিলেন! তখন সত্য হবে এই মূর্তি, যা আমার সৃষ্টি!

প্ল্যাস্টিক আর্টের স্পর্ধার সঙ্গে সাহিত্য পাল্লা দিতে পারে না। সাহিত্য

হোল শব্দ তথা অক্ষর-নির্ভর। অক্ষর জন্মসূত্রেই বিচলিত 'সিম্বল'। পাথর ঠুকে যা স্থায়ী হয়, অক্ষরের ক্ষরিত অবয়বে তা কি তেমনি ভাবে ধরা দেবে? বিশেষ করে তার লক্ষ্য যদি হয় কোন কবির জীবনকে সাক্ষরা করা।

কবির জীবন তাঁর কাব্যের মতই বহুক্ষরা, বা সতত পরিবর্তন-উন্মুখ।

পাদটীকা

১. Memoirs of My Life and Times—Bipin Chandra Pul, p. 429.

২. ঐ, p. 423.

৩. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু। ৪র্থ সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৪৬।

৪. মধুসূদন (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা)—শশাঙ্কমোহন সেন। ২য় সংস্করণ, ১৯৫৯। পৃষ্ঠা ২১। পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা-৪

৫. ঐ পৃষ্ঠা ২১।

৬. ঐ পৃষ্ঠা ২৬।

৭. ঐ পৃষ্ঠা ২৬।

৮. কবি শ্রীমধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়। ২য় সংস্করণ ১৩৬৫।

প্রথম অধ্যায় সাগরদাঁড়ি : শৈশব জীবন

॥ ১ ॥

মধুসূদনের জন্মস্থানের নাম সাগরদাঁড়ি ; সমুদ্র এখান থেকে বহুদূর—সমুদ্র-তরঙ্গের অগ্রমুখিতার দাঁড়ি টেনে গ্রাম এই নাম অর্জন করে নি। সমুদ্র থেকে সম্পর্ক-চ্যুত নয়—ছোট্ট কবতক্ষ নদে জোয়ার-ভাটা আছে। সমুদ্রস্তনিত সাগরদাঁড়ি।

গ্রামটি অত্যন্ত সাধারণ ; দক্ষিণ-ঘেঁষা মধ্যবঙ্গের এই গ্রাম ; মধ্যবঙ্গের সজলতা ও শ্যামলতায় পরিপূর্ণ। এ গ্রাম যদি বীরভূমে অবস্থিত থাকত, বা জলপাইগুড়িতে অবস্থিত হোত, তবে মধুসূদনের কাব্য-ভুবনের রঙ বদলে যেত।

নদীর সঙ্গে গ্রামের সম্বন্ধ নাড়ির সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের মত। একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ, একে অপরকে নিয়ে সম্পূর্ণ। সাগরদাঁড়ি প্রসঙ্গে কবতক্ষ তাই অনিবার্য অংশ।

অত্যন্ত সাধারণ সামান্য এই গ্রামে মধুসূদন দত্ত জন্মেছেন ; পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা হলেন জাহ্নবী দেবী। অথচ এই গ্রামই মধুসূদনের কল্পনার স্বর্গ ; মাদ্রাজে পরবাস জীবনে 'Visions of the Past' কাব্যে এরই প্রশস্তি গেয়েছেন ; 'Rizia' কাব্যনাট্যে এরই প্রসঙ্গ স্নেহ-ক্ষরিত ভাষায় নিবেদিত—

"My land of palmiest grave and bluest stream."

স্বপল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার তুচ্ছ বেদনা থেকে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ জন্মলাভ করেছে অপূর্ব মাতৃস্নেহসুধার আকাঙ্ক্ষা।

> আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
> স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে।

(মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ)

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ স্বর্গের বিস্তৃত বর্ণনা আছে—সে স্বর্গ সাগরদাঁড়ির ছদ্ম-পরিচয়।

> শাল্মলী, শাল, তাল, অভ্রভেদী
> চূড়াধর ; নারিকেল যার স্তনচয়
> মাতৃদুগ্ধ-সম রসে তোষে তৃষাতুরে!

গুবাক ; চালিতা ; জাম সুভ্রমররূপী
ফল যার ; ঊর্ধ্বশির তেঁতুল ; কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত,
ধনদের গৃহে যেন। বংশ শতচূড
যাহার দুহিতা বংশী, অধর-পরশে
গায়রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে।
খর্জুব কুম্ভীরনিভ ভীষণ মূবতি,
তবু মধু-রসে পূর্ণ। (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য)

এ সব বৃক্ষ কি স্বর্গের ?

মন্দার-পারিজাত এবং আরও কত অভিজাত তরুর ঠিকানা স্বর্গে মিলবে, আমরা এমন প্রত্যাশা করে থাকি। মাইকেলের স্বর্গে এগুলি নেই, পুরাণের স্বর্গে ছায়া বিস্তার করে আছে প্রাকৃত বৃক্ষ।

প্রথম যে পাখি স্বর্গে ডেকে উঠেছিল তারও নীড় স্বগ্রামের কোন উচ্চ

ডাকিল ফিঙ্গা ; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে।

আম-জাম-কাঁঠাল-খেজুর-সুপারি-চালিতা গাছের শ্যামলতায় স্নিগ্ধ এই শান্ত গ্রামখানি হোল মধ্য-বাঙলার শত শত অখ্যাত অপরিচিত (বা অতি-পরিচিত) গ্রামের অন্যতম। এমনি ধারা এক গাঁয়ের টানে মধুসূদনের আশি বৎসর পরে বিভূতিভূষণের গল্পের এক বৃদ্ধা বিধবা, নাম তাঁর দ্রবময়ী, মর্ত্যের স্বর্গ কাশীধাম ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন। অকিঞ্চিৎকরতায় অনন্যতার মহিমা এসেছে প্রেম থেকে। এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেই মধুসূদন বঙ্গমাতার একেবারে বুকের সমীপে স্থান পেয়েছেন। তাঁর ত্রিশ বৎসর পরে মধ্য-বাঙলার নদী-চুম্বিত শততরু-পল্লবিত ভূখণ্ডে বসবাস করে রবীন্দ্রনাথ লিখতে সমর্থ হয়েছিলেন—'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' !

মধ্য-বাঙলার প্রথম কবি মধুসূদন, দ্বিতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ, আর তৃতীয় বা সর্বাধুনিক কবি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ ২ ॥

মধুসূদনেরা ছিলেন কয়েক পুরুষ ধরে যশোহরের অধিবাসী। প্রপিতামহ ছিলেন অন্য গাঁয়ের বাসিন্দা। সে গ্রামটি পরে খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত

হয়েছিল। মধুসূদনের জীবৎকালে তাঁর পূর্ব-নিবাসের ঠিকানা যশোহর জেলার মধ্যে ছিল। প্রপিতামহ রামকিশোরের সময় খুলনা নামে কোন পৃথক জেলা ছিল না।[১]

১৮৮২ সনে খুলনা জেলায় জন্ম। নদীয়া থেকে বনগাঁ, তৎসহ মাগুরা, ঝিনাইদহ ও সদর মহকুমা নিয়ে যশোহর জেলার উৎপত্তি। আর ২৪ পরগণা থেকে সাতক্ষীরা মহকুমা নিয়ে বাগেরহাট ও খুলনা মহকুমা নিয়ে খুলনা জেলা গঠিত হোল।[২] প্রতাপাদিত্যের যশোহরের অধিকাংশ খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত।

প্রপিতামহ রামকিশোর দত্তের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনিধি দত্ত অন্যান্য ভাইদের নিয়ে তালা গ্রামের বাস উঠিয়ে তাঁদের মাতুলালয় সাগর-দাঁড়িতে এসে বসবাস শুরু করলেন।

রামনিধি দত্ত গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য নয়, জীবিকার তাগিদেও নয়, অভিভাবকের অভাবে। সে যুগে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে লোকে গ্রাম ত্যাগ করত, বর্গীর হামলার সময় যেমন গঙ্গার পশ্চিম তীর জনশূন্য হয়ে পড়েছিল—এমন কি বর্ধমান রাজপরিবারের লোকেরা গঙ্গার পূর্ব তীরে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন।[৩] সে যুগে তীর্থ-দর্শনের জন্য কেউ-কেউ গ্রাম ত্যাগ করতেন। তা ছিল বিচ্ছিন্নভাবে, বা এককভাবে গ্রাম ত্যাগ। গ্রামজীবনে সে যুগে কোন গতি-চাঞ্চল্য ছিল না, কোন mobility ছিল না।

না থাকবার কারণ ছিল। প্রাচীন অর্থনীতি ছিল স্বয়ম্ভর। জীবিকার তাগিদে কাউকে গ্রাম ত্যাগ করতে হত না। কবিকঙ্কণ গ্রাম ত্যাগ করে-ছিলেন; এ উদাহরণ রাঢ়ের উদাহরণ এবং বিরল উদাহরণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রধানত নদীর ভাঙ্গনের ফলে লোকে বাসস্থান পরিত্যাগ করত; আর বিবাহের সূত্রে বা মাতৃকুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্বের লোভে গ্রাম ত্যাগ করত। আঠার শতকের শেষ পর্যায়ে গ্রাম-বাংলায় ইংরেজ বণিকের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে—তারা নানা স্থানে কুঠি নির্মাণ করেছে। এই সব কুঠিতে বা নিমক মহালে কয়েকজন কেরানী বা গোমস্তা বা লাঠিয়ালের কর্ম-সংস্থান হলেও কোন ভদ্র চাকরী সুলভ ছিল না। উনিশ শতকে কর্নওয়ালিশের শাসন-নীতির ফলে কিছু চাকুরীর বন্দোবস্ত হোল। আদালত প্রতিষ্ঠিত হোল জেলায়-জেলায়, মহকুমায়-মহকুমায়। তাতে কিছু লোকের জীবিকার ব্যবস্থা হয়। রামনিধি দত্তের চার ছেলে, বড় রাধামোহন, মেজো

মদনমোহন, সেজো দেবীপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ। জীবিকার প্রয়োজনে এদের প্রত্যেকেই কিন্তু স্থানত্যাগী হয়েছিলেন—দত্তেরা স্বল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এঁরা গৃহত্যাগী হয়েছিলেন, কিন্তু গ্রামত্যাগী হন নি।

রাধামোহন গেলেন যশোহরে; সেখানে হলেন জেলার সেরেস্তাদার। মেজো মদনমোহন পাড়ি জমালেন আরো একটু দূরে—গড়াই-মধুমতী পার হয়ে এসে উঠলেন পাবনা জেলার কুমারখালী মহকুমায় (পরবর্তী কালে নদীয়া জেলার একটি থানা মাত্র); এখানে তিনি মুন্সেফ পদাভিষিক্ত হন। দেবীপ্রসাদ ও রাজনারায়ণ বড় ভাই রাধামোহনের আশ্রয়ে থেকে যশোহরে উকিল হলেন। একদিন কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বড় ভাইয়ের নিশ্চিত আশ্রয় ত্যাগ করে কলকাতায় পাড়ি জমালেন—সদর দেওয়ানী আদালতে উকিল হিসাবে নাম লেখালেন। সাগরদাঁড়ির দত্তেরা বড় চঞ্চল, বড় উন্নতিকামী, এঁরা অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে চান নি।

দত্তেরা গ্রামত্যাগ করে গ্রামত্যাগী হন নি। এঁরা ছিলেন পেশা-নির্ভর মধ্যবিত্ত—সামন্ততন্ত্রীয় নন। তবে কর্নওয়ালিশের কৃপায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হলে বিত্তবান মধ্যবিত্তের পক্ষে জমিদার সাজার কোন প্রতিকূলতা ছিল না।[৫] বিত্ত সঞ্চিত হলে এঁরা সবাই জমিদারী কিনতেন, পত্তনি কিনতেন; দত্তেরাও সাগরদাঁড়িতে জমিদার হয়ে উঠলেন। তৈরি করলেন বিরাট অট্টালিকা, দেব-মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ। পূজা-উৎসবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন এঁরা। এঁরা যেমন অর্থ দেদার উপার্জন করতেন, তেমনি ছিলেন অমিতব্যয়ী। একটি উদাহরণ থেকেই খরচের বহর বোঝা যাবে। বড় জ্যেঠা মহাশয় রাধামোহন দত্ত তাঁর পুত্রের কল্যাণ কামনায় ১০৮ খানি কালীমূর্তি পূজা করেছিলেন। এই একশত আটখানি কালীমূর্তি পূজার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পূজক ব্রাহ্মণ, পূজার উপাচার, ঢাক ঢোল প্রভৃতির আয়োজন করতে হয়েছিল। তদুপরি ছিল ১০৮টি মোষ, ১০৮টি পাঁঠা ও ১০৮টি ভেড়া বলি। তার সঙ্গে আরও ছিল ১০৮ সোনার জবা ফুলের অঞ্জলি।

একটি গল্প থেকেই দত্তদের ঐশ্বর্যের পরিমাণ ও ব্যয়বাহুল্যের পরিমাণ কিছুটা আঁচ করা যাবে।

দত্তদের বিত্ত সবই স্বোপার্জিত; তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন ব্যবহারা-জীবী। তাই তাঁরা কারো ভৃত্য ছিলেন না। দত্তদের মধ্যে যে-স্বাধীন-

চিত্ততা দেখা যায়, তার ভিত্তি এখানে। গ্রাম থেকে দূরে বসবাস করলেও তাঁরা গ্রামবাসী বলেই নিজেদের পরিচয় দিতেন।

দত্তদের এই গ্রাম-প্রীতি লক্ষ করার মত এক ঘটনা। তখন ফারসী ছিল আইন-আদালতের ভাষা, দত্তেরা সবাই ফারসী খুব ভালো জানতেন। কেউ কেউ ঐ ভাষায় সাহিত্য-চর্চা; করতেন, যেমন, সেজো জ্যেঠা দেবীপ্রসাদ। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ ছিলেন ফারসীতে সুপণ্ডিত—তাই তাঁকে বলা হত মুন্সী রাজনারায়ণ। ফারসী ছিল জীবিকা অর্জনের ভাষা—ছিল 'সেকুলার' ভাষা। দত্তেরা ধর্মীয় শিক্ষার গণ্ডী পার হয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার আওতায় এসেছিলেন। শাস্ত্রীয় শিক্ষা নয়, ব্যবহারিক শিক্ষার্জন ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ইহলোক-সর্বস্বতা এসেছে, ইহলোকবাদ আসে নি তখনও। তার জন্য যশোহর নয়, কুমারখালী নয়, চাই কলকাতার সঙ্গে সংযোগ।

হঠাৎ একদিন রাজনারায়ণ দত্ত যশোহর ত্যাগ করে শহর কলকাতায় এসে উপনীত হলেন। তখনও আদালতের কাজকর্ম চলছে ফারসীতে, সদর দেওয়ানী আদালতে তখন সওয়াল করতে হয় ফারসীতে; ইংরেজ ব্যারিস্টারদের সেখানে বড় বিশেষ প্রতিপত্তি নেই, আনাগোনা নেই।

॥ ৩ ॥

১৮২৪ সনে সাগরদাঁড়ি গ্রামে ২৫-এ জানুয়ারি তারিখে মধুসূদন পৃথিবীর আলো প্রথম দেখলেন।

পিতৃসূত্রে তিনি পুরো মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, মাতৃসূত্রে জমিদারী রক্তের সঙ্গে যোগ আছে। মা ছিলেন কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। দাদুর স্মৃতি মধুসূদনের মনে কোন ছাপ রাখে নি; মাতুল বংশীধর ঘোষের আহ্বানে তিনি কবিখ্যাতি অর্জনের পর একবার কাটিপাড়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন। কাটিপাড়ার ঘোষেরা খুব ধনাঢ্য পরিবার। মধুসূদনের জীবনে কাটিপাড়ার বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। কাটিপাড়া সাগরদাঁড়ির মত ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম, একই রকম অখ্যাত বঙ্গপল্লী।

মধুসূদন তাঁর বাল্য-জীবন সাগরদাঁড়িতে কাটিয়েছেন। পিতা সফল কৌঁশুলি, উন্নতিশীল মধ্যবিত্ত। কাজেই তাঁর একমাত্র সন্তান গৃহে প্রচুর যত্ন, আদর-আপ্যায়নে লালিত-পালিত হয়েছে।

সে যুগে বিবাহিত পুরুষেরাও জীবিকার তাগিদে স্থানত্যাগী হলে স্ত্রী-পরিজন নিয়ে স্থানত্যাগ করতে পারতেন না। তাদের স্বগৃহে রেখে যেতে হোত। তখনকার কৌলিক আচার না মেনে কারও উপায় ছিল না। যৌথ পরিবারের পরিচালনারীতি ছিল সামন্ততন্ত্রীয়। আর সব ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে রাজনারায়ণের স্ত্রী জাহ্নবী দেবীও গ্রামের বাড়িতেই দাসদাসী আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে বাস করতেন।

বাড়ির অন্যান্য সন্তানদের মত চার-পাঁচ বৎসর বয়স হলে মধুসূদন গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হলেন। সেখানে বেত্রদণ্ড ও অন্যান্য দণ্ড অপরাপর সহপাঠীদের মত তুল্যভাবে তাঁর জন্যও বরাদ্দ ছিল—বিত্তবানের পুত্র বলে অব্যাহতি ছিল না। মধু পড়াশুনায় অমনোযোগী ছিলেন না; বেত্রদণ্ডের ভয়ে পাঠশালা-পলায়ন করতেন না। জীবনীকারগণ লিখেছেন যে, পাঠশালা যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর তরফ থেকে অতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ পেত। স্নান থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গে যাতে গরম ভাত মেলে তার জন্য হেঁসেলে একাধিক হাঁড়িতে ভাত চড়ান হোত। যে হাঁড়ির ভাত অধিকতর সুসিদ্ধ হোত, সেটি থেকে তাঁকে খেতে দেওয়া হোত। দ্রুত পাঠশালা যাওয়ার জন্য এইসব ব্যবস্থা। প্রবীণ বয়সে কলকাতায় মাইকেলের বাল্যশিক্ষক মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন। মধুসূদন তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। তাঁর নিজের চরম আর্থিক দুরবস্থার দিনে এই ভাবে অর্থ অপচয়ে কেউ কেউ অনুযোগ করলে তিনি বলতেন, ওঁর বেত্রাঘাতের চিহ্ন এখনও আমার শরীরে বিদ্যমান। ওঁকে সাহায্য না করে আমি পারি না।

দণ্ড তাঁকে দণ্ডিত করতে পারে নি। ব্যথায় তিনি ব্যথিত হন নি।

স্কুলে যাবার তাঁর আগ্রহ বাল্যকাল থেকে অপরিসীম। খেলাধুলার সুযোগ বা গল্পগুজবের সুযোগ মিলত বলে তিনি পাঠশালা যাওয়ায় আগ্রহী ছিলেন, তা নয়। জ্ঞান আহরণে তাঁর আবাল্য নেশা। কিছু শিক্ষা লাভের পর, কিছু জ্ঞান-অর্জনের পর তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন যে, তিনি কবি হবেন। মধুসূদন 'স্বভাব-কবি' নন; তিনি বহু-পঠিত কবি।

সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর সাধনে বহু-পঠনের প্রয়োজন ছিল।

পাঠশালার পাঠ যখন চলছে, তখন তিনি ফারসী পড়ার জন্য ভিন্ন গ্রামের এক মৌলবীর কাছে যাতায়াত শুরু করেন। ছয়-সাত বৎসরের বালক মাত্র; তখনই তিনি মাইলাধিক পথ হেঁটে মৌলবীর কাছে ফারসী পড়তে

যেতেন। ফারসী পড়তে ও লিখতে তিনি জানতেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময় তিনি ফারসী কবি সাদী থেকে অনুবাদ করে ছাপিয়েছিলেন, অনুসরণ করে কবিতা লিখেছেন। অবশ্য ফারসী প্রভাব 'রিজিয়া' এবং 'ক্যাপটিভ লেডি'তে স্থূলভাবে থাকলেও আন্তরিকভাবে নেই। পরবর্তী কালে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ বা 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ ফারসী সাহিত্য পাঠের কোন প্রভাব নেই। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র নিসর্গ-রস সম্ভোগে যে কবি সাদী বা অন্য কারও সূক্ষ্ম প্রভাব নেই, একথা বলা কষ্টকর।

সাগরদাঁড়ির শিক্ষার মধ্যে গৃহশিক্ষার গুরুত্ব বোধ করি কম নয়। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল তিনি মায়ের কাছে পড়েছেন। এইসব কাব্যের বিস্তৃত অংশ আবৃত্তি করে তিনি পুরাঙ্গনাদের অবাক করে দিতেন, মায়ের হর্ষোৎফুল্লতা ও পুত্রগর্ব বাড়িয়ে দিতেন। মাদ্রাজ-প্রবাস-জীবনে অনেক সুখ-স্মৃতি তাঁকে পীড়া দিত—তাঁর কাব্যের বুকে-পিঠে সেই সব স্মৃতির চিহ্ন স্পষ্টভাবে এঁটে আছে। সেই প্রবাস থেকে দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি যাঁদের জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছেন, তাঁরা হলেন কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস। মধুসূদন তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী কাব্য তৈরী করবেন, কিন্তু এঁদের প্রতিকূল হন নি। তাঁদের সকলের কূল একটা—বাংলার কূল।

মধুসূদনের বাল্যকালের সর্বশেষ শিক্ষক হোল সাগরদাঁড়ি গ্রাম। সাগরদাঁড়ির শ্যামল প্রকৃতির কোলে তিনি বাল্যলীলা সম্পন্ন করেছেন। কবতক্ষ নদ—শান্ত সুশীতল চির প্রবহমান এই ছোট্ট নদী তার অতি ক্ষীণ বাহু দিয়ে তাঁর অনুভবকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে, যার বন্ধন তিনি কোনদিন আলগা করতে পারনে নি।

কবতক্ষ নদ, তার দুই তীর, তীরের বটগাছ, ভাঙ্গা শিবমন্দির, সায়ংকালের তারা-এরা সব তাঁর শৈশবের শিশুশিক্ষার আদি বর্ণমালা। আর, অজস্র পাখির কাকলি, বাতাসের শব্দ, নির্জনতার আবেশ—তাঁর শৈশবের সঙ্গীত-শিক্ষার প্রথম স্বরলিপি। এই স্নিগ্ধ সজল সুশ্যাম দেশভুমি তাঁর মনোরাজ্যকে সবুজে আর সিক্ততায় আর্দ্র করে রেখেছে চিরদিন—দুঃখ তাঁকে রুক্ষ করে নি, দুর্দিন তাঁকে করে নি কর্কশ ও পাণ্ডুর। মধুসূদনের হৃদয়ের সুধা যে কোন দিন শুকিয়ে যায় নি, তার কারণ তিনি বাল্যজীবনের উত্তরাধিকারকে প্রবীণ বয়সে অস্বীকার করতে পারেন নি। বিদ্যাপতি শৈশব-যৌবনকে মিলিয়ে ফাঁপরে পড়েছিলেন; মধুসূদনের জীবনে এইসব বিপত্তির সমাধান।

মধুসূদন কবি হবেন, এ আর কে চাইত! বাবা-জ্যেঠারা কেউ চাইতেন না যে, তাঁদের বংশধর শুধু একজন পদ্য-লিখিয়ে হোক; শুধু একজন ছড়া-কাটিয়ে হোক!

তাঁরা ছিলেন আইনজীবী। তাঁরা চাইতেন যে, তাঁদের বুদ্ধিমান ছেলেটি, বিদ্যাশিক্ষায় আগ্রহী ছেলেটি আইনজীবী হোক। এই কারণে গ্রামের পাঠশালায় পাঠগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মৌলবীর কাছে ফারসী ভাষায় পাঠ নেওয়া চলল। ব্যবহারিক শিক্ষার সর্বতোমুখী প্রয়াস চলল। মধুসূদন কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বৃত্তিশিক্ষার স্বাভাবিক আনুকূল্য পেয়েছিলেন। কিন্তু বৃত্তিব ধারণে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

॥ ৪ ॥

মধুসূদন যখন পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক, তখন তাঁর পিতা যশোহর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে গেলেন—অধিকতর উন্নতির আশায়, অধিকতর অর্থ উপার্জনের আশায় এবং দুই-এক বৎসরের মধ্যেই আপন জীবিকায় তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন করলেন। কলকাতার খিদিরপুর পল্লীতে বড রাস্তার উপরে একটা বড ইমারত কিনে ফেললেন। হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র এবং ইংরেজী ভাষায় প্রথম বাঙালী কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের মাতামহ ছিলেন এই গৃহের মালিক। কাশীপ্রসাদ এই গৃহে বালক বয়সে লালিত-পালিত হয়েছেন। গৃহের পরবর্তী অধিকারী মধুসূদন দত্তের 'ক্যাপ্‌টিব লেডি' কাব্যকে তিনি প্রশংসা করতে পারেন নি; তাঁর 'হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্‌সার' পত্রিকায় ঐ কাব্যের এক বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। মাতামহের গৃহ, বাল্যের ক্রীড়াভূমি বেদখলের জ্বালা এই বিরূপতার পিছনে লুকিয়েছিল কিনা, কে বলতে পারে!

কলকাতায় গৃহ কেনা হোল; এবার আর স্ত্রী-পুত্রকে দেশের গৃহে ফেলে রাখা উচিত নয়। এছাড়া তাঁর গৃহে দুইটি শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে, তাঁর দ্বিতীয় পুত্র প্রসন্নকুমার এক বৎসর বয়সে মারা গেল; সে ১৮২৬ সনের কথা। পরের বৎসর ১৮২৭ সনে আর একটি পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তার নামকরণ হোল মহেন্দ্রনারায়ণ। সে বালক চার বৎসর বয়সে গ্রামের বাড়িতে মারা গেল। পর পর দুই পুত্রের মৃত্যুতে জাহ্নবী দেবী পাগলিনীর মত হলেন, গৃহে কোন পুরুষ অভিভাবক থাকেন না। রাজনারায়ণ যথেষ্ট অর্থোপার্জন

করেন, অথচ সুচিকিৎসার অভাবে একের পর এক শিশুমৃত্যু ঘটেছে। যাদের জন্য সংসার, অর্থোপার্জন, তাদেরই রক্ষা করা গেল না। একমাত্র বংশধর মধুসূদন; সেও তো ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী নয়। বরং তাকে রুগ্ণ বলা চলে। পুত্রের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে শংকিত হয়ে উঠলেন রাজনারায়ণ দত্ত। তাঁর পিণ্ড দানের অধিকারী কেউ কি থাকবে না? বংশ রক্ষার উপায় কি? না, এবার সাগরদাঁড়ির পাট উঠাতে হবে। ১৮৩২ সনের শেষ ভাগে পুত্র মধুসূদন আর পত্নী জাহ্নবী দেবীকে নিয়ে রাজনারায়ণ তাঁর সদ্য-কেনা খিদিরপুরের গৃহে এসে উঠলেন। জলপথে তাঁরা এলেন, তখন রেলপথ তৈরী হয় নি—বেলেঘাটার খাল দিয়ে রাজধানী কলকাতায় এসে তাঁরা হাজির হলেন। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে স্বতন্ত্র সংসার পাতা যৌথ পরিবারের নিয়ম-বিরোধী। রাজনারায়ণ কৌলিক আচারের ব্যত্যয় ঘটালেন; কোন আদর্শবাদের আহ্বানে নয়—অবস্থার তাগিদে। রাজনারায়ণ ব্যবহারবাদী ব্যক্তি।

রাজনারায়ণ আমাদের শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা অনেকগুলি জানতেন। তন্মধ্যে একটি অনুজ্ঞা তাঁর বড় আদৃত—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—মনুসংহিতার অন্য সংহিতায় তাঁর সংস্থিতি ছিল না, এটিই তাঁর বড় প্রিয়। পরবর্তী কালে তিনি পিণ্ড লোপের ভয়ে পরপর বিবাহ করেন। পুত্র মধুসূদন খ্রীস্টান হয়েছেন। সে তো পিণ্ডের অধিকারী নয়।

বিবাহ বারংবার করেছেন, কিন্তু জাহ্নবী দেবীর প্রতি তাঁর আন্তরিক টান তিনি গোপন করেন নি। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এইটুকু পত্নীপ্রেমও উল্লেখনীয়—সে যুগে নারীর সার্থকতা শুধু সন্তান ধারণের জন্য। মধুসূদনের পিতা তবু জাহ্নবী দেবীর মর্যাদা একটু স্বীকার করেছেন। শত অবমাননা ও অমর্যাদার মধ্যেও এই স্বীকৃতি মনে রাখবার মত।

রাজনারায়ণের জীবনে নতুন যুগের কিছু কিছু ভাবনা প্রকাশলাভ করেছিল। বাঙালী হিন্দুর সমকালীন সংসার-ভাবনায় এইসব আচরণ সহজ সঙ্গত ছিল না। রাজনারায়ণ নবীনতা আমদানি করলেন, কিন্তু গভীরতা নয়।

খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো, মাসতুতো, পিসতুতো—আরও নানা জ্ঞাতি-কুটুম্বদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মানুষ হন নি মধুসূদন। তার ফলে ছোটবেলা থেকে একটা সংসারের যাবতীয় উদ্বেগ-আবেগ আদর-যত্ন তাঁর মস্তকেই

বর্ধিত হয়েছে। মধুর আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের মাঝখানে কখনও কখনও অহংবাদ দেখা গেছে, বিশেষ করে কৈশোরের রচনায়। এর জন্য অনেকে বাইরন-প্রভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু এর পিছনে তাঁর শৈশবের পরিবার-জীবনের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। আমাদের যৌথ পারিবারিক জীবনে ব্যক্তি-আমি বহু-আমির সঙ্গে যুক্ত থেকে তার বহু তীক্ষ্ণ কোণের বক্রতা সংশোধন করে নিত। স্বতন্ত্র পরিবারে স্বাতন্ত্র্যবোধই উগ্র হবে, যৌথবোধ নয়। শুধু অভিজ্ঞতা মধুসূদনকে অহংবাদ থেকে রক্ষা করবে; মূরের প্রভাব থেকে, বাইরনের প্রভাব থেকে তাঁকে মুক্ত করবে।

কলকাতায় মধুসূদন একটি পরিবারে একেশ্বর, সকলের মনোযোগের কেন্দ্র। এসেছেন তিনি এখন কলকাতায়। কলকাতা তাঁকে স্বতন্ত্র জীবন দান করবে। মানুষ শুধু দেহে বাঁচে না, মননে বাঁচে, মধুসূদন সেই মনিত জীবনের মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন।

সাগরদাঁড়িকে পিছনে ফেলে এসেছেন। কিন্তু সাগরদাঁড়ি চল্‌তি ট্রেনের কামরা থেকে দেখা ছিটকে-পড়া গ্রাম নয়। দূর প্রান্তরে ছিটকে পড়বে না। নিত্যকাল মধুসূদনের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে—তাঁকে ব্যথার দিনে সম্পদের দিনে আশ্রয় দেবে, আশ্রিত হবে। শুধু কি তাঁর? তা সৃষ্টির কুশীলবেরাও যে পেটরা খুলে বারংবার রত্নহার পরবে, তাতে মণিমুক্তা যোগান দেবে এই গ্রামীণ স্মৃতি—

> বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
> নাশে বৃক্ষ।............... (১ম সর্গ)
> তরুর কোটরে রাখে শাবক যেমতি
> পাখিটি। (১ম সর্গ)

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর দ্বিতীয় সর্গে স্বর্গ-আখ্যান বর্ণনার পূর্বে নিদ্রাগতা পৃথিবীকে দেখে তাঁর মনে পড়েছে—বাংলার সেই অতি-জানা গ্রাম-জীবনের একটি ছবি—

> ক্লান্ত শিশুকুল
> জননীর ক্রোড় নীড়ে লভয়ে যেমতি
> বিরাম।

এই সত্য সুপ্তির ছবি তো কলকাতা থেকে তুলে আনা যায় না, আনতে হয়েছে সাগরদাঁড়ি থেকে। সারা জীবন তিনি কর্মচঞ্চল, নীড়-চঞ্চল, তিনি

ছটফট করে বেড়িয়েছেন। গতিশীলতাই নবজীবনের চিহ্ন, একথা শাস্ত্র পড়ে তাঁকে জানতে হয় নি—বাঁচতে গিয়ে তিনি জেনেছেন। সাগরদাঁড়ি থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে ইউরোপ, কখনও ইংল্যাণ্ড, কখনও ফ্রান্স, কখনও ইটালি, তারপর আবার কলকাতা। কিন্তু স্থায়ী ঠিকানা বোধ হয় সাগরদাঁড়ি।

তাঁর জীবনের মত তাঁর সাহিত্যে সাগরদাঁড়ি সদা বিরাজমান। সাগর-দাঁড়িকে ভালবেসেই তিনি বঙ্গভূমিকে ভালবেসেছেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ স্বর্গ পর্যটন শেষ করে যখন মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনমুখী, 'তখন এক 'কুসুম-কুন্তলা' পৃথিবীতে অবতরণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি সেদিনের অবতরণে মাটিতে পা ফেলা সম্পূর্ণ হয় নি। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা শেষ হলে তিনি এই পৃথিবীকে 'শ্যামা জন্মদে' বলে অভিহিত করবেন। কারণ তখন তাঁর পৃথিবী-সহবাস সম্পূর্ণ হয়েছে। নির্বিশেষ তখন বিশেষ হয়েছেন।

কবি জয়দেব তাঁর ভূ-প্রকৃতিকে শুধু মেঘভারে শ্যামঘন দেখেছিলেন ; কিন্তু মধুসূদন নির্মেঘ বঙ্গভূমিকে শ্যামবরণা দেখেছেন। এর একমাত্র কারণ মধুসূদন সাগরদাঁড়ির কবি ; জয়দেব কেন্দুবিল্বের কবি। দুই জনের ভূগোল দুই বিপরীত বর্ণা, দুই বিপরীত ধর্মা।

পাদটীকা

১. Bengal District Gazetteers—Jessore 1912. Vol. 30, page 44.

২. Bengal District Gazetteers—Khulna 1912.

৩. মহারাষ্ট্র পুরাণ—গঙ্গারাম দত্ত।

৪. The Economic History of India—Romesh Dutt 1970, p. 298-299.

॥ ১ ॥

১৮৩২ সনের শেষ ভাগ—যশোহরের এক গণ্ডগ্রাম থেকে একটি শ্যাম বর্ণ ছেলে তার রোগা পাতলা দেহ নিয়ে কলকাতার খিদিরপুর পল্লীতে এসে উপনীত হোল। মুখে তার যশুরে বাঙাল ভাষা; শিক্ষাসহবতে গ্রাম্য, আচার-ব্যবহারেও তথৈবচ। গ্রামের সমবয়সী খেলুড়েদের ছেড়ে এসে কেমন-যেন একটু মনমরা।

খিদিরপুর পল্লী তখন খুব জমজমাট নয়, ভূকৈলাসের রাজবাড়ি ঘিরেই যা-কিছু সমারোহ। দূরে বন্দর—জাহাজ ভিড়বার ঘাট। সেখানে কিছু লোকজন আনাগোনা করে। নানা জাতের ফিরিঙ্গীদের সংখ্যাই সেখানে বেশি।

মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের গৃহ বড় রাস্তার উপর। আশেপাশে গৃহ আছে। তার একটির মালিক রামকমল মুখোপাধ্যায়। ভদ্রলোক নিঃসন্তান; তবে ভাগ্‌নেরা তাঁর সে-অভাব পুষিয়ে দিয়েছে। সঙ্গচ্যুত মধুসূদন অচিরেই এঁদের সাথী হয়ে উঠলেন।

মধু ছিলেন লাজুক প্রকৃতির ছেলে; ঐ তিনটি বালক ছাড়া জননী জাহ্নবী দেবীই তাঁর সঙ্গী সত্যিকারের। ঘুরে-ফিরে মায়ের কাছেই তিনি আসেন, মায়ের কাছে তিনি বসেন। মায়ের আঁচলের নিধি মধু; পুত্রের সঙ্গে ঐ তিনটি শিশুও জাহ্নবী দেবীর স্নেহের ভাগীদার হয়। মধুর মা-কে ওরা 'মা' বলে ডাকতে শুরু করে।

মা ছিলেন অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বাবাও দূরের লোক নন। একমাত্র সন্তান বলে, এবং পর পর দুইটি সন্তানের অকাল-মৃত্যু ঘটেছে বলে একটু বেশিই আদর দিতেন রাজনারায়ণ।

রাজনারায়ণ তখন দু'হাতে পয়সা রোজগার করে চলেছেন। সদর দেওয়ানী আদালতে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছে; প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কৌশুলি। বড় বড় মামলায় ওঁদের কারো না কারো বিপক্ষে তাঁকে দাঁড়াতে হয়। প্রসন্নকুমারের মত বৈদগ্ধ্য তাঁর ছিল না। রমাপ্রসাদ রায়ের মত পিতৃগৌরব ও শিক্ষাগৌরবও তাঁর ছিল

না। তবু রাজনারায়ণ পেশার সূত্রে প্রসন্নকুমারের সঙ্গে ছিলেন পরিচিত, রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলতেন।

তখন শহর কলকাতা নানা ভাবের তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ, বিচলিত এবং উদ্দীপ্তও বটে।

প্রসন্নকুমার ছিলেন রামমোহনের ভাবশিষ্য; এবং প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্ঞাতিভাই ও বিশ্বস্ত সহযোগী। শুধু কৃতী কৌশুলি নন, শুধু সম্পদ উপার্জনকারী সফল মধ্যবিত্ত নন। তাঁর স্বোপার্জিত সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর সদ্য-আহরিত নবীন জীবনবোধ। রাজনারায়ণ দত্তের ব্যক্তি-জীবন প্রসন্নকুমারের ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে সবটুকু পথ একত্রে যেতে পারে নি, যদিও উভয়ের একমাত্র সন্তান খ্রীস্টান হয়ে গিয়েছিল।

রাজনারায়ণ তখনকার ভাব-আন্দোলনের কোন পক্ষেই ছিলেন না— না রক্ষণশীল, না উদারনীতিক। তিনি নিতান্তই ছিলেন বিষয়-অনুরাগী। শহর কলকাতার নতুন নতুন ভাব-আন্দোলনের প্রতি তাঁর কোন মনোযোগ ছিল না; রাজনাবায়ণ দত্তের উৎসাহ ছিল কলকাতার বৈভব-সম্পদের প্রতি। ভালো পোশাক, ভালো খাদ্য, ভালো পানীয়—যে সূত্রেই আসুক, তাকে সংবর্ধনা জানাতে তিনি কার্পণ্য করতেন না। তিনি উনিশ শতকে বসবাস করে আঠারো শতকের মনোভাব পুষে রেখেছিলেন—তিনি ধর্মকর্ম যে খুব মানতেন, তা নয়। তবে কৌলিক আচারে বিশ্বাসী ছিলেন। এক কথায় তিনি ছিলেন 'এপিকিউরিয়ান'।

রাজনারায়ণের কাছে জীবনের উদ্দেশ্য হোল উন্নতি করা, উন্নতি করার অর্থ ধন উপার্জন করা। টাকা, আরও টাকা, শুধু টাকা। আর যেমন উপার্জন, তেমন ব্যয়। বরং উপার্জনের অনুপাতে সঞ্চয় কম।

উপার্জনের সার্থকতা হোল ব্যয়ে। দত্তেরা, বিশেষ করে রাজনারায়ণ দত্ত টাকা গুণে খরচ করেন না।

রাজনারায়ণ কয়েকটি তালুক কিনেছিলেন, কিন্তু রোজগারের অনুপাতে তার পরিমাণও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

॥ ২ ॥

খিদিরপুরের ঐ বিলাসবহুল জীবনের অভ্যন্তরে গ্রাম্য বালক মধুসূদন সহসা নিক্ষিপ্ত হলেন।

রাজনারায়ণ নিজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছেন। উনি চাইবেন তাঁর পুত্রও অনুরূপ কৃতী হোন। তাঁর কাছে উন্নতির অর্থই বিত্ত অর্জন। তখন উন্নতির রাজপথ হোল ইংরেজী শিক্ষা। ফারসী শিক্ষার দিন গত হয়ে যাচ্ছে, এ তিনি স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন। ছেলেকে স্কুলে দিতে হবে। কিন্তু কোন্ স্কুলে দেবেন?

জীবনীকার বলেছেন, মধুসূদনকে খিদিরপুরের একটি ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন রাজনারায়ণ।[১] খিদিরপুরে তখন কি কোন ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল? সম্ভবত নয়। আলিপুরে ও খিদিরপুরে মিশনারীরা যে দুইটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাঁর কোনটিই চল্লিশ দশকের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত নয়। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন, মধু গ্র্যামার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। পরলোকগত হরিহর শেঠের পুরানা কলকাতার বিবরণ থেকে তিনি ঐ স্কুলের সন্ধান পেয়েছেন।[২] সম্ভবত ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত তথ্য ভ্রমশূন্য নয়। আলিপুরে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৩৬ সনে[২]. (Bengal Directory, 1836); আর খিদিরপুরে স্থাপিত হয় ১৮৪৬ সনে। এই দুইটি বিদ্যালয়ই ভবানীপুর খ্রীস্টীয় মিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হোত।[৩] মিশনারী হেরাল্ড পত্রিকায় দেখা হচ্ছে—সিঃ ইভান্স বেনে-ভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন ছাড়া আলিপুরে, খিদিরপুরে ও কুলী বাজারে আরও তিনটি বিদ্যালয় খুলেছেন।[৪]

এর পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ হয়তো ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন—কখনও স্বগৃহে বা কখনও ঘরভাড়া করে। কিন্তু সেগুলির গুরুত্ব বিশেষ কিছু নেই।

অধ্যাপক ঘোষ বলেছেন, মধু গ্র্যামার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, এবং আরও বলেছেন, এই গ্র্যামার স্কুল পেরেন্টাল এ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনের এক ভাঙ্গা অংশ। অভিভাবকদের উদ্যোগে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত এ খবরটিও ঠিক নয়। পেরেন্টাল এ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশন ও গ্র্যামার স্কুল একই বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয়। পেরেন্টাল এ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশন ও গ্র্যামার স্কুল ১৮২৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] প্রথমোক্ত বিদ্যালয়টি প্রথমে ১২ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ১৮৩৬ সনে পার্ক স্ট্রীটের এক বাড়িতে উঠে যায়; পরে আবার ১৮৪২ সনে ঐ স্কুলটি ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে উঠে আসে। বিদ্যালয়টির সংগঠক ছিলেন ডিরোজিওর সহযোগী জে. ডবল্যু.

রিকেটস।[৬] ক্যালকাটা গ্রামার স্কুল প্রথমে ১১নং পার্ক স্ট্রীটে, পরে ১৮২৬ সনে ৮নং লাল বাজারে, এই ঠিকানায় বসতে থাকে।[৭]

মধু যদি গ্রামার স্কুলে ভর্তি হয়ে থাকেন, তবে তাঁর পক্ষে লালবাজারে অবস্থিত স্কুলে ভর্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তাঁর বাবা সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল; আদালতে যাবার পথে পুত্রকে তিনি স্কুল দিয়ে যেতে পারতেন, আবার ছুটির পর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারতেন। গ্রাম থেকে আসা ছাত্রের জন্য এই ব্যবস্থাই ছিল সুসঙ্গত।

গ্রামার স্কুল ছিল একটি আধুনিক বিদ্যানিকেতন। অনেকটা ডিরোজিওর শিক্ষাগুরু ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্মতলা এ্যাকাডেমির আদর্শে গঠিত। গ্রামার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিঃ আর· হ্যালিফ্যাক্স। সুশিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। অনুষ্ঠান-পত্র (Prospectus) থেকে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচী ও শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি— "The plan of education comprised the study of Hebrew, Latin, Greek, French and English, as well as of the Oriental Languages ; History, both Sacred and Profane, Geography, Arithmetic, Book-keeping, Mathematics, Mechanics, Practical Chemistry etc, etc, etc..."[৭ক]

মধুসূদন যদি গ্রামার স্কুলেব ছাত্র হন, তাহলে, এখানে তিনি আধুনিক শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজী রচনার মধ্যে যে ইংরেজিয়ানার সুবাস আছে, তা কোন ফিরিঙ্গী স্কুলের শিক্ষা ব্যতীত অর্জিত হতে পারত না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। আরও একটি তথ্য থেকে অনুমান করা চলে যে, তিনি ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় তিনি ল্যাটিন ভাষা জানতেন, অথচ হিন্দু কলেজে ল্যাটিন শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মধুসূদন এই ক্রুপদী ভাষাটি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? গ্রামার স্কুলের পাঠক্রমে ল্যাটিন অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধুসূদন হিব্রুও জানতেন। হিব্রু পাঠও তিনি এখান থেকেই করেছিলেন, পরে বিশপস্ কলেজে তার পুনর্মার্জনা চলে।

মধুসূদন কোন্ সালে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন? এ বিষয়ে দুইটি মত আছে। ১· জীবনীকারেরা বলেছেন ১৮৩৭ সনে; ২· ব্রজেন্দ্রবাবু বলেছেন ১৮৩৩ সনে।

প্রথমে ব্রজেন্দ্রবাবুর মতটি বিবেচনা করে দেখা যাক।

সমাচার দর্পণে প্রকাশ যে, ১৮৩৪ সনে ৭ই মার্চ টাউন হলে অনুষ্ঠিত হিন্দু কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় মধুসূদন দত্ত নামধেয় জনৈক ছাত্র শেক্সপীয়রের নাটক থেকে নির্বাচিত দৃশ্য আবৃত্তি করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু অনুমান করেছেন যে, এই ব্যক্তিই কবি মধুসূদন দত্ত। ব্রজেন্দ্রবাবু Asiatic Journal-এ উদ্ধৃত একটি সংবাদ থেকে একথাও জেনেছেন, ছাত্রদের হিন্দু কলেজে ভর্তির বয়স-সীমা নিম্নরূপ : জুনিয়ার বিভাগে আট থেকে বারো, সিনিয়ার বিভাগে সর্বোচ্চ বয়স-সীমা হোল চোদ্দ ; সর্বনিম্ন বারো।[৮]

মধুসূদনেব জন্ম সন ১৮২৪ ; ১৮৩৩ সনে তিনি নয় বৎসরের বালক। এবং ঐ বৎসর তিনি গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছেন, এই হোল ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুমান। ন্যূনতম বয়স-সীমা বা সর্বোচ্চ বয়স-সীমা—কোনটিই তিনি পার হয়ে যান নি। ব্রজেন্দ্রবাবুর এইসব অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। কেন নয়, তার হেতু বহুবিধ।

আমরা একে একে তা উপস্থিত করছি।

১. ব্রজেন্দ্রবাবু যদি মধুসূদন দত্তের সহ-আবৃত্তিকারীর পরিচয় ও বয়স তল্লাস করতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন এইটি কবি মধুসূদন নন। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল হলেন মধুসূদনের সহ-আবৃত্তিকারী। ইনি ১৮৩৫ সনে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেন। ইনি ছিলেন রাজা দিগম্বর মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সহাধ্যায়ী।[৮ক] দিগম্বর মিত্র মধুর সহপাঠীর অগ্রজ, আর রামতনু ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তা ছাড়া উঁচু ক্লাসের ছাত্ররাই শুধু বার্ষিক উৎসবের আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেত।

   ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন।

২. ব্রজেন্দ্রবাবু আবিষ্কৃত (?) এই মধুসূদন দত্ত পৃথক ব্যক্তি। পাঠ সমাপ্তির পর এই মধুসূদন ১৮৩৫ সনে হিন্দু কলেজে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩৬ সনে শিক্ষা দপ্তরের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে, জুনিয়ার বিভাগে তিনি শিক্ষকতা করছেন।[৯] ১৮৪০ সন পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা করেছেন। ১৮৪১-৪২ সনের রিপোর্টে তাঁর নাম নেই। সম্ভবত ঐ সময়ে তিনি পদচ্যুত হন বা পদত্যাগ করেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৫৫ টাকা।

১৮৩৮ সনে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা প্রতিষ্ঠিত হলে তার সদস্যদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের পার্শ্বে মধুসূদন দত্তের নাম ছিল। ইনি যে কবি মধুসূদন নন, তার কারণ মধুর সহপাঠী কারও নামই এখানে শোভা পাচ্ছে না।[১০]

১৮৪৮ সনে কবি মধুসূদন মাদ্রাজে পাড়ি জমাবেন, তখন কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে একজন মধুসূদনকে দেখতে পাই। ১৮৪৮-১৮৫১ সনে তত্ত্ববোধিনী সভায় চাঁদাদাতাদের মধ্যে এই মধুসূদনকে দেখতে পাই। (১৭৭০—১৭৭৩ শকাব্দ)। ইনি নিঃসন্দেহে কবি মধুসূদন নন।

১৮৪৮ সনে এই পৃথক মধুসূদন দত্তই তাঁর পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করার জন্য আবেদন করেছেন।[১১]

১৮৪০ সনে হিন্দু কলেজ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে এই মধুসূদনই নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে গেছেন। The Anglo-Indian Academy নামে তিনি মধ্য কলকাতায় চাঁপাতলায় একটা স্কুল স্থাপন করেন। এবং এই সংবাদে বলা হয়েছে যে, তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক।[১২] ইনি অ-কবি মধুসূদন।

১৮৭৩ সনে এই মধুসূদন দত্তই ক্যালকাটা নেটিব হসপিটালকে এক সহস্র টাকা দান করেছেন।[১৩] এই সমস্ত তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ১৮৩৪ সনের মধুসূদন দত্ত পৃথক ব্যক্তি।

কবি মধুসূদন ছিলেন মুখচোরা ছেলে, অতি ঘনিষ্ঠ দুই একটি বন্ধুর কাছে ছাড়া তিনি কখনও মুখ খুলতেন না। তাই ১৮৩৭-১৮৪২ সনের মধ্যে বছরের পর বছর বাৎসরিক পরীক্ষায় ছেলেরা প্রবন্ধ পড়েছে, কবিতা আবৃত্তি করেছে, বিতর্কে নেমেছে; কিন্তু মধু তাতে যোগ দেন নি। গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, দয়ালচন্দ্র রায়, ভোলানাথ চন্দ্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, হরচন্দ্র দত্ত কোন-না-কোন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে নিজেদের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এমন কি বন্ধুবর গৌরদাস পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু মধু এসব থেকে দলছুট এবং পলাতক।

তাই জীবনীকারেরা যা বলেন, আমরা তাই মেনে নিই। ১৮৩৭ সনেই তিনি হিন্দু কলেজে যোগদান করেছিলেন। আর তা ছাড়া মধুসূদনের

সহাধ্যায়ীদের মধ্যে কেউ তাঁকে ১৮৩৯ সনের পূর্বে হিন্দু কলেজে দেখেন নি ; কোন বন্ধুর স্মৃতি-চারণা ১৮৩৯ সনের পূর্বে অগ্রসর হচ্ছে না।

১. "মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত।"

১৮৩৯ সনে ভূদেবের সঙ্গে মধুসূদন একত্রে সপ্তম শ্রেণীতে পড়েছেন, অর্থাৎ জুনিয়ার বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

২. ভোলানাথ চন্দ্র লিখছেন, "আমার মন-দূরবীণ থেকে উঁকি মেরে সুদূর ১৮৪০ সনে দেখতে পাই মধু ১৫ কিম্বা ১৬ বৎসরের একটি বালকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।"[১৪] এই প্রসঙ্গও ১৮৪০ সনের।

৩. গৌরদাস বসাক লিখছেন, "আমার সঙ্গে মধুর পরিচয় হয় ১৮৪০ সনে, যখন আমরা উভয়েই ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। দ্রুত সেই পরিচয় উষ্ণ বন্ধুত্বে পরিণত হোল। তারপর থেকে আমরা আগাগোড়াই একসঙ্গে (ভূদেব, শ্যাম ও বন্ধু সহ) প্রতি ক্লাসে পড়েছি। প্রত্যেক পরীক্ষায় একত্রে প্রমোশন পেয়েছি, এমন কি পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশনের সময় আমরা যে লম্বা লাফ দিয়েছিলাম, তখনও আমরা একসঙ্গেই প্রমোশন পাই।"[১৫]

এটাও ১৮৪০ সনের কথা।

৪. "আমি যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি মধুসূদন তখন আমার সঙ্গে পডিত। তখন হিন্দু কলেজের সিনিয়ার স্কুল বিভাগে তিন শ্রেণী ও কলেজ বিভাগে দুই শ্রেণী মাত্র ছিল।"[১৭] এইসব স্মৃতি-চারণা থেকেও পরিষ্কার যে, মধু ১৮৩৭ সনের পূর্বে হিন্দু কলেজে ভর্তি হতে পারেন না।

কলকাতার ইংরেজী শিক্ষা বা আধুনিক শিক্ষার আদি যুগে তিন জন শিক্ষকের নাম স্মরণীয়। ডেভিড ড্রামণ্ড, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং ক্যাপটেন ডেভিড লিস্টার রিচার্ডসন। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করলেন তখন রিচার্ডসনের যুগ। রিচার্ডসন ১৮৩৫ সনে হিন্দু কলেজে যোগ দিয়েছেন। রিচার্ডসন আর ডিরোজিও ভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষক ছিলেন। ডিরোজিও ছিলেন নব্যভাবের উৎসাহী সমর্থক ; আর রিচার্ডসন ছিলেন রক্ষণশীল। ডিরোজিও সাহিত্য শুধু পাঠের

আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইতেন না, তাকে সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চাইতেন। তিনি মনে-প্রাণে নিজেকে ভারতীয় মনে করতেন; তিনি লণ্ডন শহরের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতেন না। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতেন ভারতের বর্তমান অধোগতি দেখে। কী রাষ্ট্রীয়, কী সামাজিক—সর্ববিধ অধোগতি তাঁকে বেদনার্ত করত। তিনি চাইতেন তার অবসান। তাই বেকন, লক, হিউম, পেইন—তাঁর কাছে শুধু পুরাতনের সমালোচনা মাত্র নয়, নতুন যুগের কর্মযজ্ঞের মন্ত্রও বটে। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন, তখন ডিরোজিও আর ঐ কলেজের সঙ্গে যুক্ত নেই। তিনি তখন মরজগতেও নেই; কিন্তু তাঁর স্মৃতি, তাঁর আদর্শ অম্লান রয়েছে। তাঁর ছাত্রেরা,—রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক গুরুর আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছেন। কখনও সভা-সমিতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, কখনও পত্রিকা প্রকাশ করে, তাঁরা নবীন ভাবাদর্শ প্রচার করে চলেছেন। ডিরোজিওর শারীরিক উপস্থিতি অপেক্ষা এই উপস্থিতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রিচার্ডসন রাজনীতি-বিরহিত সাহিত্য পঠন-পাঠনের উপর জোর দিলেন; তিনি ছাত্রদের সমাজ-জিজ্ঞাসু না করে সাহিত্যরসিক করার দিকে নজর দিলেন বেশি।

১৮৩৭ সন থেকে ১৮৪৩ সন ছয় বৎসর মধুসূদন হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন।

ছাত্র হিসাবে হিন্দু কলেজে মধুসূদনের কৃতিত্ব পরিমাপ করা কষ্টকর—অন্তত আমাদের দেশে বিচারের জন্য যে প্রকার মানদণ্ড প্রচলিত আছে। মধু পরীক্ষায় সর্বদা খুব ভাল ফল দর্শাতেন না, অথচ তিনি ছিলেন সেরা ছাত্র।

জানি আমরা সকলেই যে, পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের সত্যিকার পরিমাপ হয় না। অথচ বলি একথা আমরা সকলেই,—যে-ছাত্র পরীক্ষ ভাল ফল দেখায়, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী।

মধুসূদন সম্বন্ধে তাঁর বন্ধুরা যা বলেছেন, তা উৎকলিত করে দেওয়া গেল।

১. "মধু ও আমি যতবার একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছি, প্রায় সকল বারই আমি উঁহার উপরে হইয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদিগের মধ্যে অতুল্য ছিল বলিয়াই আমি জানিতাম। কর্মক্ষেত্রে

অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্তত ৫০ লক্ষ ছাত্রের সংশ্রবে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখিতে পাই নাই।”[১৮]

সম্ভবত এই উক্তি মৃত বন্ধুর প্রশস্তিসূচক নয়; কারণ যথার্থ “ভারতীয়” ভূদেব মধুসূদনের ইউরোপীয় অনুগামিতা সমর্থন করতে পারেন নি। “দুঃখের বিষয়, হেয় অনুকরণ প্রবৃত্তি এবং বিজাতীয় পথ অবলম্বন হেতু, মধুর সেই প্রতিভা স্ফূর্তি পাইয়া সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়ে বিকশিত হইতে পারে নাই।”[১৯]

২. গৌরদাস মধুব সম্বন্ধে বলেছেন “জিনিয়াস”। মধুর ছেলেমি ও বাড়াবাড়িগুলিকেও তিনি প্রতিভাভাজনের কাজ বলে মন্তব্য করেছেন। **“He was undeniably the Jupiter among the bright stars of the College.”**[২০]

কলেজের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মধ্যে তিনি ছিলেন বৃহস্পতি, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

৩. কৈশোরে সাহিত্য রচনায় যিনি ছিলেন মধুর প্রতিযোগী, সেই বঙ্কুবিহারী দত্ত লিখছেন, “আমি কলেজজীবনের প্রথমে ছিলাম মোটাবুদ্ধির ছাত্র, কিন্তু পরিশ্রম মেহনত করে কলেজের অন্যতম জ্যোতিষ্ক হয়ে উঠলাম, তবে মধু ছিল আমাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, সে ছিল বৃহস্পতি।”[২১]

৪. আর এক সহপাঠী, যিনি মধুকে আদৌ প্রীতির চোখে দেখেন নি, খ্রীস্টান হয়েছিলেন বলে নানা অপবাদ ছাপার অক্ষরেই সাজিয়ে রেখে গেছেন, তিনিও ছাত্র মধুসূদনকে তারিফ না করে পারেন নি। “মধুসূদন দত্তের আমি একজন সহাধ্যায়ী ছিলাম। বয়সে মধুসূদন আমা অপেক্ষা ছোট ছিল। কিন্তু এমনই তাহার বিদ্যাবুদ্ধির জোর যে আমাদের অনেক পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া, লম্ফে লম্ফে নিম্ন শ্রেণী সকল অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সে আমাদের সহাধ্যায়ী হইয়াছিল।”[২২]

মধুর অন্যান্য সহাধ্যায়ীও মধুর অনন্যসাধারণ প্রতিভার কথাই বলেছেন। পাইকপাড়ার রাজাদের দেওয়ান শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় মধুর সহপাঠী ছিলেন। তিনিও অতীব সুখ্যাতি করেছেন।

মধুসূদন ১৮৪৬ সনে জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। ঐ বৎসরই বৃত্তি পরীক্ষা চালু হয়। পরীক্ষার কৃতিত্ব দেখিয়ে ভূদেব প্রভৃতির সঙ্গে মধু বৃত্তি লাভ করেন।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখানোর ব্যাপারে তাঁর কোন উৎসাহ ছিল না। এমন কি, এই সময়ে যে-প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মধু তাতেও যোগ দিতে চান নি। পরে বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে তিনি যোগ দিলেন; এবং প্রথম হয়ে একটি স্বর্ণপদক লাভ করলেন।

হিন্দু কলেজে মধুসূদন ছিলেন সত্যিকারের ছাত্র, আদর্শ ছাত্র নন। তাই যে-বিষয়ে তাঁর কোন অনুরাগ ছিল না, সে বিষয়ে তিনি ক্লাস করতেন না। সর্বযুগের ছাত্রদের মত ক্লাস ফাঁকি দিতে তাঁর বিবেকে বাধত না।

রীজ সাহেব গণিতের শিক্ষক ছিলেন। "রীজ সাহেব যদিও রিচার্ডসন সাহেব প্রভৃতির ন্যায় খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন না, তথাপি তিনি গণিতবিদ্যায় একজন ধনুর্দ্ধর ব্যক্তি ছিলেন।"[২৩] মধুসূদন এঁর ক্লাসে সচরাচর উপস্থিত থাকতেন না; তিনি একা নন, তাঁর মত অন্যান্য সাহিত্যপ্রেমী, যথা বঙ্কু (এই বঙ্কুবিহারী অঙ্কের পরীক্ষায় সাদা খাতা জমা দিয়েও 'প্রমোশন' পেয়েছিলেন, শুধু সাহিত্য পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শনের জন্যই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।) এবং রাজনারায়ণ বসুও অঙ্কে ভীতিবশত বেলিং টপ্‌কে সংস্কৃত কলেজের দোতলার হলঘরে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতেন।

মধু তখন স্বপ্ন দেখছেন যে, মস্ত বড় কবি হবেন। "Oh! how should I like to see you write my life! I happen to be a great poet which I am almost sure I shall be, if I can go to England."

অথচ এই উদ্ভিন্ন মহাকবি একদিন সবাইকে তাক লাগিয়ে একটি কঠিন অঙ্ক বোর্ডে গিয়ে অনায়াসে কষে দিলেন। সেদিন ক্লাসের কোন গণিতবীরই এই অঙ্কটি সমাধান করতে পারেন নি। মধু "প্রণালী শুদ্ধ রীতি অনুসারে" অঙ্কটি কষে তো দিলেনই, সেই সঙ্গে গণিতবীরদের উদ্দেশে একটি মুখরোচক মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন—"And so. Shakespeare could be Newton, if he tried."

বন্ধুদের মধ্যে কয়েকদিন আগে তর্ক বেধেছিল—কে বড়? নিউটন, না শেক্সপীয়র? বলা বাহুল্য আজ যেন সে বিতর্কের সমাধান হয়ে গেল!

শেক্সপীয়র চেষ্টা করলে নিউটন হতে পারেন, কিন্তু নিউটন কদাচ শেক্সপীয়ার নয়!

মধু ক্লাস ফাঁকি দিতেন; মধু সব শিক্ষককে সমান চোখে দেখতেন না।

রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন বাংলার শিক্ষক; মধু তাঁকে বড় বিশেষ সম্মান করতেন না। অবশ্য এই অবহেলা রামচন্দ্র মিত্রের প্রতি অবহেলা নয়, বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা। তখন প্রবোধচন্দ্রোদয় ছিল হিন্দু কলেজের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত; এই বই পড়ে বাংলা ভাষার প্রেমে পড়া কষ্টকর। বিশেষ করে যে-ছাত্র একই সঙ্গে বেকন পড়ছে, হিউম পড়ছে, মূর পড়ছে, বার্নস পড়ছে, বাইরন পড়ছে। শুধু রসের বা ভাবের কথা নয়, ভাষার পারিপাট্যের কথা স্মরণ রাখা দরকার।

রামতনু লাহিড়ীকে মধু সম্মান করতেন, যদিও তিনি ছিলেন জুনিয়ার শিক্ষক। 'ক্যাপটিভ লেডি' মাদ্রাজ থেকে যাঁদের কাছে পাঠিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রামতনু লাহিড়ীর নাম আছে। মধু কার সাহেবকে পছন্দ করতেন না, কার ছিলেন সিনিয়ার বিভাগের শিক্ষক। ডি. এল. আর. ছুটিতে গেলে, কার সাহেব কলেজের দায়িত্বভার নিলে, মধু কলেজে যেতে অস্বীকার করলেন। কারের প্রতি তাঁর এতই বিতৃষ্ণা! কার সাহেব সম্বন্ধে তিনি অনেক কটু মন্তব্য করেছেন চিঠিপত্রে।

এই ভদ্রলোক পূর্বে মাদ্রাজে বিশপ করিস গ্র্যামার স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন।*

ছাত্র যদি নির্বাচন করে সে কার ক্লাসে যোগ দেবে, আর কার ক্লাসে যোগ দেবে না, তাহলে ব্যাপারটা বড় গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়। এখানেও দেখতে পাই মধু বড় সুবোধ ছাত্র ছিলেন না, আদর্শ বিদ্যার্থী নন; মধু সর্বকালের সাধারণ ছাত্র। মধু হিন্দু কলেজে বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা দেখিয়েছিলেন। এ অপরাধ কী একা মধুর! রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণ-

*রেভারেণ্ড ড্যানিয়েল করিস (Rev. Daniel Corries)-এর নামানুসারে এই বিদ্যালয়টি গঠিত হয়। রেভারেণ্ড করিস মাদ্রাজের প্রথম বিশপ, কেম্ব্রিজে লেখাপড়া শেষ করে সহপাঠী ও বন্ধু জোসেপ পারসনের সঙ্গে তিনি কলকাতায় আসেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে কলকাতায় হ্যানা আয়ারসকে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর পরিবার অবশ্য কলকাতায় দুই পুরুষ বসবাস করেছে। তাঁর স্ত্রী ১৮৩১ সনে পরলোকগমন করেন, সামান্য রোগ ভোগের পর ১৮৩৭ সনের ২১-এ ডিসেম্বর বিশপ করিস পরলোকগমন করেন। তাঁর নামানুসারে একটি গ্র্যামার স্কুল মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ঐ বিদ্যালয়টি ডোভটন কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়।২৪

মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন, এমন কি প্যারীচাঁদ কি ছাত্রাবস্থায় বাংলা ভাষার প্রতি সমাদর দেখিয়েছিলেন? তাঁদের পরবর্তী যাঁরা, সেই রাজনারায়ণ, বঙ্কুবিহারী, ভোলানাথ, গোবিন্দ দত্ত, কেউই বাংলা ভাষার প্রেমিকরূপে ছাত্র-জীবনে দেখা দেন নি। এক ভূদেব ছাড়া কেউই বাংলা ভাষার চর্চায় খ্যাতিমান হন নি। বঙ্কু, ভোলানাথ, গোবিন্দ তো সারা জীবন ইংরেজী-চর্চাই করে গেলেন।

মধু ছাত্রজীবনে ভালো বাংলা জানতেন না, এই রকম একটা সংবাদ সর্বজন-স্বীকৃতি লাভ করেছে। যেন মধুই শুধু জানতেন না!

মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে একটি ভদ্রগোছের চাকরীর চেষ্টায় মধু নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। মধুর মত ভূদেবও এই পরীক্ষায় বসেছিলেন—চাকরীটি অবশ্য ভূদেবেরই হয়। তখন মধুর বাংলা জ্ঞান কেমন ছিল, এ বিষয়ে ভূদেবের বক্তব্য এই রকম—"নর্মাল স্কুলের উক্ত পরীক্ষা দিবার সময়ও মধুর বাংলা ভাষায় তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে "পৃথিবী" লিখিতে "প্রথিবী" লিখিত।" (জীবনচরিত, ৬৫৮)। এই ঘটনার মাত্র দুই বৎসর পরে মধু 'শর্মিষ্ঠা' নাটক লিখেছেন। ভূদেব সম্ভবত বানান শুদ্ধির সঙ্গে ভাষাজ্ঞানকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। শব্দের অশুদ্ধ বানান লেখা মধুর একক অযোগ্যতা নয়। এটা ছিল তখনকার বাংলা চর্চার সাধারণ মান। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের তেত্রিশতম প্রতিবেদনে দেখতে পাই হিন্দু কলেজের ছাত্ররা বানান বিষয়ে মুক্ত-লেখনী। তারা 'বাহ্যিক' লিখছে 'বাজ্জিক', 'অন্য' লিখছে 'ওন্য', 'বিস্তৃত' লিখছে 'বিস্তৃৎ', 'শ্রবণ করা' লিখছে 'স্রবন করা'। প্রতিবেদনে বলা হোল "A notion widely prevails that none can be a good Bengalee scholar that is altogether ignorant of the language of the mother tongue; the consequence is that scarcely a single writer undertakes to write even with orthographical correctness without some knowledge of the Sanskrit grammar. I do not however agree with those who think that the Bengalee cannot be cultivated independently of Sanskrit."[২৫] তের বৎসর পরে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর দ্বিতীয় সর্গ লেখা চলছে। একজনকে দিয়ে কপি করিয়ে নিয়ে মধু তা রাজনারায়ণকে

পাঠাচ্ছেন ; সেই সঙ্গে তিনি ঠিক একই কথা লিখেছেন—"The copy, I enclose, though neatly written, is so full of bad spellings that I did not know whether you would be able to make anything of it. But you are a first rate fellow and not many years ago, neither you nor I should have thought of it extra-ordinary to see the name শিব written শীব্ or any such orthographical eccentricity."

কবি দীননাথ ধর মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর নকলনবীশ ছিলেন। তিনিই হয়তো রাজনারায়ণকে প্রেরিত নকল তৈরী করেছিলেন।[২৬]

॥ ৪ ॥

হিন্দু কলেজে বাংলা-চর্চার কোন পবিবেশ ছিল না। তখন মধু এক কলমও বাংলা লেখেন নি। তাই বলে বাংলা তিনি পড়তেন না, তা নয়। কৃত্তিবাস, কাশীরাম ও ভারতচন্দ্র তাঁর প্রিয় কবি। প্রবীণ বয়সে হামেশাই তিনি ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতি ব্যবহার করতেন, সেটা সদ্য-অর্জিত জ্ঞানের বিজ্ঞপ্তি হতে পারে না।

ছাত্রাবস্থায় মধু বাংলায় কিছু লেখেন নি ; জীবন-চরিতের লেখক গৌরদাসের উদ্দেশে লিখিত একটি কাব্যমল্লক্রীড়ার (Acrobatics) নমুনা উপহার দিয়েছেন। এটি সাহিত্য পদবাচ্য নয়। খুঁজলে সে-যুগে তাঁর লেখা দুই একটি বিবাহের উপহারও পাওয়া যেত। তা-ও সাহিত্য হোত না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশীর মূল্য কতটুকু জানি না, তবু হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসাবে মধুসূদন যে যে বই পড়তেন, যে-সব কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখতেন, পরবর্তী সাহিত্যজীবনে সেগুলির কোন মূল্য নেই, এমন কথা বলা যায় না।

হিন্দু কলেজে যার সূচনা, মাদ্রাজে তারই বিকাশ। আবার মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাগমনের পর কলকাতার মৃত্তিকাসংস্পর্শে নতুন কাব্য-জীবনের সূচনা। এই পরিবর্তন জীবনের পরিবর্তন থেকে এসেছে। মাইকেলকে যিনি রচনা করেছেন, তিনিই এই পরিবর্তন এনেছেন।

১৮৩৭ সন থেকে ১৮৩৯ সনের মধ্যে মধু কী ধরনের সাহিত্যচর্চা করেছেন, তার কোন নিদর্শন আমাদের হাতে নেই। বন্ধু গৌরদাস হলেন

এই সব নিদর্শনের সংগ্রহকর্তা। ১৮৩৯ সনের পূর্বে তাঁর সঙ্গে মধুর পরিচয় হয় নি ; এই কারণে কোন নমুনা রক্ষিত হয় নি। এমন হতে পারে যে, ১৮৪০ সন থেকে মধুর কবিপ্রতিভার বিকাশ হয়। কৈশোর-যৌবনের সন্ধি-স্থলেই কাব্য-অনুরাগ দেখা দেয়—কাব্য-অনুরাগ জীবন-অনুরাগের অপর নাম। তাই বয়ঃসন্ধির সময়েই তার প্রথম স্পন্দন শোনা যায়।

সাধারণত সকল নবীন লেখককে যা করতে হয়, মধুকেও তাই করতে হয়েছিল। হাতে লেখা পত্রিকায় তাঁর সাহিত্যিক হাতেখড়ি।

"মধু হাতে লেখা এক পত্রিকা বের করল, ঈর্ষাকাতর সিনিয়ার বিভাগের ছাত্রদের সেটা হোল চক্ষুশূল। যাই হোক মধু ছিল নিঃসন্দেহে কলেজের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মধ্যে বৃহস্পতি স্বরূপ।"[২৭]

প্যারীচরণ সরকার মধু অপেক্ষা উঁচু শ্রেণীতে পড়তেন। তিনি মধুকে 'পোপ' বলে ঠাট্টা করতেন। বঙ্কুবিহারী দত্ত লিখেছেন, "তুমি যদি বিষয়টির উপর একটু ভাবো, তাহলে মনে করতে পারবে যে, আমরা যখন ৫ম শ্রেণীতে (সিনিয়ার বিভাগে) পড়ি তখন মধু হাতে লেখা একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিল। তুমি ও আমি তার সঙ্গে যৌথভাবে যুক্ত ছিলাম। এই পত্রিকা সম্ভবত তিন চার মাস টিকে ছিল, বা আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে না ওঠা পর্যন্ত ঐ পত্রিকা টিকে ছিল।"[২৮]

বঙ্কুবিহারী আরও বলছেন, "Captain Richardson read this paper every week, which was no doubt to encourage the writer."[২৯]

ক্যাপটেন রিচার্ডসন প্রতি সপ্তাহে এই কাগজ পডতেন, সম্পাদক মহাশয়কে উৎসাহদান করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

মধু তখন থেকে প্রতি সপ্তাহে নতুন কিছু লিখতেন ; এবং তার দ্বারা বন্ধুদের চমকে দিতেন। এখন থেকে মধু ঠিক করে ফেলেছেন তাঁর জীবনের লক্ষ্য কি ? তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবন কি মূর্তি গ্রহণ করবে ? তিনি কবি হবেন। খুব বড় কবি।

তবে কোন্ জাতের কবি হবেন, কোন্ জাতের কাব্য লিখবেন. তা এখনই ঠিক হয় নি। অভিজ্ঞতা মানুষকে অভিজ্ঞ শুধু করে না, মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করে, কবিকে কবিত্বে।

"Madhu used to keep us in a perpetual stir, in a literary

ferment, as it were, by surprising us everyday with a new sonnet or a fresh poem. D. L. R., our beloved Professor and the guiding angel to his muse used to touch up his poetical exercises during his tiffin hours."[৩০]

মধু বন্ধুদের সর্বদাই উত্তেজনার মধ্যে রাখতেন নিত্য নতুন সনেট বা অন্য কোন প্রকার কবিতা শুনিয়ে। ডি. এল. আর. ছিলেন আমাদের প্রিয় অধ্যাপক। তিনি মধুর রচিত কবিতাসমূহের উপর কলম চালাতেন। তিনি যেন ছিলেন মধুর কাব্যলক্ষ্মীর পরিচালক-দেবদূত। মধু প্রতিদিন আমাদের উত্তেজনার মধ্যে রাখত ; প্রতিদিন হয় কোন নতুন সনেট বা নতুন কোন কবিতা লিখে সে আমাদের বিস্মিত করত।

রিচার্ডসনের দ্বারা শুধু কবিতার সংশোধন হোত না, নানা কবিতায় তাঁর কবিতার অনুসরণ থাকত। রাত্রির উপরে লিখিত সনেট সম্বন্ধে ভোলানাথ বলেছেন, "It is a sonnet in which form a callow pupil is at first apt to court the Muse in imitation of his professor D. L. R. Here let me pay my humble tribute to that beloved tutor, who by his example incited many of us to literary adventures."[৩১]

মধুসূদন রিচার্ডসনের হাতের লেখাটি পর্যন্ত নকল করতে চেয়েছিলেন —বলেছেন বঙ্কুবিহারী। কিন্তু রিচার্ডসনের হাতের লেখা তো সুন্দর ছিল না! ভালবাসার দেবতা সম্ভবত অন্ধ। মধুর হাতের লেখা কিন্তু অসুন্দর ছিল না! মধু বিদেশী লেখকের মঞ্চস্থ নাটক দেখতেন, তাঁর টিকিটও জুগিয়ে দিতেন রিচার্ডসন।

১৮৪০ সনে রিচার্ডসন ছাত্রদের জন্য ইংরেজী সাহিত্যের একটি সংকলন প্রকাশ করলেন। মধু ঐ গ্রন্থের ভূমিকা ও টীকা পড়ে বলে উঠলেন, 'আহা! আমি যদি ঐ গ্রন্থের লেখক হতাম!' আমরা জানি এই উচ্চাশা মধুর কাছে যথেষ্ট উচ্চ নয়। অভিজ্ঞতা মানুষকে শুধু নিজের সীমানা বুঝিয়ে দেয় না, নিজের সীমানা বাড়িয়েও দেয়।

মাদ্রাজ-এ কর্ম-জীবনের প্রথম দু'টি বৎসর রিচার্ডসনের প্রভাব তাঁর উপর অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপর জীবন যেমন পাশ ফিরল, সাহিত্যের আদর্শও তেমন বদলে গেল। না সুন্দর, না ভীষণ—অনায়াসে কেউ কি করতলগত হয়?

১৮৪১ সনের পূর্বে লিখিত কোন চিঠি বা কবিতা, আমরা পাই নি। লেখেন নি, তা মনে হয় না। গৌরদাসের জিম্মায় যা ছিল, তার সবগুলির রচনাকাল ১৮৪১ ও তার পরবর্তী কাল।

এমন কি এই সময়ে তাঁর সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতার সবগুলিও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। তার কারণ, বহু পত্র-পত্রিকা আজ দুষ্প্রাপ্য। যেমন 'কমেট' পত্রিকার নামটিও কোথাও উল্লিখিত নয়। ভোলানাথ চন্দ্রের মতে বেঙ্গল স্পেকটেটারে প্রকাশিত কবিতাটি মধুর প্রথম রচনা। তিনি স্মৃতি থেকে দুই-একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করেছেন। কবিতাটি একটি সনেট—রাত্রির উপরে লিখিত।[৩১] চন্দ্র মহাশয় স্মৃতির উপর নির্ভর করে ভুল তথ্য দিয়েছেন। ঐ কবিতাটি ১৮৪২ সনে জুন মাসে ক্যালকাটা লিটরারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। তার কিছু পূর্বে Literary Gleaner-এও দু'টি কবিতা ছাপা হয়ে গেছে।

মধু জ্ঞানান্বেষণে কবিতা লিখতেন বলে বঙ্কুবিহারী মন্তব্য করেছেন। প্রথমত, জ্ঞানান্বেষণে কোন কবিতা ছাপা হোত না; দ্বিতীয়ত, জ্ঞানান্বেষণ ১৮৪০ সনে উঠে যায়। অতএব এই পত্রে মধুর কোন কবিতা বের হবার সম্ভাবনা নেই।

ক্যালকাটা লিটরারী গেজেট, লিটরারী গ্লীনার, কমেট, বেঙ্গল হেরাল্ড, ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন প্রভৃতি পত্রিকায় মধুর কবিতা ছাপা হোত। ১৮৪২ সনে মার্চ মাসে 'লিটরারী গ্লীনার' প্রকাশিত হয়; রেভারেণ্ড কেরীর নাতি ছিলেন প্রকাশক। ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত এই কেরী সাহেবকে নিয়ে বিপন্ন হয়েছিলেন।[৩২] ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত ঐ পত্রিকাটি দেখেন নি বোধ হয়। সম্ভবত লিটরারী গ্লীনারে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত ছাপার হরফে তাঁর কোন কবিতা প্রকাশ পায় নি। নইলে ১৮৪২ সনের প্রথম দিকে কবিতা প্রেসে পাঠিয়ে 'প্রুফ-কপি' নিয়ে আনন্দ বোধ করবেন কেন? এ তো দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো!

'লিটরারী গ্লীনারে' কবিতা ছাপা হোল; অন্যান্য পত্রিকাতেও কবিতা ক্রমান্বয়ে ছাপা হতে লাগল। কবির আত্মপ্রত্যয় বাড়ল—বিলেতে Bentley's Magazine-এ কবিতা পাঠালেন; Blackwood Magazine-এ একগুচ্ছ কবিতা পাঠিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের নামে উৎসর্গ করছেন! এগুলি ছেলেমানুষি হতে পারে, কিন্তু এটা হোল কল্পনাপ্রবণ কিশোরেরই ছেলেমানুষি, জন্মবৃদ্ধের বুড়োমি নয়।

ছাপা না হলেও ১৮৪১ সনে মধুর লেখা চৌদ্দটি কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, এগুলি আকস্মিক রচনা নয়। এর পিছনে পূর্ব-চর্চার ইতিবৃত্ত রয়েছে।

কবিতাগুলির বক্তব্য কি? অধিকাংশ কবিতায় কবির উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে কোন এক অনির্দেশ্যা নায়িকার জন্য: 'My fond sweet blue-eyed maid', 'Soft-beaming eye', 'so soft and so bright'. কখনও তার ভ্রূভঙ্গি হাসির স্তুতি—"There was life in thy smile, there was death in thy frown". সর্বত্রই সেই মোহিনী মায়ার কথা বলা হয়েছে, যিনি বিদেশিনী। ইনি কখনও কীট্‌স, কখনও বার্নস, কখনও মূর, কখনও বাইরনের ইশারা নিয়ে হাজিরা দিয়েছেন। কোথাও একই কবিতায় বিপরীত বা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব ও ভঙ্গির সহাবস্থান ঘটেছে।

তখনও কবির বিশিষ্ট রুচি গড়ে ওঠে নি। তাই সকল প্রকার রুচির সঙ্গেই মিতালি রয়েছে। তবু এই পর্বের দুই-একটি কবিতা দাগ দিয়ে পড়ার মত। একটি কবিতায় মধু তাঁর প্রেমিকাকে সমাজের কাছে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

"Have ye not seen my Penelope
That chaste, that faithful maid•?"

বই-পড়া অবাস্তব প্রেমের তুফানে উদ্বাহু বালকের এই আত্মরতি আজ কৌতুকের বিষয় মাত্র। মধুর জীবনে তখনও নারী-সঙ্গ জোটে নি। মধু বাস্তবে নারী প্রসঙ্গে কভু উৎসাহ দেখাতেন না। প্রথমত সে যুগে বয়স্কা বালিকার সঙ্গে সৌহার্দ্য করার অর্থ ছিল অসামাজিকতার আশ্রয় গ্রহণ।

"From what I have heard of Madoo I can say this much that he was morally strict, and never offended in point of chastity with any of the beauties of Kidderpore. When in merry mood his friends talked to him on the subject, but he turned a deaf ear to it, and would not allow them to enlarge on the point."[৩৩]

মধু নারী প্রসঙ্গে বাক্‌কুণ্ঠ ছিলেন। বন্ধুরা এ প্রসঙ্গটি তুললেও তিনি নীরব থাকতেন। তাঁর নীরবতার ফলে বন্ধুরা বিষয়টিকে আর পল্লবিত করতে সাহস করতেন না। অথচ জীবনে যা অস্বীকৃত, কবিতায় তার

ছিল সোৎসাহ প্রকাশ। আর একটি কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—এখানে নায়িকার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় নি, ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে একটি বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য—যে তাঁর স্বপ্নে-পাওয়া দেশ, তাঁর উজ্জয়িনী, তাঁর 'এল্‌ডোরাডো'। বন্ধুদের কাছেও যে-কথা তখন পর্যন্ত প্রকাশ পায় নি, কবিতায় সেই গোপন কথা আত্মপ্রকাশ করল—

"I sigh for Albion's distant shore." বাবা-মা, ভাই-বোন—সবাই আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি। তবু আমার অন্তর সেই দেশের জন্য ব্যাকুল—"As if she were my Native-Land!" মধু কথাটা স্পষ্ট করে বললেন, তাই তাঁকে নিয়ে আমরা ঠাট্টা-মস্করা করি। কিন্তু এই কথাটি সে-যুগের শিক্ষিত নব্যরুচির প্রতিনিধিদের অনেকেরই বুকে চেপে-রাখা কথা—রামমোহন তো বিলেতেই দেহরক্ষা করেছেন, দ্বারকানাথ দু'-দু'বার গেছেন—দ্বিতীয়বার ঐ মাটিতেই শেষ শয্যা পেতেছেন। বিলাত ভারতের শাসকজাতির বাসস্থান, অতএব তীর্থস্থান—এটা মধুসূদনেরা ভাবতেন না। ইংল্যাণ্ড নব্যজ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্মভূমি; তাই তাঁদের কাছে গমনীয়।

১৮৪২ সনে তাঁর লেখা প্রায় দশটি কবিতা পাওয়া গেছে। এখন পদ্য লেখা একটা সহজ ব্যাপার হয়ে পড়েছে—বন্ধুর কাছ থেকে বই চেয়ে পাঠাতে হলেও ছড়া কাটছেন, ছন্দ ব্যবহার করছেন। এই বৎসরের লেখা কবিতাগুলির মধ্যে তিনটি কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি নামহীন সনেট যার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি হোল—"Oft like a sad imprisoned bird I sigh! দ্বিতীয়টি হোল "Sonnet to Futurity."

"Extemporary song"-এ সুদূর আলবিয়ন-তীরের জন্য যে-আকুতি প্রকাশ পেয়েছিল এখানে তারই পুনরাবৃত্তি। শুধু কবির অবস্থাটা আরও বাস্তবভাবে বর্ণিত—তিনি যেন বন্দী বিহঙ্গ! হয়তো বাবা-মা পুত্রের মতিগতি কিছুটা আঁচ করছেন, হয়তো একটু স্নেহপূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন—তাতেই কবি নিজেকে নিপীড়িত মনে করছেন। এ আমার স্বদেশ, কিন্তু এই ভূখণ্ড ত্যাগ করার জন্য আমি সদাই উৎকণ্ঠিত। —Its green robed meads-gay flowers, and cloudless sky / Though passing fair, have but few charms for me." কারণ কবির মন পড়ে রয়েছে সেই দেশের জন্য—"For I have dreamed of climes more bright and

free / Where virtue dwells and heaven-born liberty / Makes e'en the lowest happy ;—where the eye / Doth sicken not to see man bend the knee / To sordid interest : —climes where science thrives, / And genius doth receive her guerdon meet." ঐ ভূখণ্ডের আকাশ-অরণ্য পাহাড়-নদী তাঁকে ডাকছে না, ডাকছে সেখানকার মানবমুক্তির বাণী, সেখানকার বিজ্ঞানের অগ্রগতির বার্তা। রিচার্ডসন কলকাতায় বসে লণ্ডন-প্রেমে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলেছেন—তাঁর সব 'নস্টালজিয়া'র উৎস পরবাস-জীবনের গ্লানি। মধুর রয়েছে তার বিপরীত মানসিকতা। মধু এখানে অলক্ষ্যে ডিরোজিওর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন। তাঁর বিদেশ-প্রেম প্রকৃত অর্থে নব্যবিশ্বাসের প্রতি প্রেম। সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে এ-জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব নেই। টম পেইনের নাগরিকতা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কবি বলেছেন—"There let me live and there let me die." নব্য পুণ্যকামীর এটি এক হাস্যকর বিভ্রান্ত উক্তি!

"Sonnet to Futurity"-শীর্ষক সনেটটিতে আছে দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যবোধ থেকে নিষ্কৃতির ইচ্ছা। এই সময়ে লেখা বহু কবিতায় কবির নিরাশাপীড়িত মনের ছাপ আছে।

তাঁর 'The Upsori' কবিতাটিকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য বলা যায়। হিন্দু পুরাণের আলো-বাতাস, ধ্বনি ও গন্ধ দিয়ে এই কাব্য রচিত হলেও এর কাব্য-ভাবনায় ও কাব্য-উদ্ভাবনায় কীট্‌সের উপস্থিতি আছে। সুমেরু পাহাড়, পারিজাত তরু, তমাল তরু, মন্দার মালা—পুরাণের সব অনুষঙ্গই এখানে ব্যবহৃত। শম্ভু, কালী প্রভৃতি দেবদেবীও আছেন।

স্পেন্সরীয় স্তবকে কবিতাটি রচিত; নতুন নতুন পদ্যবন্ধও তিনি শিখছেন। এই শিক্ষা জীবনের অঙ্গনে অকাজ নয়।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' যে আকস্মিক সৃষ্টি নয়, তাষার আবরণ ডিঙ্গুলে তার প্রমাণ মিলবে এখানে।

She sat beside a stream ; it was the hour
Of moonshine and of perfume ; near her stood
A lovely and a flowery-kirtled bow'r
While round it rose a vast and ancient wood

Like to a hoary guardian watching o'er
A blooming maiden —thro' th' inwoven boughs
The unseen moon her radiancy did pour
And robed each tender plant with lustrous glow,
Like light that through the vista of the past
On Memory's deary blank its tranquil ray doth cast.

এই ছবির ফ্রেম, ক্যানভাস, তুলি, রঙ—সবই ভারতীয় পুরাণের ; কিন্তু আঙ্গিক কীট্‌সের। এবং মাঝে মাঝে ওবিদেরও বটে। আবার তিনিই তো লিখছেন—

Oh ! how my heart exulteth while I see
These future ffow'rs, to deck my country's brow
Thus kindly nurtured in this nursery !

এখন তিনি সোজাসুজি ডিরোজিওর আঙ্গিনায় এসে বসেছেন। "Who, with a Newton's glance, shall noble trace/ The course mysterious of each wandering star"—এ-উক্তি রিচার্ডসনেরও নয়, নিছক সৌন্দর্য-প্রেমিকেরও নয়। তাই একই কণ্ঠে কত কলরব !

কখনও মুর, কখনও বার্নস, কখনও কীট্‌স, কখনও,বাইরন, এমন কি ক্যাম্পবেল !

মধুর কলমে বহু ব্যক্তির আনাগোনা, বহু ভাষার ভিড়। এখন কেবল নিজেকে আলোড়িত করা, উন্মেষিত করা, জাগ্রত করা। সব বাতায়ন খুলে না দিলে পৃথিবীর যত বাতাস, আলো, ধ্বনি ও গান—সে-সব ঘরে প্রবেশ করবে কি করে ? তাই নানা ভাব, নানা রীতির হট্টগোল এখানে। মধুসূদনের সাহিত্য-চর্চার এটি হোল অনুকরণের যুগ। প্রবন্ধেও একই প্রকার পরস্পরবিরোধী সুরের প্রতিপত্তি দেখতে পাই।

প্রবন্ধ অবশ্য দু'টি, কিন্তু দু'টি মিলিয়ে একটি উদাহরণ স্থাপন করা যায়। তিনি তাঁর Prize Essay-তে মেয়েদের শিক্ষার উপরে বললেন—"Extensive dissemination of knowledge amongst women is the surest way that leads a nation to civilisation and refinement for it is a woman who first gives ideas to the future philosopher and the would-be poet." এখানে দেশ

ও কাল সম্বন্ধে যে সচেতনতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, দ্বিতীয় প্রবন্ধে তার চিহ্নমাত্র নেই। "On Poetry" শীর্ষক প্রবন্ধে মধুসূদন নিছক সৌন্দর্য-তত্ত্বের দিকে নজর দিয়েছেন, সমাজপ্রশ্নে কোথাও উঁকি দেন নি। "The art of the poet has been truimphantly called 'divine'." কবির সঙ্গে কবির পার্থক্য কোথায় তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেবল রীতির কথাই বলেছেন। বক্তব্যের কথা বলেন নি।

এই দু'টি প্রবন্ধ মিলিত হতে পারে নি; এবং মধুর এখানকার কাব্য-জীবন এই প্রকার দ্বিধার দ্বারা আক্রান্ত।

এই দ্বিধা ও পরস্পর-বিরোধিতার কারণ যাই হোক, বাইরনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ডিরোজিওর মধ্যেও বাইরনী প্রভাব ছিল; তাই তাঁকে সমসাময়িকেরা 'ইউরেশীয় বাইরন' বলে অভিহিত করতেন। তাঁর লেখার মধ্যে যেটুকু অতিস্ফীতি ছিল, তার জন্য বাইরনের প্রভাব অনুমান করা হোত। বাইরনের মধ্যে ছিল অতি-অহংবাদ। গৌরদাসকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বললেন, বাইরন তাঁর মহান প্রিয় (my noble favourite); আর এক চিঠিতে লিখছেন, অত্যন্ত আপন জন—'My Lord Byron'. অন্যত্র তীর্থযাত্রী হ্যারল্ড সম্বন্ধে বলেছেন, বেচারী ভালবাসার কাঙাল—"an orphan of the heart."

নামকরণে বাইরন আছেন; কোনও কোনও কবিতার মাথায় তিনি চড়ে বসেছেন। শিরোপা না পেলেও শিরোভূষণ হয়েছেন। ছাত্রজীবনের এই বাইরন-ভক্তি পরবর্তী যুগে অনেক নিরুত্তাপ মূল্যায়নে নিষিক্ত হবে—"it was only in occasions that Byron reached the supreme in poetry." নেহাত কচিৎ-কখনও বাইরনের কবিতায় মহত্ত্বের স্পর্শ লাগে।

টমাস মুরও তাঁর কবিতার নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তবু মুর সম্বন্ধে সেই বালক বয়সেই তিনি প্রকৃত বিচার করেছেন—"Tom Moore, lavish as he is in his similies of "flowers" and "stars" "breezes" and "zephyrs", has mever written a better line of poetry or given a sweeter description of a flower than Spenser." প্রবন্ধে যা বলেছেন, কবিতায় তার প্রতিধ্বনি তখনও বাজে নি। এ যুগের সাহিত্য-চিন্তার কথা আলোচনা করা গেল। সাহিত্য-রীতির

প্রসঙ্গেও দেখতে পাই মধু অভিনবত্বের প্রয়াসী। মধু অমিত্রাক্ষর ছন্দে সনেট লিখছেন—তাঁর বক্তব্য, এই রকম প্রয়াস এই প্রথম। ব্যাপারটি ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ সনেট তো চৌদ্দ পঙ্‌ক্তির পদ্য মাত্র নয়, তার মিলের বন্ধনই আসল বন্ধন। এই মিল তুলে নিলে তার আর কোন বন্ধন থাকে না। তার চরিত্রও নষ্ট হয়। সুতরাং অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা সনেট হোল সোনার পাথরবাটি। ছন্দ শুধু নয়, শব্দ নিয়েও তাঁর খেলা আছে।

১৮৪৩ সনে Literary Gleaner-এর মার্চ মাসের সংখ্যায়[৩৩] তাঁর 'King Porus' কাহিনী-কাব্য প্রকাশিত হয়। ঐ কবিতার একটি স্তবকে তিনি লিখছেন

> The immortal Thunderer's son,
> Astonished the heroic King,
> He saw him bravely charge,
> Like his dread father fulmining.

বেঙ্গল হেরাল্ড এক সমালোচনায় লিখল যে, কবি মধুসূদন মিল দেওয়ার খাতিরে 'fulminating' শব্দটিকে খর্ব করেছেন।[৩৪] মধুর কবি-জীবনে শব্দকে এইভাবে কবিতার প্রয়োজনে খর্ব বা বিদীর্ণ করার উদাহরণ প্রচুর আছে।

হিন্দু কলেজীয় যুগের কাব্য-চর্চায় যে কৃত্রিমতা আছে, পরানুকরণ আছে, তার সংশোধন কবিকেই করতে হয়েছিল। জীবন যেমন কৌতুকপরায়ণ, তেমনি নিষ্ঠুর। মাদ্রাজ-জীবন তাঁকে স্বমুখী করেছে, স্বদেশমুখী করেছে।

অর্থাৎ মাদ্রাজের পরবাস তাঁকে উল্টে-পাল্টে ধুয়ে-মুছে নতুন করে গড়েছে। মাদ্রাজ সমুদ্রতীরবর্তী।

॥ ৫ ॥

ছাত্র-জীবনেই মধু নানাদিক থেকে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। সাজ-সজ্জা মধুর ছিল অভিনব ; কখনও ধুতি উড়নী, কখনও বা ইউরোপীয় পোশাক।

"মধু আমাদের অবাক করে দেবে ঠিক করেছে। একদা সে তার স্বাভাবিক বেশভূষা বর্জন করল—ধুতি-চাদর ছেড়ে দিয়ে বুট পায়ে দিল, ট্রাউজার প'রে ফেলল, গায়ের আচকান ত্বরিতে কোটে রূপান্তরিত করে ফেলল। এই পরিচ্ছদই সে পরবর্তী জীবনেও চালিয়ে যাবে।"

তার অন্য এক বন্ধু লিখেছেন, "মধুই দেশীয়দের মধ্যে প্রথম ইউরোপীয় পোশাক পরিধান চলন করেন।"[৩৬]

মধুর দেখাদেখি দুই-এক সহপাঠী নব্য বেশভূষা ধারণ করতে থাকেন। দিগম্বর মিত্রের ভাই ছিলেন মধুর সহপাঠী—তিনি এই পোশাক বরণ করলেন। পোশাক-পরিচ্ছদে শুধু নয়, চলাফেরায়ও মধুর ইংরেজী অনুকরণ ছিল নব্যতার অনুকরণ।

"একদিন কলেজে আসিয়া মধু আমাকে মাথা দেখাইয়া বলিল, "দেখ দেখি, কেমন চুল কাটিয়াছি। ইহার জন্য আমার এক মোহর ব্যয় হইয়াছে।"

ভাষ্যকারেরা মোহরটাই দেখলেন। চুল ছাঁটার ধরনটা দেখলেন না।

"মধু সেদিন ফিরিঙ্গীর মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল—সম্মুখে চুলগুলো বড়, ঘাড়ের চুলগুলো ছোট।

আমি বলিলাম "একি করিয়াছ, তোমার পক্ষে ঠিক হয় নাই। তুমি এক-জন জিনিয়াস (genius); জিনিয়াস যারা তারা নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তুমি যদি পাঁচ চূড়া কি সাত চূড়া কি ন চূড়া কাটিয়া আসিতে, তাহলে যাহোক একটা নূতন রকম কিছু হোত; তা না করে ফিরিঙ্গীর মতন চুল কেটে এসেছ। এরূপ নীচ অনুকরণ প্রবৃত্তিটা ভাল নয়।"[৩৭]

নতুন কিছু করার জন্য মধু ঐরকম চুল ছাঁটে নি—মধু ইংরেজের অনুকরণ করতে চেয়েছিল। এবং সেটাই ছিল আধুনিকতা। সব যুগেই মনের আধুনিকতার সঙ্গে দৈহিক সাজ-সজ্জার আনুগত্য থাকে।

মধু মদ খেতেন, মাংস খেতেন, খেতেন আরও অনেক হিন্দুর নিষিদ্ধ আহার্য।

"শয্যা গ্রহণের পূর্বে মধু প্রত্যহ এক গ্লাস মদ পান করতেন—ভোর না হওয়া পর্যন্ত মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে ঘুমুতেন।"[৩৮]

মধু খেতেন; প্রকাশ্যে খেতেন, লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়। পরবর্তী জীবনে আরও বেশি খেয়েছেন। বড় অসন্তোষ মানুষকে বড় যন্ত্রণা দেয়। আর বড় স্বপ্ন মানুষকে বড় ঝুঁকি নিতে প্ররোচনা দেয়। মধু প্ররোচিত ব্যক্তি—সারাজীবন। নতুবা মদ্যপায়ী ছিলেন রামমোহনও, তবে হিসেব করে। একবার এক সাকরেদ ফাঁকি দিয়ে বেশি খাইয়ে দেওয়ায় দেওয়ানজী তাঁর মুখ দর্শন করেন নি।

মদ খেতেন মহর্ষি, পরিমিত।

মদ খেতেন ঋষি রাজনারায়ণ, লীভারের অসুখ পর্যন্ত বাধিয়ে ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতেই এই প্রসঙ্গ আছে। মদ খেতেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, তাতেই অকাল-মৃত্যু। মদ খেতেন হরিশ মুখুজ্জে, শাস্ত্রী মহাশয়ের আপশোস কলকাতার কাপ্তেনরা তাঁকে মদ ধরিয়ে অকাল-মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়।

মদ খেতেন রমাপ্রসাদ রায়, মদ্যপানের জন্যই অকাল-মৃত্যু ঘটল।[৩৮ক]

মদ খেতেন কবি হেমচন্দ্র, এবং বন্ধুবর বঙ্কিমের গৃহে বসেই, এবং সম্ভবত একা নন। কারণ "Guests cannot be choosers"—এই মজাদার স্মরণীয় উক্তিটি তাঁরই।[৩৯]

মধুসূদন মদ খেতেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে বসে—সে মদও মধু নিজে বহন করে আনেন নি।

মধুর দোষ তিনি মদ খেতেন গোপনে নয়, সর্বসমক্ষে; এবং পরিমিত নয়, অপরিমিত।

মধুর কোনটিই বা পবিমিত? কাব্যের বিষয় পরিমিত পৃথিবীর নয়—স্বর্লোক, ভূলোক, দ্যুলোক সর্বত্র তাঁর বিচরণ। কবিতার ছন্দও পরিমিত নয়।

যেমন অপরিমিত বাসনা, তেমনি অপরিমিত আচরণ। অমিতাচারের জন্য মধুর পিতার প্রভাবের প্রসঙ্গ অনেকে বলেছেন।

অবশ্যই মধুর পিতা ভোগী ছিলেন; অবশ্যই তাঁর কোন আদর্শবাদ ছিল না; অবশ্যই তিনি বেদান্ত চর্চা করতেন না, অবশ্যই তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না।

মধুর পিতা পুত্রের হাতে নিজের আলবোলার নল তুলে দিয়েছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছেন। কিন্তু পিতা-পুত্রে উৎসব উপলক্ষে নেশাভাঙ করার উদাহরণ কি এতই অপ্রতুল ছিল? পুরাতন কাগজপত্র ঘাটতে আমাদের লজ্জা করে এর জন্য।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অধিকাংশ অভিভাবকই ছিলেন ভোগী; তাই মধুর অপরাধের পিছনে পিতৃপ্রভাব খুঁজে বের করা যুক্তিহীন। শুধু নিজের বাবার প্রভাব কেন, সকলের বাবার প্রভাবই তাঁর উপর পড়েছিল। অপরাপর পিতা খুব কি পূত চরিত্রবান্? এক জনের কথা বলি। তিনি ইতিহাসখ্যাত।

পূজাস্থলে কালীকৃষ্ণ শিবকৃষ্ণ যথা।
ঈশুকৃষ্ণ নিবেদিত মদ্য কেন তথা॥
রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত-পদে।
দেবী পূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে॥

বিকট প্রকট জাতি ধর্ম সব গায়ে।
দেবীর সমীপে আছ জুতা দিয়া পায়ে।।[৪০]

হাঁ, স্বয়ং রাধাকান্তেরই এই অবস্থা! তাঁদের পুত্রদের মাহাত্ম্য বিষয়ে অনেক বিবরণ আছে। আমরা একটি মাত্র বক্তৃতা উদ্ধৃত করছি। ১৮৪৫ সনে ২৫-এ মে খ্রীস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেবের ভবনে সভা বসেছে। টাকীর পার্শ্ববর্তী কলসেনা গ্রামের অধিবাসী কালীপ্রসাদ বসু বক্তৃতা দিলেন; তিনি বললেন—শ্রেষ্ঠতম ধনীর সন্তানেরা বছরের পর বছর গোমাংস ও মদ্য দিয়ে ভুরিভোজন করছে; তাঁদের পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয়েরা সবই জানেন, "for Davy Wilson's bills are presented to them for payment." এই অপকর্ম বন্ধ করার কোন চেষ্টা করা হয় নি, ছেলেদের সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয় নি। পিতৃ-সম্পত্তি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয় নি। গৃহে যদি এতটা উদারতা চলে, তাহলে বাইরে তা ঠেকান যাবে কি করে? দেশীয়দের শিক্ষিত সন্তানেরা আজ সম্পূর্ণ ধর্ম-বিবর্জিত; তারা বহুকাল আগেই হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করেছে, স্বাধীন চিন্তার ধারক হয়েছে, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচারী হয়েছে। এখন প্রশ্ন এই নয় যে, দেশীয়রা খ্রীস্টান হবে কিনা। প্রশ্ন হোল এই, সভায় দাঁড়িয়ে আমরা যে সব আচরণের মুণ্ডুপাত করছি, গৃহে সে সব বরদাস্ত করব কিনা"![৪০ক] ভদ্রলোককে অবশ্য কলুটোলার হরিমোহন সেন ধমক দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সভার সমক্ষে এসব কী কথা হচ্ছে! মধু তবু ভাগ্যবান; তাঁর পিতা তাঁর শিক্ষার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। পুত্র পিতার এই অমিতব্যয়িতার সুযোগ গ্রহণ করেছিল।

সে-যুগে বিকৃত কর্মকাণ্ডই দেখা যেত; ছেলের নেশা-ভাঙের ব্যয়ভার বহন করছেন পিতাঠাকুরেরা; কিন্তু শিক্ষার ব্যয়ভার নয়। জ্ঞানান্বেষণে এ ধরনের পিতাদের উদ্দেশে ভর্ৎসনা থাকত। দীনবন্ধু এদের কথা বলেছেন 'সধবার একাদশী'তে; স্বয়ং মাইকেলও বলেছেন, 'একেই কি বলে সভ্যতা'য়।

মধুর পিতা অপত্যস্নেহের স্বতন্ত্র কোন অতিশয়তা দেখান নি। মধুর পিতার দুর্ভাগ্য যে, তাঁর মধু কালে শ্রীমধুসূদন হয়েছিলেন। যে—'পাপ' অখ্যাতির ম্লানতায় লুকিয়ে থাকত, সেই 'পাপ' সার্থকনামা পুত্রের পিতা হবার দরুন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। একেই বলে বোধ হয় খ্যাতির বিড়ম্বনা!

মধু নানা ব্যাপারে অমিতাচারী, কিন্তু মধু নারীপ্রসঙ্গে মিতবাক্।

'Chaste, faithful Penelope'-এর জন্য কী উৎকণ্ঠাই না প্রকাশ করেছেন! সে সব নায়িকারা গচ্ছিত ছিলেন স্বপ্নে বা কল্পনায়। অধিকন্তু তিনি চেয়েছেন ভালবাসার ধন, বিপণির ধন নয়। তাঁর কবিতায় যাঁরা আনাগোনা করেছেন, কেউ স্বদেশীয়া নন, সবাই বিদেশিনী। অর্থাৎ তাঁরা সবাই নভশ্চারিণী (পুথির পাতায়), পৃথিবীর পথের পর্যটিকা নন। সুযোগ থাকতেও মধু বিপথগামী হন নি। পরিশোধিত জল পাওয়া গেল না, অতএব নর্দমার জল পানীয় হোক, এটা তিনি সাব্যস্ত করেন নি। এক সন্ধ্যায় গেছেন বন্ধু গৌরদাসের গৃহে। গৌরদাস গৃহে নেই; মধুর সন্দেহ হোল এবং সে বিশ্রী সন্দেহের কথা তিনি চিঠিতে জানালেন। "I fear you are giving way to the vice too prevalent amongst our Indian youths of education." গৌর এই চিঠি পেয়ে ভীষণ চটে গেলেন। তখন মধু আর কি করেন? বারবার মার্জনা ভিক্ষা।

বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে মতবিরোধ হয়, রাজনারায়ণ একবার হুকুম দিলেন—"যাও, তোমার লেখাপড়া করতে হবে না, দেশে গিয়ে চাষবাস দেখো গে।" মধু বন্ধুকে জানালেন সাগরদাঁড়ি যাচ্ছি। বেলেঘাটা হয়ে নৌকা পথে সাগরদাঁড়ি যাবেন—সব খবর বন্ধুকে জানালেন। কিন্তু সাগরদাঁড়ি আর তাঁকে টানছে না।

বহুদিন হয়ে গেছে সাগরদাঁড়ির মধু কলকাতার মধুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। সে কলকাতাও তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারছে না—মধু পালাই-পালাই করছেন।

> I sigh for distant Albion's shore
> Its valleys green, its mountains high;
> Tho' friends, relations, I have none
> In that for clime, yet oh! I sigh
> To cross the vast Atlantic wave
> For glory, or a nameless grave!

এ শুধু কবিতা নয়, মধুর জীবনের পূর্ব-বাসনার উদ্ঘাটন। কোথায় আতলান্তিক সমুদ্র, আর কোথায় বেলেঘাটার খাল! মধু এখন সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সঙ্কল্প করেছেন।

আমরা দেখব সেই সমুদ্র-আস্বাদন ব্যতীত মধু নতুন করে আর পুরানো

সাগরদাঁড়ি, কবতক্ষ নদ, বুড়ো বটগাছ, ভাঙ্গা শিবমন্দির, শ্যামাপক্ষী আর কুটিল কেউটিয়া সাপকেও ভালবাসবেন না। সমুদ্রস্নানে তাঁর মুক্তিস্নান। হারালেই তবে প্রার্থিতকে পাই। ছাড়লেই বুঝি বন্দরে পৌছাই। অকূল আনে কূলে। গরুড় বিষ্ণুকে কাঁধে করে চলতেন; মধুর কাঁধে দেবতা নয়, দুর্জয় মানব-অভিযান।

মধু পিতৃবাক্য শিরোধার্য না করলেও পালনীয় মনে করেছেন—বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে চেয়ে আনা বইগুলি ফেরত দিয়েছেন। যাওয়ার দিনে হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। খিদিরপুরের একটি গৃহের অন্দরমহলে হয়তো সেদিন খুব বারিপাত হয়েছিল। মধু যেমন একমাত্র সন্তান, জাহ্নবী দেবীও তেমনি সে গৃহে একেশ্বরী।

মধু বাবার কাছ থেকে ভালো রকম টাকা পেতেন হাত খরচের জন্য। সে-টাকা তিনি নিজের বিলাসিতার জন্য কেবল ব্যয় করতেন না। বন্ধুদের খাওয়াতেন, সাহায্য করতেন। একটা গল্প তো ভূদেবই শুনিয়েছেন।

"Being the only child of a father, old Rajnerain gave money to Madoo for his private expense and his money he liberally spent in charity to the poor and entertainments to his friends."[৪০খ]

এ-অভ্যাস তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ছিল।

মধু আত্মসুখপরায়ণ ছিলেন না। আহার্য বিষয়েও মধু মিতাচারী ছিলেন।

ধীরে ধীরে আঠার শ' একচল্লিশ সাল পার হয়ে গেল; জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। বৃত্তিভোগীদের তালিকায় মধুর নাম রয়েছে।

বিয়াল্লিশ সনে মধু আঠারো বৎসরে পড়েছে। মা-বাবা ভীষণ সচেতন হয়ে উঠলেন—নানা শলা-পরামর্শ চলছে। মধুর বন্ধু-বান্ধবেরা কেউ কেউ ইতিপূর্বেই বিবাহ করে ফেলেছেন। গৌরদাস করেছেন; রাজনারায়ণ করেছেন; ভূদেবও করেছেন। ভূদেব তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন যে, তিনি ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ করেছেন। ভূদেবের জন্ম ১৮২৫ সনে। বাংলা হিসাবে ১৮৪০ সনে সবে তাঁর ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে।

১৮৪২ সনের গোড়াতেই মধু দু'টি গুরুতর সিদ্ধান্ত নিলেন—আচমকা নয়, অনেক ভেবে-চিন্তেই।

না-জানা মেয়ে বিবাহ করবেন না ; বড় কবি হবার জন্য বিলেত যাবেন। বন্ধুদের মুখ ঘুরে কথাটা বাবা-মার কানেও এসে পৌঁছাল। মধু ভালো ছাত্র, তার জন্য তাঁরা গর্ববোধ করেন। মধু ইংরেজীতে কবিতা লেখে, এবং সে কবিতা নানা পত্রিকায় ছাপা হয়, এ খবর তাঁদের উল্লসিত করে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে, সে স্বর্ণপদক তো রাজনারায়ণ নিজের হেপাজতেই রেখে দেন। স্বর্ণপদকটি ভালো, কিন্তু ঐ প্রবন্ধের বক্তব্যকে তাঁরা ভয় করেন।

ক্ষুধা ভালো, তাই বলে এমন গুরুতর ক্ষুধা ?

প্রথমে বিস্তর অনুরোধ উপদেশ ; তারপর কথা কাটাকাটি, চটাচটি এবং ভর্ৎসনা। তারপর একদিন পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে তমলুক।'

রাজা আনন্দনারায়ণ রায় কোন সন্তান না রেখে মারা গেছেন। তাঁর দুই রানী হরিপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া ; দুই জনে দু'টি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করলেন। বড় রানীর দত্তকপুত্র শ্রীনারায়ণ রায় ১৮২১ সনে অকালে দেহত্যাগ করলে ছোট রানীর দত্তকপুত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব দাবি করে বসলেন। রানী হরিপ্রিয়া এই দাবিতে কর্ণপাত না করে আর একটি দত্তক গ্রহণ করলেন। সেই দত্তক পুত্র রুদ্রনারায়ণ রায়ের পক্ষে সমগ্র সম্পত্তি দখলের জন্য মামলা দায়ের করে বসলেন রানী হরিপ্রিয়া।[৪১] রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর কৌশুলি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সুবাদেই তমলুক যাত্রা।

মধু ছিলেন নিভৃত স্বভাবের কিশোর। বই-পড়া, কবিতা-লেখা, পছন্দমত দু' চারিটি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ, আর বিবেকের সঙ্কেত অনুযায়ী চলা —এই ছিল তাঁর জীবনবিধি।

"He was a book-worm, and passed his time in reading and writing also ; but he was also very complaisant to his friends and talked merrily with them on literary subjects. He led a sort of secluded life, and seldom went out for sight seeing.[৪২]

'মধু যখন কলেজে পড়িতেন, তখন অতি নিভৃত-স্বভাব ছিলেন ; দুই একটি বন্ধু ব্যতীত কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না। আমারও সঙ্গে বাক্যালাপ ছিল না। প্রতিভাসম্পন্ন লোকেরা এইরূপই হইয়া থাকে।'[৪৩]

তবু বাবার হুকুমে তমলুক যেতে হোল ; নবমীর দিন সকালে গিয়ে পৌঁছুলেন—রাজগৃহে রাজোচিত সংবর্ধনা জুটল। কিন্তু মন ভরে না।

"We were welcomed with the greatest cordiality. Here was a fine Jathra, Believe me my dear Gour,—tho' treated fine with the greatest respect, cordiality and honour,—I am dying for Calcutta."[৪৩]

সঙ্গে আছে বই ; খাওয়া শোওয়া ঘুম ছাড়া বাকি সময়টা বই পড়ে কাটান। ক্যাম্পবেলের কবিতা-সংকলন থেকে বেছে বেছে কবিতা পড়েন আর পড়েন "Letters from Italy". শোনেন প্রশস্ত নদীর সহাস্য কলকল্লোল। রূপ-নারায়ণের বুকে কত জাহাজ চলেছে—সমুদ্র তবে কি কাছে? কত কাছে?

এই "Nasty place"-এর এই একটি মাত্র যোগ্যতা। তমলুকে একটি ঘটনা ঘটল, যার গুরুত্ব মধু-জীবনে বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু এর থেকে মধুসূদনের রুচি ও মেজাজের পরিচয় কিছু পাওয়া যায়।

৩রা কার্তিক এক চিঠিতে লিখেছেন—"এখানে আমার ছোটখাট একটি প্রণয়-অভিজ্ঞতা লাভ করা হোল। তবেই ত্থাখো, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী থেকে আমি হয়ে উঠেছি পরিষ্কার একটি লম্পট।"

মধুসূদন নারীসঙ্গকে কত গুরুত্ব দিতেন! একটু অঙ্গুলির স্পর্শ বা দু'-চোখের দৃষ্টি বিনিময়, বা প্রণয়ের প্রথম চুম্বন—সবই মধুর কাছে পবিত্র ব্যাপার। তার থেকে পদস্খলনে তাঁর অনুতাপের কারণ। সে-যুগে নারী-সংসর্গের জন্য অনুতাপবোধ অভিনব! হয়তো ঐ রাজবাড়ির ক্লিষ্ট পরিবেশে ভালোবাসা-বাসির কোন পরিচ্ছন্ন রূপ ছিল না ; মধু কার ফাঁদে (নবীনা না প্রবীণার) পড়েছিলেন? জীবনীকার এ বিষয়ে নীরব। আমরাও তার খোঁজ করব না। খোঁজ না করলেও এটা বোঝা গেল মধুর কাছে, ভালোবাসা ভালোবাসাই।

অষ্টাদশ শতকীয় জনরুচিকে মধু বিদায় দিয়েছেন। "A little love affair" বলে মধু বিষয়টিকে লঘু করেছেন। লঘু ব্যাপার ; তটে এসে তরঙ্গ আঘাত মাত্র করছে, বাঁধ ভাঙতে পারে নি।

তবে এই অভিজ্ঞতা তাঁকে সতর্ক করে দিল, সাবধান করে দিল।

রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন ; খিদিরপুরে কাজকর্মের ভিড়ে এত বিশেষ করে পুত্রকে তিনি কখনও দেখেন নি।

তমলুক তাঁকে পুত্রের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দিল। পুত্রের প্রকৃত পরিচয় তিনি বুঝতে পারলেন। এ ছেলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; বহু জনের মধ্য থেকেও তাই সে একা, নিঃসঙ্গ। এর নিজের ইচ্ছা আছে, নিজের মত আছে, নিজের বিশ্বাস আছে; এ ছেলে পরিবারের নয়, এ ছেলে দত্তবাড়ির অন্যান্যদের মত নয়।

কৌলিক মত কৌলিক বিশ্বাসের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই।

রাজনারায়ণ প্রমাদ গণলেন, গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ হোল; কুলগুরু, কুল-পুরোহিত, ঘটক সবাইকে আমন্ত্রণ করা হোল। এত যে লেখাপড়া, সাহিত্য-চর্চা—এ সবই মধুকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেকে পথে আনতে হবে—তাঁরই পথে, বাঙালী বর্ণহিন্দু ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পথে।

মধু এসব শোনেন, দেখেন, এবং বুঝতেও পারেন তাঁকে বাঁধবার উদ্যোগ হচ্ছে। মুক্তির পথ মুক্ত পথ নয়, গোপন পথ, সঙ্কীর্ণ পথ।

বন্ধু গৌরদাসকে তাঁর সঙ্কল্পের কথা বললেন। গৌরদাস বললেন, তোমার বাবাকে আমি সব জানিয়ে দেব।

দারুণ চটে গেলেন। তাই যদি করো, তাহলে তুমি আর আমার বন্ধু নও।

জীবনের সঙ্কল্পের কাছে সব তুচ্ছ—বন্ধু, মা-বাবা।

"তুমি হয়তো ভাবছ আমি ভীষণ নিষ্ঠুর, কারণ আমি আমার বাবা-মাকে ত্যাগ করতে চাই। অহো, আমার প্রিয় সুজন, আমি এটা জানি, এর জন্য আমি বেদনাবোধ করি। কিন্তু কবিতার জন্য (আলেকজাণ্ডার পোপ বলেছেন) কবিকে বাবা-মা ত্যাগ করতে হবে।"

পোপের সাক্ষ্য মেনেছেন—সেটা আত্মনির্ভরতার অভাব রটনা করে। পোপ কখনও মধুর আশ্রয় নন।

বাবা তর্জন-গর্জন করছেন, মা নীরবে অশ্রুমোচন করছেন। কিন্তু মধু তাঁর সঙ্কল্প থেকে সরছেন না এক তিল। মধুর সঙ্কল্পও একটি মাত্র।

নিশানা যখন একটি, তখন অব্যর্থ হয় তীরন্দাজের তীর নিক্ষেপ।

বড় কবি হতে হবে, বড় কবি হওয়ার জন্য বিলেত যেতে হবে।

আর জীবনসঙ্গিনী? বয়ঃপ্রাপ্তা শিক্ষিতা নারী ব্যতীত জীবনসঙ্গিনী রূপে অন্য কাউকে ভাবা যায় না।

বংশরক্ষার জন্য বিবাহ তাঁর আদর্শ নয়।

তাঁর স্বপ্নে রয়েছে পেনিলোপ, আছে নীল-নয়না তরুণী। এঁদের কারো লীলাভূমি বঙ্গদেশ নয়, ইংল্যাণ্ড! স্বদেশের মাটিতে তাঁরা নেই, আছে দূর সিন্ধুপারে।

"He longed for courtship, though courtship was a myth in Hindu life."**

মধু এই সময়ে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে যাতায়াত করছেন। কেন এই যাতায়াত? রথের ধ্বজপত্র দেখা যাচ্ছে? চক্রের ঘর্ঘরধ্বনি? তা-ও কি শোনা যাচ্ছে?

অনির্দেশ্যতার অন্তঃপুরে কি হচ্ছে, সে অনুসন্ধান আপাতত স্থগিত থাকল। কৃষ্ণমোহনের অন্তঃপুরে অনুসন্ধান করা যাক।

॥ ৬ ॥

তমলুক থেকে তিনি ফিরেছেন। সমুদ্র-দর্শন ঘটে নি, সমুদ্রের কাছাকাছি গিয়েছেন, এই সান্ত্বনা।

পুজোর ছুটির পর কলেজ খুলল। রিচার্ডসন নেই। দীর্ঘ ছুটিতে তিনি যাচ্ছেন বাইরে, তাঁর স্থলে কার্যভার গ্রহণ করেছেন মিঃ কার। এই শিক্ষক মহাশয়কে মধুসূদন আদৌ পছন্দ করেন নি। ভদ্রলোকের অপরাধ তিনি শুধুই শিক্ষক, কবি নন, বা কাব্যপ্রেমী নন। মধু কলেজে আসছেন না।

এদিকে বাবা-মা তাঁর বিবাহের জন্য উতলা হয়ে পড়লেন। মধুর এতে প্রবল আপত্তি—প্রথমত, ছাত্রাবস্থায় বিবাহ; দ্বিতীয়ত, অশিক্ষিতা নাবালিকা বিবাহ; তৃতীয়ত, অপরিচিতা বিবাহ।

বছর দশেক পরে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী সংবাদ-প্রভাকরে 'সতীত্বের আক্ষেপোক্তি' নামক রূপক কবিতায় লিখেছিলেন—

নবীন যুবকগণে স্বদেশী যুবতী সনে
বিবাহের পূর্বে চাহে ভাব।**

বন্ধু গৌরদাস বলেছেন—সে বিবাহ-পূর্ব প্রণয় চাইত, যদিও হিন্দু সমাজে প্রাক্-বিবাহ প্রণয় ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। "He longed for courtship though courtship was a myth in Hindu life."

এই সময়ে খিদিরপুরের এক বন্ধু—নাম নবীনকৃষ্ণ মিত্র—খ্রীস্টান হোল।

এই নবীন নাকি মধুকে খ্রীস্টান হতে প্ররোচিত করে—"This Nabin induced him to leave home." নবীনের মুখে ইংল্যাণ্ডের অনেক লোভনীয় উপন্যাস তিনি শুনলেন।

খ্রীস্টধর্মের মহিমার কথা কোনদিন কাউকে তিনি বলেন নি ; জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মত ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্বে তিনি কোন খ্রীস্টীয় সাহিত্য পড়েন নি। ধর্মান্তরিত হয়েও ঐ ভদ্রলোকের মত তিনি খ্রীস্টীয় সাহিত্য রচনা করেন নি। কোন ধর্মের প্রতিই তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। প্রচলিত হিন্দু আচার তিনি মানতেন না। সে যুগের তরুণেরা কে-বা মানত!

মধু ডেভিড হেয়ারকে দেখেছেন, তাঁর স্নেহ পেয়েছেন। মধু রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র। এঁরা কেউই খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে কেন, কোন ধর্ম সম্বন্ধেই উৎসাহী ছিলেন না। ডেভিড হেয়ার মারা গেলে তাঁর সমাধিভূমি নিয়ে খ্রীস্টীয় ধর্মযাজক মহলে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। চৌদ্দ বৎসর আগে ডি. এল. আর.-এর কবিতাবলী সমালোচনা প্রসঙ্গে 'জন বুল' লিখেছিল, তাঁর কবিতায় সেই অনুভূতির অভাব আছে, "a feeling and sense on the great doctrines and truths which Christians believe."[৪৬] গভর্নমেণ্ট গেজেটে ডি. এল. আর.-এর কবিতা প্রশংসিত হলে জন বুল উষ্মা প্রকাশ করে। বিশ বৎসর পরেও তাঁকে ভর্ৎসনা করে বেথুনসাহেব বলেছিলেন, 'hoaryheaded libertine.' মধুর প্রিয় শিক্ষকদের মধ্যে কেউই ধর্ম বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না।

ডিরোজিওকে মধু দেখতে পান নি, কিন্তু তাঁর শিষ্যদের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। রামতনু ছিলেন তাঁর শিক্ষক ; তাঁর ব্রাহ্ম মত তখনও ফুটে ওঠে নি ; তখন তিনি ছিলেন "Free-thinker"। দিগম্বর মিত্র তাঁর বন্ধুর দাদা। প্যারীচাঁদ ছিলেন বন্ধু কিশোরীচাঁদের দাদা। এঁরা কেউই তখন ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামান না। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন সবাই একইপ্রকার মনোভাবসম্পন্ন। তাঁরা সবাই সমাজসংস্কারে ব্যস্ত, রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে ব্যস্ত—সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা থেকে তাঁরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে পৌঁছাতে চলেছেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' থেকে 'বেঙ্গল স্পেকটেটারে'। এক কৃষ্ণমোহন কিছুকাল আগে খ্রীস্টান হয়েছিলেন।

বিলাত যাত্রার বাসনা চাপা থাকে কি ; বাবা শুনেই কানে আঙুল দেন। শাস্ত্র-বিরোধী সঙ্কল্প! মা কেঁদে-কেটে আকুল, ছেলে জাতিচ্যুত হবে!

এত কান্নাকাটি, ক্রোধ, চটাচটি দেখে মধু নির্বাক হয়ে যান। নির্বাক, কিন্তু সঙ্কল্পে অটল।

মধু জীবনে বহুক্ষেত্রে এই রকম নির্বাক, যেন মিশরীয় স্ফিনিস্কের মত। আর সঙ্কল্পে অটল—পৌরাণিক বীরের মত। বাবা-মা মেয়ে দেখে আর সময় নষ্ট করেন না, মেয়ে পছন্দ করে ফেললেন। দিনক্ষণও ঠিক করে ফেললেন।

"আজ থেকে তিন মাস পরে আমার বিবাহ হবে ; কী সাংঘাতিক কাণ্ড ! আমার রক্তকণিকাগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, সজারুব কাঁটার মতো আমার চুলগুলি খাড়া হয়ে ওঠে—এই প্রসঙ্গে ভাবলে ! আমার ভাবী বধূ এক জমিদার কন্যা। হায় বেচারী, ভবিষ্যতের গর্ভে কী দুর্ভোগই না তার জন্য জমা হয়ে আছে চিরকালের জন্য।"

সম্ভাবিত পাত্রীর দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে যখন তিনি এই চিঠি লিখছেন, তখন ভবিতব্যের দোরে বসে আরও দু'টি নারী মুচকি হাসলেন !

অথচ সে-যুগের বঙ্গসন্তানেরা বিবাহের সংবাদে শঙ্কাকুল হতেন, এমন সংবাদ আমাদের জানা নেই। বিবাহ তখন ছিল আদ্যরস, কুলকর্ম। বীরবলের ভাষায় বিবাহ তখন শুধু হোত, কেউ করত না। ঔচিত্যহীন বিবাহ হতে তাই কোন বাধা পায় নি। প্রথম আধুনিক বাঙ্গালী রামমোহন দুই বিবাহ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বিবাহ-সংস্কারে নানা আন্দোলন চালিয়েছেন, নিজের বিবাহ হয়েছিল এগার বৎসর বয়সে। বঙ্কিমের অবস্থাও তথৈবচ। সত্যনিষ্ঠ শিবনাথশাস্ত্রী দুই বিবাহে বাধ্য হন। এগার বৎসর বয়সে রাজ-নারায়ণের আদ্যরস। অতএব তাঁর পূর্বেও এই জাতীয় উদাহরণ, পরেও এই উদাহরণ। মাঝখানে তিনি অপেক্ষমাণ। তিনি বিবাহিত হওয়ার পর বিবাহবিধি সংস্কারে এগোন নি। কথায় ও কাজের মধ্যে-যে পার্থক্য আছে, তার পরিমাণ তিনি কমাতে চান নি, একেবারে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। বাঙালীর কৌলিক আচারের একটা সীমান্ত তিনি ডিঙ্গুতে চান, ভাঙতে চান।

গড্‌উইন বা বেকন, রুশো বা নিউটন কেউ তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চান নি, ঘুম ভাঙিয়েছেন।

হঠাৎ মধুসূদন অদৃশ্য হলেন। বন্ধুরা কেউ কোন খবর রাখতেন না যে, মধু গোপনে এতটা অগ্রসর হয়েছেন। অদৃশ্য হবার পূর্বদিন তিনি চুল

ছেঁটেছেন নতুন কায়দায়। বন্ধু ভূদেব এই নিয়ে মৃদু ভর্ৎসনা করেছেন। রুষ্ট হয়েছেন তিনি, কিন্তু অভীষ্ট বলেন নি।

"তাহার পর দিন মধু কলেজে আসিল না। অনুমানে জানিলাম মধু খ্রীস্টান হইতে গিয়াছে; শুনিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। বিস্ময়াপন্ন হইলাম এই জন্য যে, মধুর সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, মধু খ্রীস্টান হইবে, খ্রীস্টান হইবার দিকে তাহার মন গিয়াছে এ সকল কথা ঘুণাক্ষরেও আমায় কোনদিন বলে নাই; তাহার ভাব গতিক দেখিয়াও আমি উহার অনুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। একবার মনে হইল কথা সত্য নহে; আবার মনে হইল যদি সত্য হয়, তবে আমার উপর মধুর বিশেষ ভালবাসা কই জন্মিয়াছিল, তাহা হইলে ত মধু এ বিষয়ে একটুও জানাইত। যাহা হউক, আমরা কয়েকজন মিলিয়া কলেজের ছুটির পর মধুকে দেখিতে গেলাম।"[৪৭]

মধু প্রাণখোলা বন্ধু। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে মুখ বন্ধ করতে জানতেন —রহস্যময় তিনি তখন।

অতএব অনুমানের অন্ত নেই—মধু কেন খ্রীস্টান হোল? পৃথিবীর সঙ্গে রীতিনীতির ভারতীয় জীবনের কোন তুলনা চলে না। আমাদের অবরোধপ্রথা আছে, কিন্তু Privacy-র প্রতিশব্দ বাংলাভাষায় নেই।

অনুমান একটি চলল মধুরতর পথ বেয়ে।

নীল-নয়না না-ই বা থাকল, কোন এক কাজল আঁখির টান আছে কি এর পিছনে? জীবনীকারেরা এতকাল ধরে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সে-গুলির পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। রোম্যান্স জিনিসটাই রোমাঞ্চকর। তার সঙ্গে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন তুললে অনেকে অসন্তুষ্ট হবেন—বিশেষ করে বাঙালী পাঠক সমাজ।

পিতার নির্বাচিত পাত্রী সম্বন্ধে গৌরদাস বলেছেন, একেবারে পরীর মত দেখতে—"who was a cherub, a veritable Peri.[৪৮]

কিন্তু মধু গুরুজন-নির্বাচিত পাত্রী চান না। সুন্দরী পাত্রী হলেও। "অন্যের অনুরোধে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিসর্জন দেওয়া মধুর স্বভাব-বিরোধী, সে-ইচ্ছা গুরুজনদের হলেও। যার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তার মনের মিল হয় নি, তাকে কী করে সে গ্রহণ করবে; এটা তার চিন্তারও অতীত। কী করে ঐ পাত্রী গ্রহণ করবে, যার সঙ্গে মতের মিল হয় নি। মধু বিশ্বাস করত নারীপুরুষের মধ্যে সত্যকার প্রেম এর উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবাহ

ব্যাপারে নিতান্ত জৈবিক অনুভূতি তাঁর হৃদয়ে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। সে বিবাহ-পূর্ব প্রণয় চাইত, যদিও বিবাহ-পূর্ব প্রেম হিন্দু পরিবারে অলীক রূপকথা। শুধু মাত্র দৈহিক সৌন্দর্য দেখে তাঁর মনে কোন আবেগ জন্মাত না; পারস্পরিক ভালবাসা পারস্পরিক আবেগ ও অনুভূতির বিনিময় ব্যতীত প্রকৃত ভালবাসা জন্মাতে পারে না বলে সে মনে করত। প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা এ ব্যাপারে অন্য রকম আচরণ করতে পারে না। শিশু মুখ দেখলে তার মনে ভালবাসার পরিবর্তে স্নেহ জন্মাত, ছোট্ট বোনের জন্য বড় ভাইয়ের মনে যে ভাব দেখা দেয়। সে আমাকে প্রায় বলত, সে বরং চিরকুমার হয়ে থেকে মরবে, তবু সে নিরক্ষরা অশিক্ষিতা এবং সহানুভূতিশূন্যা কোন বালিকাকে বিয়ে করবে না। সে-যুগে আমাদের সমাজে এই রকম শিক্ষিতা মেয়ের সন্ধান পাওয়া ছিল অসম্ভব।"[৪৯]

মধুর হৃদয়পটের আভাস গৌরদাস যথার্থই দিয়েছেন। শুধু যেখানে তথ্য পরিবেশন করেছেন, সেখানে ভুল করেছেন। ষাট বৎসরের বৃদ্ধ আঠারো বৎসরকে ঠিক ধরতে পারেন নি।

"সে-যুগে আমাদের সমাজে শিক্ষিতা নারীর সন্ধান পাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল জনৈক দেশীয় খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকের পরিবারে, কিন্তু সেখানে মধুর যদি কোন আশা থেকেই থাকে, তা অঙ্কুরেই ঝরে পড়েছিল।"[৫০]

গৌরদাস দেশীয় যে খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকের কথা বলেছেন, তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারেন না। সম্প্রতি কালে রেভারেণ্ড যদুনাথ ঘোষের কথাও কেউ-কেউ ভাবতে শুরু করেছেন।

কিন্তু যদুনাথ ঘোষ তখন চার্চ মিশনারী কলেজের ছাত্র। জনৈক সিংহলী ছাত্র স্যামুয়েল নিকোলাস এবং যদুনাথকে নিয়েই এই নতুন মহাবিদ্যালয়টির কাজ শুরু হয়। সংবাদপত্রে বলা হয়েছে—"**an independent institution from the Bishop's College.**"[৫১]

সমাজে ছাত্রাবস্থায় বিবাহের প্রশ্ন ওঠে না; আর বিবাহাদি না হওয়ায় সন্তান-সন্ততিও প্রত্যাশা করা যায় না।

মধুর সঙ্গে যদুনাথের পরিচয় ছিল। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে মাদ্রাজ থেকে গোপনে মধু একবার কলকাতায় আসেন। বন্ধুবান্ধব কারো সঙ্গে

দেখা করেন নি, কেবল যদুনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ১৮৫১ সনে ছাত্র গৌরদাস লিখেছেন :

"মধু যখন বিশপস্ কলেজে ছিলেন তখন আমি হামেশাই দেখতে যেতাম। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর কন্যাদের সাবলীল ও মনোরম সংসর্গে মধু তখন কালাতিপাত করতেন। সেখানে তখন থাকতেন শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, তাঁর স্ত্রী (যিনি ছিলেন কৃষ্ণমোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা), এবং জনৈকা বিধবা ব্রাহ্মণ তরুণী। এই ব্রাহ্মণ বিধবা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এবং রেভারেণ্ড গোপাললাল মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। রেভারেণ্ড গোপাললাল মিত্র ছিলেন সে-যুগের বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত।"

এই উদ্ধৃতিটি যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অত্যন্ত বিভ্রান্তিমূলক ; একটি উদ্ধৃতিতে যে কত ভুল সংবাদ আছে, তার ইয়ত্তা নেই।

১. মধু যখন বিশপস্ কলেজে, তখন কৃষ্ণমোহন অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন নি। ১৮৫২ সনের মার্চ মাসে তিনি বিশপস্ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

"Bishop's College—Rev. K. M. Banerjea appointed second to the two Professorships at Bishop's College, created in consequence of the decease of the late Revd. Professor Street.[৫২]

মধু ১৮৪৪-৪৮ সনে বিশপস্ কলেজে লেখাপড়া করেছেন। ১৮৪৪ সনে নভেম্বরে তিনি ভর্তি হয়েছেন ; ১৮৪৮ সনে জানুয়ারি মাসেও তাঁর নাম পাওয়া যাচ্ছে রেজিস্টারে। যেহেতু কৃষ্ণমোহন তখনও এসে পৌঁছান নি, সেই হেতু মধুর পক্ষে তাঁর সংসর্গ ও তাঁর পুরনারীদের 'মনোরম সংসর্গ' উপভোগ করবার সুযোগ জোটে নি। তা ছাড়া মধু যখন খ্রীস্টান হলেন, তখন কৃষ্ণমোহনের সব কয়টি কন্যা জন্মগ্রহণও করেন নি।

১৮৩৫ সনে ২৪ পরগণার জেলা-শাসকের আদালতে মামলায় জিতে কৃষ্ণমোহন তাঁর পত্নী বিন্দুবাসিনী দেবীকে তাঁর পিত্রালয় শালিখা থেকে নিয়ে এলেন ; এক রকম উদ্ধার করলেনই বলা যায়। হাওড়ার শালিখা তখন ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

"Soon after his return in 1835 from the Upper Provinces,

he rescued with the aid of the Magistrate of the 24 Parganas (Mr. J. H. Paton) his wife from the custody of her parents."[৫২]

১৮৩৭ সনে হেদুয়ার গির্জা প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষ্ণমোহন তাঁর পত্নীকে নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন। এখানে তাঁর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বাকি দুই সন্তান বিশপস্ কলেজে তিনি অধ্যাপক হলে ১৮৫২ সনের পর জন্মগ্রহণ করে।[৫৩]

হেদুয়াতে তাঁর পত্নী প্রথমে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। ঐ পুত্র-সন্তানটি শৈশবেই মারা যায়। সে হোল ১৮৩৮ সনের কথা। অতঃপর তাঁর প্রথমা কন্যা কমলমণি জন্মগ্রহণ করেন। কমলমণির ১৮৪০ সনের কাছাকাছি কোন তারিখে জন্ম হয়।[৫৪] বিন্দুবাসিনী দেবীর প্রথমা কন্যা দুই বৎসরে পদার্পণ করলে মধুসূদন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার সঙ্কল্প নিয়ে কৃষ্ণ-মোহনের গৃহে আনাগোনা শুরু করেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণমোহনের কন্যাদের রূপলাবণ্য কি করে আকর্ষণীয় হতে পারে তা তো আমাদের মাথায় আসে না! গৌরদাস লিখেছেন—"The infantile face gave rise in his mind to fraternal sanctions such as a grown up brother feels for his little sister." কমলমণির শিশুমুখ কি করে মধুসূদনের মনে ভিন্নতর বা উচ্চতর অনুভূতি সৃষ্টি করল, তা বিস্ময়ের! আর দৈবকী তো তখন জন্মগ্রহণই করেন নি।

২. অথচ বাংলাদেশের মধু বিষয়ক নবীনতম (এবং মৌলিকতম) ব্যাখ্যায় শ্রীমতী দৈবকীর সগৌরব উপস্থিতি লক্ষ করি। ভদ্রমহিলা বড়ই ভাগ্যবতী; জন্মলাভের পূর্বেই বাংলার নব্য কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির প্রণয়ভাগিনী হয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কুশলী লেখক বনফুল মধুসূদনকে অবলম্বন করে একটি উপাদেয় নাটক রচনা করেছেন। তিনি দৈবকীকে বেশ মানানসই যুবতী করে হাজির করেছেন।

ভদ্রমহিলার বিবাহ হয় ১৮৫৬ সনে অক্টোবর মাসে। খবরটি এইভাবে বের হয়—

"At Bishop's College chapel, by the Revd. Dr. Kay, Dwaki, second daughter of the Rev. Banerjea to the Revd.

Henry Sells, Missionary. S. P. G."[৫৫] বিবাহকালে দৈবকীর বয়স ১২।১৩ বৎসরের অধিক ছিল না। কারণ উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকাই যথেষ্ট সাবালিকা বলে সাব্যস্ত হোত। শুধু বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে নয়, ইউরোপীয় বা খ্রীস্টীয় সমাজে। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এর 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ীর বয়স কত ছিল? মৃন্ময়ীর মনের পরিবর্তনের যে-কয়টি স্তরের খবর লেখক দিয়েছেন তার কোনটিই অস্বাভাবিক হয় নি, অ-বয়সোচিত হয় নি। 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট'-এ জুলিয়েটের বয়সও তো ছিল তের। তাকে কেউ অবাস্তব চরিত্র বলে নি।

মধুসূদন ১৮৫৬ সনে জানুয়ারি মাসে মাদ্রাজ থেকে ফেরেন এবং ফিরে বিশপস্ কলেজে অবতরণ করেছিলেন। উঠেছিলেন কৃষ্ণমোহনের গৃহে।

হয়তো দৈবকীর বিবাহের শুভ অনুষ্ঠানে তিনিও যোগদান করেছিলেন; হয়তো পেট পুরে মিষ্টান্নাদি খেয়ে সপ্রমাণ করেছিলেন বঙ্কিমের সেই বিখ্যাত উক্তির যথার্থতা, 'বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ আছে।'

কোন কোন মধু-গবেষক জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সঙ্গে মধুর নানা মত-পার্থক্যের পিছনে প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সন্দেহ করেছেন।[৫৬]

ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের প্রথমা পত্নীব মৃত্যু হয় ১৮৫১ সনের ১৬ই জুলাই। সম্ভবত মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তিনি মারা যান। জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর পত্নীকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। পত্নীকে ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করার জন্য একজন ইংরেজ 'গবর্ণেস' রেখেছিলেন। ভদ্রমহিলার নাম ছিল বালাসুন্দরী দেবী। তিনি নিজেও খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন; কুলবধূ বলে এগিয়ে আসতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেন। ১১ই জুলাই জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দীক্ষা সমাপন হয়, আর ১৬ই জুলাই বালাসুন্দরী ইহলোক ত্যাগ করেন।[৫৬ক]

জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে কয়েকটি তথ্য পাচ্ছি।

"He has scarcely ever held any communication with them (missionaries), and his convictions are said to have been gradually maturing themselves to his own mind for the long space of time since. His wife who died a short

time since is understood to have received instructions from him in the great principles of Christian faith, and to have died professing her reliance upon Christ as her saviour."[৫৭]

বালাসুন্দরীর খ্রীস্ট-অনুরাগ খ্রীস্টীয় মিশনারীদের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক সংবাদ বলে পরিগৃহীত।

এই কারণে মিশনারী-লিখিত তাঁর এক স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৩৩ সনে যশোহরের এক (কালীপূজক) পুরোহিত সূর্যকুমার চক্রবর্তীর গৃহে বালাসুন্দরী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সের কন্যাকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সূর্যকুমার পিরালীব্রাহ্মণ জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সঙ্গে বিবাহ দেন। বোধহয় এই বিবাহও মধুসূদনের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পূর্বে সুসম্পন্ন হয় নি। বালাসুন্দরী ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। ('The Eastern Lily gathered. A Memoir of Balasundari Tagore with observations on the position and prospects of Hindu Female Society.' By the Revd. Edward Storrow. London, John Snow. 1852, 86 pages)।

বালাসুন্দরীর মৃত্যুর নয় মাস পরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন কৃষ্ণমোহনের প্রথমা কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। "April 15—At Calcutta, Baboo Gannandra mohun Tagore to Kamal, the eldest daughter of the Revd. K. M. Banerjea."[৫৮] জ্ঞানেন্দ্রমোহনও ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে কমলমণির সঙ্গে প্রণয় করার সুযোগ পান নি, অবৈধ ভাবেও নয়।

৩. এই বালাসুন্দরী দেবীর প্রভাবে পড়েই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিধবা ভাইঝি খ্রীস্টধর্মের প্রতি অনুগত হয়ে পড়েন। অভিভাবকেরা ভয় পেয়ে তাঁকে কাশী পাঠিয়ে দেন। বালাসুন্দরীর মৃত্যুর পর তাঁকে কাশী থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু এতেও কুল রক্ষা পেল না। একদিন জ্ঞানেন্দ্রমোহনের চক্রান্তে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। এই ভদ্রমহিলার নাম মহেশ্বরী দেবী। মহেশ্বরী দেবী এসে আশ্রয় পেলেন কৃষ্ণমোহনের গৃহে। ১৮৫২ সনে ১৮ই নভেম্বর কৃষ্ণমোহন তাঁকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দেন।[৫৯] খ্রীস্টান হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে রেভারেণ্ড গোপাললাল মিত্রের বিবাহ হয়। ১৮৪৩ সনে তিনি বিধবা হন, আর ১৮৫৩ সনে তাঁর

পুনর্বিবাহ হয়। গৌরদাস এই বিধবা ব্রাহ্মণ বালিকার কথাই বলেছিলেন ; কৃষ্ণমোহনের গৃহে এঁর আশ্রয়-লাভ, খ্রীস্টান হওয়া, এবং বিবাহ—সবই ঘটেছে মধুর মাদ্রাজ-প্রবাস কালে। অতএব এঁর 'মনোরম সংসর্গ' থেকেও মধু বঞ্চিত হয়েছেন।

মধুর খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পিছনে নারী-ঘটিত কোন সংবাদ তাই সত্য নয়। থাকলে বিষয়টি মনোরম হোত, এবং আমরাও খুশি হতাম। 'মধু-স্মৃতি'র পরিশ্রমী লেখক নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন "বেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকী নাম্নী রূপবতী বিদুষী দ্বিতীয়া কন্যার সহিত মধুসূদন পূব হইতেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া মধুসূদন তাঁহার পাণিগ্রহণের একান্ত অভিলাষী ছিলেন। উক্ত কুমারীও মধুসূদনের বিবিধ সদ্‌গুণে তাঁহার প্রতি অনুবাগিণী হন। এ বিবাহে কন্যার পিতার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি মধুসূদনকে সুরাপান ত্যাগ করিতে বলেন। মধুসূদন কিছুতেই পানদোষ ত্যাগ না করায় এ বিবাহ হয় নাই।"[৬০]

বাংলার প্রিয় লেখক বনফুল 'মধুস্মৃতি'র এই অনুচ্ছেদটির উপব নির্ভর করে তাঁর অসাধারণ নাটকের মধুসূদন-দৈবকীর উপর উপাদেয় পর্বটি রচনা করেছেন। তিনি তো গবেষক নন, তিনি স্রষ্টা।

এই গালগল্পটি বাংলাদেশে এতকাল সত্য বলেই চল্‌ছিল। বনফুল যা শিল্পীর সংযমে বলেছেন, অন্যান্য নাট্যকার অযথা তাকে বাড়িয়ে-ফাঁপিয়ে তুলেছেন। অবশ্য অসত্য কদাচিৎ সংযতভাষী। এমন কি, মধুর খ্রীস্ট-ধর্ম গ্রহণের পিছনে বিশেষভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবও কাজ করে নি। বাল্যবন্ধুরা সবাই বলেছেন—"তাঁর স্বধর্ম ত্যাগের উদ্দেশ্য হোল বিলেত যাওয়া।"[৬১]

হিন্দুধর্ম বা হিন্দুর সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অন্যান্য নব্যশিক্ষিত যুবক অপেক্ষা মধু অভিনব কোন অভিমত পোষণ করতেন না। তখন সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় যে-ধরনের আলোচনা চলত, জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গল স্পেকটেটর, রিফর্মার পত্রিকায় যে-প্রকার টীকাটিপ্পনীর রেওয়াজ ছিল, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, চড়কপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-ধরনের মতামতের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বেরুত, মধুর মতামত তার থেকে ভিন্নতর ছিল না। না ঔজ্জ্বল্যে, না স্বভাবে।

সংস্কার-আন্দোলন ইউরোপেও খ্রীস্টধর্ম-বিরোধী ছিল না, যুক্তিহীনতার বিরোধী ছিল।

জর্জ স্মিথ লিখেছিলেন, "ভারতের প্রায় অধিকাংশ ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া ছাড়া খ্রীস্ট মতের আর সবই সমর্থন করে। এমন কোন নিশ্চিত পদক্ষেপ সে নিতে চায় না যার ফলে সে হিন্দুসমাজ থেকে একঘরে হয়ে যাবে। হয় তাকে সামাজিক মৃত্যু বরণ করতে হবে, না হয় জীবন্মৃত হয়ে থাকতে হবে। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা অধিকতর বুদ্ধিজীবী এবং উৎসাহী, তাঁদের জন্য ব্রাহ্মমত এই ধরনের একটা আপোষমূলক ব্যবস্থা।"[৬২]

ধর্মমত নিয়ে মধু কি তত ব্যাকুল ছিলেন? মধুর বিদ্রোহ ব্যক্তিগত, কিন্তু মানসিকতা সর্বজনীন। মধু যাঁকে দেখেন নি, যাঁকে ভালবাসেন নি, তাঁকে বিবাহ কবতে চান নি—বাবার অনুরোধেও নয়, মায়ের অশ্রুপাতেও নয়। মধু মনে কবতেন—"The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete".[৬৩]

মিথ্যাচার তিনি সহ্য করতে পারতেন না; আদর্শ আর আচরণ পৃথক হবে না তাঁর কাছে। ঠিক একই কথা বলেছিলেন দশ বৎসর আগে যুবক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—

I will never be able to utter a falsehood. How can I with a safe conscience disgrace Philosophy, disgrace humanity, disgrace character of man by uttering what is not a fact. A Father versus Truth. ...we are doomed to suffer—all these misfortunes. Truth comes and hardens our feelings. Truth prevents us from yeilding to a father's cries, and mother's solicitations. I break down the chains of filial duty for Truth. (The Persecuted, Act II/Sc I, 1832)

কেবল কৃষ্ণমোহন নন, অনেকের জীবনে সে-যুগে এইপ্রকার 'সত্য' নিষ্ঠা দেখা গেছে। এই কারণে 'ইয়ং বেঙ্গল' আর 'সত্য'—এই শব্দ দু'টি নাকি সে-যুগে সমার্থক হয়ে পড়েছিল।[৬৪]

কৃষ্ণমোহনদের অনুরূপ সত্য-নিষ্ঠা মধুসূদন বিবাহপ্রসঙ্গে টেনে এনেছিলেন। নব্য আদর্শ ক্ষেত্রবিশেষে প্রযুক্ত হবে, এই মত মধুর মত নয়।

"আমি ক্রাইস্ট চার্চের পাদরী হিসাবে তখন কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে বাস করছি। একদিন সে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল—আমাকে এই বলে

সে পরিচয় দিল যে, সে ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু—প্রায় খ্রীস্টান হবার মত মনোভাব নিয়ে ফেলেছে। দুই তিনদিন দেখা সাক্ষাতের পর এবং বেশ খানিকটা কথাবার্তা চলার পর আমি বুঝতে পারলাম যে, তার খ্রীস্টান হওয়ার ইচ্ছা তার বিলাত গমনের ইচ্ছা থেকে বড় নয়। দুটি প্রশ্ন এক করে ফেলতে আমার আপত্তি ছিল, প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম ; দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম যে, এ ব্যাপারে তাকে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না। মনে হোল আমার এই কথায় সে মুষড়ে পড়ল : এবং তারপর থেকে তার যাতায়াত কমে গেল। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি আমার এক উচ্চপদস্থ বন্ধুকে বিষয়টি বললাম—হিন্দু কলেজের একটি ছাত্র খ্রীস্টান হতে চায় এবং বিলেত যেতে চায়—দুটোই চাইছে সে এক সঙ্গে। আমার বন্ধু বিষয়টি শুনে ঔৎসুক্য বোধ করলেন, ঐ উৎসাহী ছাত্রটিকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পরে যখন দত্তের সঙ্গে আমার দেখা হোল, তখন তাকে আমি সে-কথা বললাম। এবং দত্তের ইচ্ছানিবন্ধন ঐ ভদ্রলোকের কাছে তার জন্য একটি পরিচয়পত্র দিলাম। ভদ্রলোক তাকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং তার প্রস্তাবে সর্বপ্রকার উৎসাহ দেখালেন। এমন কি বাংলার সহকারী গভর্নর মিঃ বার্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।"

মধুসূদনের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে অনেকে বেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণমোহন যে-কারণে মধুকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সে কারণটি তো শেষ পর্যন্তও টিকে ছিল। তবু কেন তিনি সহায়তা করলেন ? আসলে এই যুগে খ্রীস্টান পাদরীদের জর্ডান নদীর জল-সিঞ্চনে অতি-ব্যগ্রতা ছিল। এমনও দেখা গেছে, এই অতি-ব্যগ্রতার সুযোগ নিয়ে একই ব্যক্তি চার জায়গায় চার বার পাণিগ্রাহী হয়ে অর্থ আদায় করেছে।[৩৫] স্বয়ং কৃষ্ণমোহন ব্রজনাথ ঘোষের ব্যাপারে যে-ব্যগ্রতা দেখিয়েছিলেন, তা কেউ ভুলতে পারে না। কাজেই কৃষ্ণমোহন ধর্মতৃষ্ণা অপেক্ষা অন্যতৃষ্ণা প্রবলতর বলে মধুকে দীক্ষা দেন নি, এ খবর সত্য নয়।

প্রকৃত ঘটনা সম্ভবত ভিন্ন প্রকার। আমরা আর একটি বিবরণ তুলে দিচ্ছি, যা সমকালীন ব্যক্তির লেখা।

"মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীস্টান হওয়ার অভিপ্রায়ে পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া (শুনিয়াছি) প্রথমে কৃষ্ণমোহনের আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণমোহন

দেখিলেন যে, মধুর পিতা রাজনারায়ণ বাবু একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। তাঁহার জমিদারীতে অনেক লাঠিয়াল শড়কিওয়ালা আছে, বিশেষ সমস্ত ধনাঢ্য হিন্দুদিগের সহানুভূতি রাজনারায়ণ বাবুর পক্ষে, অধিকন্তু কলিকাতার পুলিশ তখন পরাক্রান্ত ছিল না, অতএব রাজনারায়ণ বাবু ইচ্ছা করিলে তাঁহার গৃহ হইতে বলপূর্বক লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন, এই আশঙ্কায় যে পর্যন্ত ব্যাপটাইজ করা না হয় সে পর্যন্ত মধুকে কেল্লার মধ্যে কোন স্থানে গোপন করিয়া রাখিবার মন্ত্রণা করিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শ মতে লাট-পাদ্রী কেল্লার কর্তা ব্রিগেডিয়ার পৌণী সাহেবকে অনুরোধ করিয়া কেল্লার মধ্যে ঐ সাহেবের কুঠরীতে থাকিবার এরূপ একস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন যে, তথায় যাইয়া রাজনারায়ণ বাবু কিংবা অন্য কোন বাঙ্গালী মধুর প্রতি বল প্রয়োগ করিতে কোন মতেই সমর্থ হইবে না।" নবজীবনের আর একটি প্রবন্ধে (মধুসূদন দত্ত, পৃ-৩৪০) প্রায় একই প্রকার তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সেখানেও কৃষ্ণমোহনের দায়িত্ব সর্বাধিক বলে বিবেচিত।

লাঠিয়াল শড়কিওয়ালাদের ভয় অমূলক নয় ; শ্যামাচরণ বসু নামক জনৈক বালক ইণ্টালী মিশনের স্কুলে পড়ত। তাকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয় ; কিন্তু তার অভিভাবকেরা বলপূর্বক তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে ১৮৪২ সনে নভেম্বর মাসে ; খবরটি প্রকাশিত হয়·১৮৪৩ সনের এপ্রিল সংখ্যা The Missionary Herald পত্রিকায়। খ্রীস্টান রাজা খ্রীস্টান পুরোহিতদের সহায়তা করলেন না, এই মর্মে অভিযোগও উত্থিত হয়েছিল।

মিশনারীরা শ্যামাচরণ বসুর ঘটনার পর সতর্ক হয়ে যান।

মধুসূদনের ক্ষেত্রে যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। কোম্পানীর অতি প্রিয়পাত্র ও মধুর পিতৃমুরুব্বী ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষালকে পর্যন্ত মধুর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় নি। শুধু ভূদেব, গৌরদাস প্রভৃতি বন্ধুদের সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করতে দেওয়া হয়েছিল।

কৃষ্ণমোহনের ভূমিকা এক্ষেত্রে প্রধান ছিল। কেল্লার অভ্যন্তরে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকার পরামর্শটি দিয়েছিলেন কৃষ্ণমোহনই।

মধুর দীক্ষার সাতদিন পূর্বে ঐ একই গির্জায় তিনি বীরচন্দ্র দে নামক এক বালককে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। মধুর খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ আর বীরচন্দ্র দে-র দীক্ষা একত্রে Calcutta Christian Observer-এ প্রকাশিত হয় ; এবং

মন্তব্য করা হয়, "Both have given decided piety and have long been candidates for the rite of baptism." (1843, April, page 201)। হিন্দু ছেলের ধর্মান্তরকরণে তাঁর নিস্পৃহতা ছিল না, বরং তাঁর উৎসাহ ছিল। বীরচন্দ্র দে সম্বন্ধে আমাদের কোন কৌতূহল নেই ; কিন্তু মধুসূদন সম্বন্ধে বলতে পারি যে, তাঁর খ্রীস্টান হবার ব্যাকুলতা ১৮৪২ সনের নভেম্বরের পূর্বে দেখা দেয় নি ; এবং সে ব্যাকুলতা ধর্মপিপাসুর ব্যাকুলতা নয়। চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ওল্ডমিশন চার্চে আর্চডিকন ডিয়াল্ট্রি মধুকে দীক্ষা দেন। ৯ই ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যা। জাতি-ধর্মের বেড়া ভেঙ্গে আর্চডিকনের গৃহে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয় ভূদেব ও গৌরদাস এসে উপস্থিত হলেন। মধু পূর্ববৎ সহাস্য মুখে বন্ধুদেব সংবর্ধনা করলেন। বন্ধুরা হাসতে পারলেন না। গৃহে ফিরে গেলেন তাঁরা বিষণ্ণ মুখে। গৌরদাস পরে এই বিষণ্ণতার কটু প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন, ভূদেব সারাজীবনেও কাটাতে পারেন নি। তাঁর মতে খ্রীস্টান মধুর দেহকান্তি নাকি পূর্ব ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছিল। অথচ কে না জানে পাত্রপরিবর্তনে মধুর স্বাদ অপরিবর্তিত থাকে।

মধুর প্রার্থনা-সঙ্গীতের প্রথম স্তবকে বলা হয়েছে, আমি বহুকাল পাপ ও শয়তানের দ্বারা চালিত হয়ে কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। আলো দেখিতে পাই নি, এতকাল তার জন্য কোন তৃষ্ণাও বোধ করি নি— যে আলো অন্ধব্যক্তিকে ঈশ্বরের সামীপ্যে নিয়ে যায়।

মধুর কাছে এই ঈশ্বর হলেন ইংল্যাণ্ড। স্যার হামফ্রি ডাবির (Sir Humphrey Davy) অমর উক্তি "London is the grand theatre of intellectual activity." শুধু মধুর নয়, বহু নবীন যুবকের প্রাণের কথা।

খ্রীস্টান হয়ে মধু গৃহচ্যুত হলেন। কিছুকাল থাকলেন ওল্ড মিশনের সঙ্গে যুক্ত চাপলেন ভন্‌-এ ; কিছু দিন কাটল আর্চডিকন ডিয়ালট্রির গৃহে। কিছুদিন ডেকার্স লেনে রেভারেণ্ড টি· স্মিথের গৃহে।

খিদিরপুরের বাড়ির খবর ভাল নয়। দরোজাটুকু খোলা আছে। অন্দরটুকু নেই। বিধর্মী হলেও পুত্র মাকে দেখা দিতে যান। জননী জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসেন, খালি হাতে নয়। মায়ের কাছে পান চোখের জল আর মুঠো ভরা টাকা। বন্ধুরা সব ভয় পেয়ে গেছে ; ততোধিক ভয় পেয়েছেন তাঁদের অভিভাবকেরা। হয়তো নিষেধও করেছেন।

বন্ধুদের সঙ্গে মধুর দেখা-সাক্ষাতের পালা কমে আসতে লাগল। 'ওল্ড মিশন চার্চে' তিনি আছেন—কয়েকদিন গৌরদাস এলেন না। মধু বিচলিত; চিঠি লিখলেন—লিখলেন ইংরেজীতে তার শীর্ষে রোম্যান হরফে এই বাংলা বাক্যটি জুড়ে দিলেন।—"ও গৌর! দু'দিন চারদিনেতেই এত।" চিঠির শেষ নাম সই করলেন—M. S. D.

মধুর ধর্মান্তরণের কাহিনী বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় ১৩ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। ঐ কাহিনী থেকে জানা যায়, প্রথমে তিনি এক ধর্মযাজকের কাছে খ্রীস্টান হবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। ঐ ধর্মযাজক তাঁকে আর্চডিকন ডিয়ালট্রির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা ছিলেন বিত্তের অধিকারী; তাঁরা তার খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের সংকল্পে বিশেষ কুপিত হন। কিন্তু বালকটি সেই সব আপত্তি ও ক্রোধ অগ্রাহ্য করে আপন সংকল্পে অটুট থাকে। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে এক হাজার টাকা পাঠিয়ে বলা হয় তিনি যেন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি শর্তসাপেক্ষ ঐ অর্থ গ্রহণে অসম্মত হন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময় তিনি কবিতা রচনা করতেন। তাঁর বহু কবিতা লিটরারী গেজেটে ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

মধুসূদনের খ্রীস্টান হওয়ার সংবাদটি মিশনারীদের পত্রিকাসমূহে সাড়ম্বরে স্থান পেয়েছিল। হরকরা থেকে শ্রীরামপুর মিশনারীদের মুখপত্র ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পূর্ণ রিপোর্টটি পুনর্মুদ্রিত করে। অন্যান্য মিশনারী পত্রিকার ভিতর 'ক্যালকাটা ক্রিস্টিয়ান অবজারভারে' সংবাদটি এপ্রিল সংখ্যায় ছাপা হয়। 'দি চার্চ ম্যাগাজিনে' (The Church Magazine) ১৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রার্থনা-সঙ্গীতটি বিশপ হিবারের লেখা দুটি প্রার্থনা-সঙ্গীত ও ওয়াট্‌সের একটি প্রার্থনা-সঙ্গীতের পাশে স্থান পায়। এবং পত্রিকায় লেখা হয় "This convert was baptized on the evening of the Feb. 9th by Arch Deacon Dealtry. We ask the prayers of all our readers on his behalf that he may grow in Christ, and continue in Him, rooted and bulit up in Him, to his life's end."[৬৩]

মধুসূদন ধর্মজিজ্ঞাসু নন, ধার্মিকও নন (হায় ধর্ম!)। মধু ইহবাদী। রাজনারায়ণের কুটুম্বরা পরামর্শ দিলেন মধু তো মেরীমাতার নন্দনের প্রেমে

পড়ে খ্রীস্টান হন নি, কাজেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে স্বধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। চেষ্টা চলতে লাগল।

প্রায়শ্চিত্তের খবর কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধেও রটেছিল। মনুসংহিতার বিধান' এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল।[৩৭]

মধুর কয়েক মাস আগে ধর্মান্তরিত শ্যামাচরণ প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠে গেলেন।[৩৮] মধুর পরবর্তী যুগে চন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রায়শ্চিত্ত করে স্বসমাজে গৃহীত হয়েছিলেন। চন্দ্রমোহন ছিলেন রমানাথ ঠাকুরের ভাইপো; কাজ করতেন পটলডাঙ্গা ব্রাঞ্চ স্কুলে।

মধু ধর্মের ঔৎসুক্যে খ্রীস্টান হন নি; কিন্তু তাই বলে সম্পত্তির প্রলোভনে হিন্দুধর্মে ফিরে যেতে হবে? মধুর মাহাত্ম্য শুধু কবিত্বে নয়, মধুরতায় নয়, মধুর মাহাত্ম্য দৃঢ়তায়ও মিলবে।

তিনি জানতেন জ্ঞাতিত্ব-ভ্রাতৃত্ব-জাতিত্ব সকল জলাঞ্জলি দেওয়া মনুষ্যোচিত কাজ নয়। বিভীষণ স্বধর্মে থেকেও সব পরিত্যাগ করেছিল; তাই মেঘনাদের কাছে তার প্রাপ্য হয়েছিল তীব্র ভর্ৎসনা। মধুসূদন অন্য ধর্ম আশ্রয় করে জাতিত্ব বিসর্জন দিয়েছেন ব'লে মনে করেন না। ধর্ম ব্যক্তিগত; জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতীয়তা সামাজিক। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী হলেন না।

প্রায়শ্চিত্ত না করুন, কিন্তু পরিবারের সঙ্গে সমঝোতা নিকটতর হোল। স্মিথ সাহেবের বাড়িতে আছেন; ভদ্রলোক ধর্মযাজক; তাঁর কাছে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা সাধারণত বাইবেলের পাঠ নিয়ে থাকে। মধুসূদন পাঠ নিয়েছেন শেক্সপীয়রের। স্মিথ কলকাতায় দুর্লভ শেক্সপীয়র বিশেষজ্ঞ।

এতদিন অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের কাছে পড়েছেন। সে ব্যাখ্যা অতুলনীয়। এবার আর একটি ব্যাখ্যা শুনেছেন, এ ব্যাখ্যাও নতুন। বন্ধু গৌরদাসকে শেক্সপীয়র রসাস্বাদনে যোগ দেবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

স্মিথ সাহেবের সংসর্গ মধুর পক্ষে হিতকর হয়েছিল কিনা জীবনী-লেখকেরা তা বলেন নি। কিন্তু শেক্সপীয়র মধুকে মুর-বাইরনের আতিশয্যে-ভরা দুনিয়া থেকে সরিয়ে নিতে সাহায্য করবে। শেক্সপীয়রের সাহচর্য মধুর প্রয়োজন ছিল।

মধু একদিনের জন্যও ভুলছেন না বিলেত যাওয়ার কথা। কারও সঙ্গী হয়ে নয়, একা স্বতন্ত্রভাবে বিলেত যেতে চান তিনি। আর্চডিকন বিলেত চলেছেন, তাঁকে সঙ্গী হতে আহ্বান জানালে তিনি ধন্যবাদ সহ অসম্মতি

জানালেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত চাইবেন না যে, তাঁর পুত্র ডিয়ালট্রির আনুকূল্যে বিলেত যায়। ডিসেম্বরের আগে তাঁর দেশত্যাগের কোন সম্ভাবনা নেই।

কয়েকমাস অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটল। হিন্দু কলেজের দরোজা কি তাঁর কাছে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে? প্রথমে তিনি হাল ছাড়েন নি; ফেব্রুয়ারিতে খ্রীস্টান হয়েছেন—মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করলেন। পরে মে মাস, তারপর এক সঙ্গে জুন-জুলাই দু'-মাসের বেতন পরিশোধ করে দিলেন।[৭০]

সম্ভবত আর দুই-এক মাসের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন হিন্দু কলেজে ধর্মান্তরিত ছাত্রের প্রবেশাধিকার নেই।

ওখানে হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্তের জারজ সন্তানের স্থান হবে, কিন্তু রাজনারায়ণের কুলত্যাগী (?) পুত্রের নয়। ওখানে খ্রীস্টান ইস্ট-ইণ্ডিয়ান পড়াতে পারবেন, কিন্তু হিন্দু-শিক্ষক খ্রীস্টান হলে শিক্ষক থাকতে পারবেন না। কৈলাসচন্দ্র বসুকে কর্মত্যাগ করতে হয়েছিল।[৭০ক]

কলেজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে কৌতূহল সমান আছে; ডি. এল. আর. বিলেত চলে যাচ্ছেন।

ডি. এল. আর.-কে বিদায় সংবর্ধনা জানান হচ্ছে—সহপাঠী রাজনারায়ণ গুরু-প্রণাম পাঠ করলেন—ছাত্রদের ভাষণের উত্তরে ডি. এল. আর. যা বলেছিলেন, তার প্রতিটি অক্ষর সোনার জলে লিখে রাখার যোগ্য।

"Soon after I joined the College, the students instead of asking me to lessen their labour and my own, very earnestly solicited that I would double the hours of literary study. I was surprised and gratified. Such an unquenchable thirst for knowledge I have never met with in the youth of any other country, neither have I anywhere else ever seen so clear and cordial an understanding between the teacher and the taught. A teacher's task therefore when he has Hindoo pupils is a peculiarly light and pleasant one for they are always willing and respectful."[৭১] এই বক্তৃতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে হয়তো মধুর উপস্থিতি অনেকের থেকে বেশি। ১৪ই

এপ্রিলের ক্যালকাটা স্টার পত্রিকা থেকে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ায় এই বক্তৃতাটি উদ্ধৃত হয়েছে।

১০ই এপ্রিল ডি. এল. আর. হিন্দুস্থান স্টীমারে চড়ে বিলেত যাত্রা করলেন। ২২-এ এপ্রিল মাদ্রাজ পৌঁছুলেন। ক'দিন পূর্বেই সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্যের পুলিশ প্রশাসন বিষয়ক বক্তৃতায় আপত্তি জানাতে গিয়ে ঐ সভার সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। মধুসূদনের কোন চিঠিতেই এই প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নি। মধু তখন অতশত বোঝেন না, তিনি কেবল কবি হতে চান। তাই বিদায়-উন্মুখ রিচার্ডসনের সঙ্গে পঞ্চাশ বার দেখা করেছেন।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের মাত্রা কমে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে গৌরদাস দেখা করেন। মাঝে মাঝে অভিমান জেগে ওঠে; অভিমানভরে লেখেন, তুমি আমাকে ভুলে যাচ্ছ গৌর। আমি তোমাকে ভুলি নি—আমি তোমাকে ভুলতে পারি না।

বিস্মরণের দেবতা হয়তো বধির।

তাই মধু আরও লিখেছেন, ভূদেব-বঙ্কু ওঁর কথা যেন মনে রাখে। যে সহপাঠী গত দু'বছর ধরে তাঁর কোন খোঁজ নেন নি, সেই বেণীমাধব বসুর জন্যও তিনি কত আঁকুপাঁকু করেছেন। ভোলানাথকে তিনি প্রীতি জানাচ্ছেন। ভোলানাথ, বঙ্কু, শ্যাম, মাধব, বেণী, গৌরদাস যে আজ পর্যন্ত ইতিহাসে টিকে আছেন, মধু তাঁদের মনে রেখেছিলেন বলে।

মধু খ্রীস্টান হলেও খ্রীস্টীয় সমাজে বন্ধু খোঁজেন নি। তাঁর যা কিছু মেলা-মেশা, তা হিন্দু সমাজের সঙ্গেই। এর থেকে তাঁর মানসিকতার খবর পাওয়া যায়। মধুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ভোলানাথ, বঙ্কুবিহারী, গৌরদাস, ভূদেব, রাজনারায়ণ, কিশোরীচাঁদ, দিগম্বর মিত্র, গণেশচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, যতীন্দ্র-মোহন, বিদ্যাসাগর, মনোমোহন ও উমেশচন্দ্র—কেউই এঁরা খ্রীস্টান নন। মধু নানা বয়সে নানা বন্ধু পেয়েছেন; মাদ্রাজে দু'জন ছাড়া সবাই হিন্দু সমাজের মধ্যে ছিলেন।

॥ ৭ ॥

কোন খ্রীস্টীয় বিষয় যেমন তাঁর কাব্যের বিষয় নয়, তেমনি কোন খ্রীস্টীয় বন্ধু তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়। যা কিছু সর্বজনীন, তাই তাঁর আচরণীয়,

অনুকরণীয়। ডিসেম্বরের পূর্বেই মধু বুঝতে পারলেন হিন্দু কলেজে তাঁর স্থান নেই। বিলেত যাত্রাও অবিলম্বে হচ্ছে না।

বাবার সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হয়ে এসেছে। এক চিঠিতে জানাচ্ছেন, বাবার কাছাকাছি একটা আস্তানা তিনি খোঁজ করছেন। বাবার আকর্ষণ থেকে বড মায়েব আকর্ষণ। প্রায়শ্চিত্ত করাব কথা আর উঠছে না।

রাজনারায়ণ বুঝলেন ছেলের লেখাপডার আরও সুযোগ দিতে হবে। হিন্দু কলেজেব দরোজা যখন বন্ধ হয়ে গেছে, তখন অন্য কোন বিদ্যায়তনে ভর্তি করে দিতে হবে।

খবর নিয়ে জানা গেল বিশপস্ কলেজে সাধারণ ছাত্র নেয়। হোক খ্রীস্টানী কলেজ, ছেলেকে ওখানে ভর্তি কবে দিলেন।

১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে বিশপস্ কলেজে মধু ভর্তি হলেন।

১৮২০ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে বিশপস্ কলেজ ৫০ হাজার পাউণ্ড খয়রাতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হযেছিল—উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ও অন্য খ্রীস্টান যুবকদের ধর্মযাজক, স্কুল শিক্ষক হবাব উপযোগী শিক্ষাদান করা। একজন অধ্যক্ষসহ তিনজন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হোল। প্রতি ছাত্রকে ২০০ পাউণ্ড বাৎসরিক বেতন দিতে হোত।[১২]

কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ পদে বৃত হলেন বেভারেণ্ড এইচ· মিলস্। মিলস্ ছিলেন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো। তিনি একজন র‍্যাংলার; ১৮১৩ সনে তাঁর সঙ্গেই পডেছেন হার্শেল ও পিকক।[১৩]

১৮২৪ সন থেকে ১৮৪১ সন এই সতের বৎসর তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলাদেশকে তিনি ভালোভা.ব জানতেন।

এই মিলস্ সাহেবই ইয়ং বেঙ্গলদের সবাইকে এক পর্যায়ে ফেলতেন না। এঁদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা খুব উল্লেখযোগ্য। তাঁর অবসর গ্রহণের পর রেভারেণ্ড জর্জ আমৃডি উইদার্স অধ্যক্ষ হয়ে যোগ দিলেন। ইনিও কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজেব এম· এ· উপাধিধারী। তাঁর অধ্যক্ষতা কালে মধুসূদন ভর্তি হন। এ সময়ে আরও দুই জন অধ্যাপক ছিলেন, অক্সফোর্ডের পেমব্রোক কলেজের এম· এ· উপাধিধারী রেভারেণ্ড স্ট্রীট, আর ট্রিনিটি কলেজের বি· এ· উপাধিধারী আর· ডবল্যু· কে· কোল্স। এ ছাডা শিক্ষকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রেভারেণ্ড গোপালচন্দ্র মিত্র—সেকালের বিখ্যাত গ্রীকভাষা বিশেষজ্ঞ; আর ছিলেন পণ্ডিত কুমারস্বামী। মধুস্মৃতির লেখক বলেছেন ইনি ছিলেন

COLLEGES, PUBLIC SCHOOLS, &C.

COLLEGE OF FORT WILLIAM,

Writer's Buildings

...itor	The Governor of Bengal
...aminer and Officiating Secretary, . .	Lieut Colonel S. D. Riley for Major G T. Marshall
...retary ... . . (on leave)	Major G T Marshall
...ccountant and Auditor of Accounts,	The Accountant General and Civil Auditor

BISHOP'S COLLEGE,

Garden Reach, near Calcutta

...UNDED IN 1820 BY "THE INCORPORATED SOCIETY FOR THE PROPAGATION OF THE GOSPEL IN FOREIGN PARTS, AT THE INSTANCE OF BISHOP MIDDLETON."

...itor	The Right Rev The Lord Bishop of Calcutta.
...ncipal .	Rev George Undy Withers D D of Trinity College Cambridge.
...r Professor,	Rev A W Street M A, of Pembroke College, Oxford.
...nior Ditto, . . .	Rev G J R Weidemann, B A, late Fellow of Catharine Hall, Cambridge.

Rev Gopal Chunder Mitter, Natt Syndic Fellow

Middleton Scholarships .	W W. Nicholls.
Jackson Fakhul Scholarships	T M Gennoe, E H Higgs; H. W St. Hill Calynath Nundy; Simeon, W. Brownlow.
Church Missionary Scholarships, ...	Vacant
Heber Foreign Theological Scholarships,	Vacant
Lord Powerscourt's Scholarship,	R C Walker
Mill Scholarship,	Sreenath Bhose
S P G Students, . .	T W Hewell, W Watts, D P. Harris, H Cockey, C D Cooper, Joshua Jeremiah, S R Doss, F Haycock.
Ceylon Students .. .	W H Gomes H Mootukistna, (Government Students), H. De Saron, J R Ondatjee
General or Lay Students,.... . .	M Dutt, A Dias

...IONARIES OF THE INCORPORATED SOCIETY APPOINTED FROM THE COLLEGE.

...erend	M R. DeMello, L L B. .	Tumlook.
"	Daniel Jones, ...	Tallygunge Mission, Bengal.
"	Jas. Bowyer, (on sick leave)	
"	W H Perkins,	Cawnpore Mission, in Hindoostan
"	C. E. Driberg,	Barripore Mission, near Calcutta.
"	A. H. Moore, ..	Ditto ditto ditto
"	T C. Simpson .	Howrah
"	W. O'B Smith,. ..	Howrah Mission, Bengal
"	A. F. Caemmerer, . .	Nazareth, Tinnevelly, Madras
"	S A. Godfrey, . . .	Combaconum.
"	J. C. Kohlhoff,..	Trichinopoly District
"	G. Y. Heyne, ...	Trichinopoly
"	S. W. Coultrop, .	Negapatam
"	G. D. J. Ondatjee, ..	S P G Missionary, Caltura, Ceylon.
"	J. T. Schleicher, .. .	Cawnpore
"	R. T. Blake, ...	Tallygunge.
"	J. G. Driberg, .	Nerbudda Mission.
"	J. N. Ghose, ...	Howrah.

বিশপস্ কলেজের রেজিস্টারে মধুসূদন

সংস্কৃত শিক্ষক। তখনকার কাগজপত্রে দেখছি গোলাম কাদের ও গোলাম গস উর্দু ও ফারসী পড়াতেন। আর রামচন্দ্র পণ্ডিত পড়াতেন সংস্কৃত ও বাংলা।[৭৪] এ ছাড়া রাজকুমার নামে এক ভদ্রলোকও বাংলা পড়াতেন। এই শিক্ষকদলটি মধুসূদনের কাল পর্যন্ত টিকে ছিলেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে কুমাবস্বামীর পরিচয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন সিংহলী ও তামিল ভাষার শিক্ষক।

হিন্দু কলেজে সংস্কৃত পড়াবার কোন ব্যবস্থা ছিল না; বাংলা পড়ানো হোত। বিশপস্ কলেজে সংস্কৃত পড়ানো হোত।

জীবনীকারদের মতে মধু সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। এ ছাড়া এখানে ভর্তি হয়ে মধু গ্রীক ভাষা শেখার সুযোগ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-অর্জিত ল্যাটিন জ্ঞান ঝালিয়ে নিতে পারলেন।

মোটকথা বিশপস্ কলেজে ভালোরকম লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল।

ছিল না কেবল একটি ব্যবস্থা। সেটা হোল শাসিতদের সম্মান, কৃষ্ণকায়দের মর্যাদা। নতুন বর্ণকৌলীন্যবোধ দেখা দিয়েছিল। মিশনারী পরিচালিত কলেজ; তবু সাদা-কালোর ভেদ ছিল অত্যন্ত প্রকট; ঈশ্বর সকলের সঙ্গে প্রেম করতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরের পুরোহিতেরা পারেন না।

বিশপস্ কলেজে ছাত্রসংখ্যা খুব বেশি ছিল না; আমরা বিশপস্ কলেজের একটি রেজিস্ট্রি পেয়েছি; তাতে দেখছি মাত্র এগারো জন ছাত্র। সম্ভবত ছাত্রসংখ্যা এই রকমই আগাগোড়া ছিল; কারণ ১৮৫৫ সনের একটি বিবরণী থেকে জানছি যে, ঐ সময়ে মাত্র বারোজন ছাত্র লেখাপড়া করতেন।[৭৫] মধুসূদনের ছাত্রজীবনের শেষ বৎসরের একটি রিপোর্টে দেখছি, তখন ছাত্র-সংখ্যা এগার। প্রিন্সিপ্যাল হলেন জর্জ আনডি হুইদার্স। সিনিয়ার অধ্যাপক ছিলেন রেভারেণ্ড এ. ডবলু. স্ট্রীট, জুনিয়র অধ্যাপক ছিলেন রেভারেণ্ড জি. এফ. আর. উইগুম্যান, ও রেভারেণ্ড গোপালচন্দ্র মিত্র।

বারো জন ছাত্র হল এইরূপ:—জ্যাকসন ফর্কহিল স্কলারসিপ—কালীনাথ নন্দী; লর্ড পাওয়ার্স কোর্টস স্কলারসিপ—আর. সি. ওয়াকার। মিড স্কলারসিপ—শ্রীনাথ বসু। এস. পি. জি. ছাত্র—জোওয়া জেরেমিয়া, ও এস. আর. দাস। সিংহল ছাত্র—ডবল্যু. এইচ. গোমেস, এইচ. মুথ্থুকৃষ্ণ, এইচ. ডি. সারন, জে. আর. অস্তংজী।

সাধারণ বা স্বনির্ভর ছাত্র—এম. দত্ত, এ. ডায়াস।

এই স্বল্পসংখ্যক ছাত্র নিয়ে এই প্রকার ব্যয়সাপেক্ষ প্রতিষ্ঠান চালাবার সার্থকতা কি, এই রকম প্রশ্ন উঠেছিল। মধুসূদন এই কলেজে কৃষ্ণমোহনের কাছে সংস্কৃত পড়েছেন, এ খবর ঠিক নয়। কৃষ্ণমোহন ১৮৫২ সনে মার্চ মাসে বিশপস্ কলেজে চাকরী পান।

মধু চিরকালই পড়ুয়া ; বন্ধুরা বলতেন গ্রন্থকীট। এখানে এসে লেখাপড়ার প্রচুর সুযোগ পেলেন। মূর-বাইরনের বিকল্প সেক্সপীয়র পড়েছেন। এবার তার পাল্‌টা সাহিত্য পড়ার সুযোগ পেলেন। ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটল। ধ্রুপদী সাহিত্য পড়াবার মত একাধিক যোগ্য অধ্যাপক ছিলেন। ভবিষ্যতে মহাকাব্য লিখবার জন্য এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষাকে ঘষে-মেজে দেওয়াটা বড় কথা নয়। পথ প্রলম্বিত হলেই তীর্থে পৌঁছায় না, মাঝে মাঝে তাকে বিসর্পিল হতে হয়।

তাই মধুর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল একদা "He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest school of poetry except, perhaps Byron, now and then."

হিন্দু কলেজের পরবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশপস্ কলেজ ; মধুর রসবোধের উন্মেষে একটা ক্রম-পরিণতি যোগাচ্ছে।

অবশ্য এখনই লেখার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে না। খ্রীস্টান হবার পর জুলাই মাসে (১৮৪৩) লিটারারী গ্লীনারে লিখেছেন—King Porus। 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনে' একটি কবিতা বেরিয়েছে। বিশপস্ কলেজে ছাত্র অবস্থায় লেখা একটি মাত্র কবিতার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, সেখ সাদীর অনুসরণে লিখিত এই কবিতায় এশীয় রোমান্টিক আবহাওয়া প্রবল ; এখনও মূরের অনুরাগ বজায় আছে। পরিবর্তন ঘটবে আরও বিলম্বে। শুধু পাঠের মধ্য দিয়ে সাহিত্যবোধ গড়ে উঠতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন গ্রন্থ-বহির্ভূত শিক্ষা, জগতের শিক্ষা। বাস্তব জগৎ সপ্রেম আলিঙ্গনের দ্বারা বা রুষ্ট প্রত্যাখ্যানের দ্বারা মানুষকে শিক্ষিত করে তোলে। নিজেকে নিজের কাছে তুলে ধরে, তার জড়তা তাড়ায়, তাকে জাগিয়ে দেয়।

এই কলেজে তামিল ভাষা শিক্ষা দেওয়া হোত। মধু সে-শিক্ষা গ্রহণ করতেন কিনা তা বলা মুশকিল। জীবনের নির্দেশ ব্যতীত কেউ অতি-প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করে না।

মধুসূদন স্বভাবকবি নন ; তিনি জানতেন স্বভাবে কবিতা নেই।

কবিকেও কবি হতে হয়। উদ্দীপিত কল্পনার উপর একান্ত নির্ভর করে কবিতা রচনা সম্ভব নয়। বিশেষত মধুসূদন যে-শ্রেণীর কবিতা রচনা করবেন, তার জন্য তাঁকে সুসজ্জিত হতে হবে। নবীন যুগের কবিকে বহু-পঠিত কবি হতে হবে। বিশপস্ কলেজে সে যুগের সব দরোজা খোলা ছিল, শুধু গির্জার দরোজা নয়।

খ্রীস্টের সকল সন্তান সমান ; কিন্তু পাদরীদের সব ছাত্র সমান নয়।

বিশপস্ কলেজে পোশাক-পরিচ্ছদে, খাদ্য-পানীয়ে সাদা-কালোর প্রভেদ ছিল। মধুর কাছে আদর্শে আর আচারে পার্থক্য নেই। সবাই জানেন, মধু, দুর্বিনীত। ভাবখানা এই, বিনীত ব্যক্তিরা প্রতিবাদে অক্ষম। আর প্রতিবাদী ব্যক্তিরা সর্বদা দুর্বিনীত। মধু বিশপস্ কলেজে পড়তে-পড়তে অনুভব করলেন কালো চামড়ার ছাত্রেরা নিকৃষ্ট জীব, ভদ্র ব্যক্তি নয়। তাদের জন্য পোশাক পৃথক, খাদ্য-পানীয়ে সমান অধিকার নেই। স্বধর্ম পরিত্যাগের জন্য তারা গ্লানিবোধ করতে পারে আত্মীয় বন্ধুহারা হয়ে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তাদের পরিচয় 'heathen'.

মধু ধর্মত্যাগ করেছিলেন কেন, সে প্রসঙ্গ আমরা বর্ণনা করেছি। এটা পরিষ্কার যে, স্বজাতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য নয়। স্বজাতির অপমানে পুলকবোধ করার জন্যও নয়। ববং অপমান কালো চামড়া ভেদ করে অন্তরকে বিদ্ধ করত। খ্রীস্টীয় বর্ম প্রতিহত করতে পারল না।

একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। "তিনি ছিলেন প্রখর মননশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল কিছুটা উদ্দাম, আপন অনুভূতিতে ও অভিমতে তিনি ছিলেন অতিশয় উগ্র ; তিনি ছিলেন স্বাধীন-চেতা ব্যক্তি ; আপন অধিকার সম্বন্ধে তিনি অতি-সচেতন ছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে এই কারণে বিশপস্ কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর ভীষণ মতদ্বৈধতা হয়েছিল।

তখনকার গির্জার কর্তৃপক্ষরা চাইতেন না, দেশীয়রা ইংরেজদের মত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করুক। ইংরেজদের পোশাক তখন ছিল লম্বা কোট আর বীভার হ্যাট। যে ব্যাপারে তাঁদের কোন এক্তিয়ার নেই, সে ব্যাপারে তাঁরা যদি নাক না গলাতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে সুবিবেচনার কাজ হোত। কিন্তু তাঁরা নাক গলাতেন। এই কারণে তাঁরা দন্তের কাছ

থেকে তীব্র প্রতিরোধ পেয়েছিলেন। তখনকার কলেজী পোশাক ছিল একটি কালো কোট; একটি ব্যাণ্ড আর মাথায় একটা চৌকো টুপি! এই পোশাকের মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল, যাকে ব্রিটিশ বলা যায়। তবু কর্তৃপক্ষ চাইছিলেন যে, তিনি যেন কালো কশাকের পরিবর্তে সাদা কশাক পরেন! দত্ত তাতে বললেন, হয় আমাকে কলেজী পোশাক পরতে দাও, না হলে আমি আমার জাতীয় পোশাক পবব। কিন্তু কলেজী পোশাক তাঁকে পরতে দেওয়া হোল না। তখন দত্ত স্বদেশী পোশাক পরিধান করলেন—সাদা রং-এর রেশমী কাবা, মাথায় রঙিন পাগড়ী, দেখতে উকিলের শামলা মত, তার উপর জড়ানো শালেব রুমাল। বিশপস্ কলেজের ছাত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে এই পোশাকটাকে 'কৌতুক ভূষা' (Fancy Dress) বলে বেশি মনে হচ্ছিল। আমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি নি, আমার সে অধিকারও ছিল না। তবে সিনিয়ার অধ্যাপক এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তাঁর নালিশ ছিল দত্তের এই পোশাকে যত রঙ আছে রামধনুতেও তত রঙ নেই। কর্তারা দত্তের নাম কেটে দিতে চেয়েছিলেন কিনা তা আমি বলতে পারব না—তবে তাঁরা-যে বেশ চটেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই গণ্ডগোলের ফল হোল এই, দত্তকে কর্তারা কলেজের সাধারণ পোশাক পরার অনুমতি দিলেন। দত্ত ঐ পোশাক পরেই কলেজ করতেন। কলেজের বাইরে তাঁর অভ্যাসমত ইংলিশ কোট ও বীভার হ্যাট পরে চলাফেরা করতেন এবং সামাজিক মেলামেশা করতেন।"

ব্রজেন্দ্রবাবু লিখেছেন, "পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন।"[৭৭ক]

কৃষ্ণমোহন ১৮৪১-১৮৪৮ সনে বিশপস্ কলেজে অধ্যাপনা করেন নি। তবে তিনি ঐ কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৭৮] ঐ কলেজের পরিচালনার জন্য যে সিণ্ডিকেট ছিল, কৃষ্ণমোহন ছিলেন তার সহযোগী সদস্য (Associate Syndic). জীবনচরিতের লেখক যে লিখেছেন, "কলেজের অধ্যক্ষ এইরূপ ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁহাকে কলেজ হইতে তাড়িত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবর্তিত্বে মধুসূদন সেবার অব্যাহতি পাইলেন।" (পৃ-১৩৫)। কৃষ্ণমোহন অধ্যাপক না থাকুন, কিন্তু জীবনচরিতের এই মন্তব্য অসত্য নয়। কাজেই যখন তিনি উপদেশ দিলেন "মধুসূদন সম্ভ্রান্ত গৃহের বালক। এরূপ সামান্য কারণে তাঁহাকে কলেজ

হইতে তাড়িত করিলে আর কেহ খ্রীস্টান হইবে না।" সম্ভবত কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর সেই উপদেশের মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণমোহনের এই স্মৃতিকথা বেরিয়েছে যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'জীবন-চরিত' প্রকাশের পর। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে মধুর আর একটি প্রতিবাদ মধু-স্মৃতির গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি হোল মদ্যপান নিয়ে।

মধু 'মদ্যপায়ী' ছিলেন—ছোটবেলা থেকেই ছিলেন। রোজ রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তিনি এক গ্লাস মদ খেতেন।

মধু মদ্যপানে সাম্য-ভাব চেয়েছিলেন। বিশপস্ কলেজে একই টেবিলে বসে 'ইউরোপীয়' এবং দেশীয়রা খানাপিনা করত। নৈশ ভোজে ছাত্রদের ভাগে মদের বরাদ্দ ছিল। একবার ইউরোপীয় ছাত্রদের পরিবেশনে মদ ফুরিয়ে গেল। নিত্য মদ্যপানে অভ্যস্ত মধুসূদন তখন ক্রোধে টেবিলের উপর কাচের গ্লাস ভাঙলেন। ভীত সন্ত্রস্ত স্টুয়ার্ড ছুটল অধ্যক্ষের ঘরে। মধুর আচরণ নিয়ে অভিযোগ উঠল। খুব হৈ-চৈ হোল। কাচের গ্লাস ভাঙার কৃতিত্বের জন্যও মধু মদ পেলেন না। বিশপস্ কলেজে ছাত্রদের নৈশ ভোজে মদ পরিবেশন-রীতি উঠে গেল। এই তথ্যে কয়েকটি ভুল আছে।

বিশপস্ কলেজে ছাত্রদের মধ্যে কেউ ইউরোপীয় ছিলেন না, সবাই ভারতীয়, দু'জন ছিলেন ইস্ট-ইণ্ডিয়ান—ওয়াকার ও জেরিমিয়া। এই বিদ্যালয় পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—টেনিভেলী, কুম্ভকোনম, ত্রিচিনোপল্লী, নাগপত্তনম ও সিংহলের গির্জার মিশনারী সরবরাহ করা।'[৭]

সংবাদটির সত্যতা তাই সন্দেহজনক। মধুর পান-দোষ নিয়ে সে যুগে (এই যুগেও) সত্য-মিথ্যা বহু গল্প প্রচলিত আছে। এমন আহাম্মকী কথাও তো শোনা গেছে যে, নিমচাঁদ মধুকে আদর্শ করেই লেখা। উল্লিখিত গল্পটি অসত্য হলেও মধুর মেজাজের খবর মন্দ দেয় নি। তাঁর 'মাতলামি'তেও স্বদেশীয়ানা ছিল।

মধুর কাব্য-চর্চার মাধ্যম মাতৃভাষা ছিল না; তবু মধুর এ বোধ ছিল কোন্‌টা বাংলা আর কোন্‌টা বাংলা নয়। বাল্য বয়সে মায়ের কাছে বসে কৃত্তিবাস পড়েছেন, কাশীরাম পড়েছেন; তাঁকে 'প্রতাপাদিত্যচরিত' পড়তে হয় নি। বিশপস্ কলেজে পঠদ্দশায় একদিন কলেজের উপাসনা-কক্ষে জনৈক পাদরী সাহেবের মুখে প্রার্থনাস্তিক বাংলা ভাষণ শুনে তিনি হেসে ফেলেছিলেন। খ্রীস্ট-উপদেশের প্রতি অশ্রদ্ধা জানাতে তিনি হাসেন নি।

"অদ্য আমরা তাম্বু ফেলিলাম, কল্য উঠাইলাম এবং অন্যস্থানে তাম্বু গাড়িলাম।" জগতের অনিত্যতা বুঝাতে মাতৃভাষার নিত্য-স্বরূপের প্রতি এই অত্যাচার মধুসূদনের হাসির কারণ হয়েছিল। মধু খ্রীস্টান হয়েছিলেন, অথচ খ্রীস্টানী বাংলায় কেন, ইংরেজীতেও কোন খ্রীস্টীয় গ্রন্থ লেখেন নি। *অথচ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দীক্ষিত হওয়ার ক'মাসের মধ্যেই ইংরেজিতে* লিখলেন—A Lecture on the Harmony between History and Prophecy—Baboo G. M. Tagore, 1852, October.

যে পারে, সে তিন-চার মাসেই পারে। বন্ধু গৌরদাসের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখতেন ; গৌরদাস বন্ধুকে চিঠি লিখতেন একটু অভিনবভাবে—To Christian M. S. Dutt from G. D. B.—মধু প্রথমবার জানালেন—'I do not like it'. তবু গৌরদাস ঐরূপ সম্বোধনে চিঠি লিখলেন, তখন মধু তাঁকে স্পস্ট করে জানালেন—"I do not like 'My dear Christian M.' etc."

কিন্তু গৌরদাস যখন তৃতীয়বার একইভাবে চিঠি লিখলেন, তখন চিঠিতে তাঁকে কিভাবে সম্বোধন করতে হবে তা শিখিয়ে দিলেন।

"By the bye, you ought to address me in the following manner—M. Dutt Esqr. or Baboo (if you please), Bishop's College and nothing more."

ধর্মান্তরের অর্থ জাত্যন্তর নয়।

মধু কখনও খ্রীস্টান মধু নন, মধু সর্বদা মধুসূদন।

বিশপস্ কলেজের শেষ দিকে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ কমে এল। তার জন্য বন্ধুদের সবটুকু দোষ দেওয়া যায় না। একটি চিঠিতে নিজে লিখছেন, তোমার চিঠির জবাব দিতে পারি নি ; কারণ আমার এক মুহূর্ত অবসর নেই।

আর এক চিঠিতে গ্রীষ্মাবকাশের পর লিখছেন, গোটা ছুটিটা কোথা দিয়ে চলে গেল, আমি তোমার সঙ্গে একটি দিন দেখা করতে পারি নি।

তখনও কোনরূপ 'চার্মিং' সংসর্গ তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। তবে কি করে সময় কেটে গেল? "He was a book-worm, and passed his time in reading and writing only." সময় কাটছে বই পড়ে, বই লিখে নয়। পড়ছেন বেশি, লিখছেন এখন কম। মাদ্রাজের জীবনেও একই

রকম সাধনা ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ কমে যাচ্ছিল—বন্ধুরাও কলেজের লেখাপড়ায় ব্যস্ত। কেউ কেউ ১৮৪৮ সন পর্যন্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র।[৮০]

তা ছাড়া কলকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি তরুণদের মনে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। সেখানেও বন্ধুরা জর্জ টমসনের বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছেন। রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা তখন খ্যাতি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা দ্বারকানাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ডাঃ গুডিবের সাহচর্যে বিলেত চলল (২১-এ নভেম্বর, ১৮৪৪) উচ্চতর শিক্ষার জন্য। রাধাকান্ত দেব পর্যন্ত ওদের বিলেত যাত্রার চাঁদার খাতায় সই দিয়েছেন। কাগজে-কাগজে কত লেখালেখি—'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তে বিলেতযাত্রীদের তারিফ করে লেখা হোল—"instead of going on pilgrimage to Juggurnath, or of offering funeral cake at Gaya, or visiting the sacred monkeys and shrines of Benares."[৮১]

তাঁরা চললেন, আর মধু পড়ে থাকলেন শিবপুরে।

বন্ধুরা তখনও হিন্দু কলেজে বিদ্যাভ্যাসে রত। মধুসূদনের গৃহে অশান্তির কালোমেঘ দেখা দিয়েছে। বাবার আর্থিক ভিত ন'ড়ে উঠেছে। কারণ সদর দেওয়ানী আদালতে ফারসী আর সওয়ালের একমাত্র ভাষা থাকছে না। ১৮৪৫ সনে ইংরেজ ব্যারিস্টার মিঃ সি· আর· প্রিন্সেপকে সদর দেওয়ানী আদালতে ইংরেজী সওয়াল করার অধিকার দেওয়া হোক, এই দাবি উঠেছিল। দাবি তুলেছিলেন জনৈক বাঙ্গালী ফরিয়াদী।[৮২]

অকস্মাৎ একদিন আদালতের ভাষা সত্যিসত্যিই বদলে গেল। রাজনারায়ণ দত্তের আয় হ্রাস পেল—পশার আর তেমন জমজমাট থাকছে না।

টাকা-পয়সা নিয়ে মধুর সঙ্গে বচসা হয়; রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে টাকা গুণে খরচ করে না। এখন সেখানে সত্যিই টান পড়ল। গুণে-গুণে খরচ করাটা দরকার হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আর এক দুশ্চিন্তা। রাজ-নারায়ণ পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করছেন—সে-যুগের পক্ষে দারুণ বৃদ্ধ তিনি। পত্নী জাহ্নবী দেবী সন্তান-ধারণের বয়স-সীমা পার হয়ে গেছেন। জীবিত একমাত্র সন্তান খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করেছে। হিন্দু পরিবারে হিন্দু সংস্কারে পুত্র তো পিণ্ডদানের জন্য। অতএব এই পাপ সংসার থেকে মুক্তির বিকল্প কোন উপায় নেই। গুরু-পুরোহিত জ্ঞাতি-আত্মীয়স্বজন রাজনারায়ণ দত্তকে পরামর্শ দিলেন, পুনর্বার বিবাহ করো।

মধু অবাধ্য সন্তান; (সত্যিই তো তিনি আর বাধ্য কোথায়!) মধু বিধর্মী। (তাঁর তো কোন ধর্ম নেই!) কাজেই প্রৌঢ় রাজনারায়ণ মধুর বিশপস্ কলেজের খরচপত্র পাঠাতে টালবাহানা করতে লাগলেন।

তারপর একদিন সাগরদাঁড়ি যাচ্ছি বলে তিনি টোপর মাথায় দিয়ে সাগরদাঁড়ির পার্শ্ববর্তী গ্রাম সাতবেড়ে গিয়ে হাজির হলেন। পরমাসুন্দরী শিবসুন্দরীকে বিবাহ করে আমতা-আমতা করে জাহ্নবী দেবীকে লিখলেন—"তোমার জন্য একটি সেবিকা আনা হইয়াছে। কাল তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে হইবে।" সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটা কোন অভিনব ঘটনা নয়। অভিনব হোল, আমতা-আমতা করে গৃহিণীকে চিঠি লেখা। এইটুকু চক্ষুলজ্জা আজ রাজনারায়ণদের হয়েছে।

নানা কান ঘুরে এ খবর মধুর কানে এসে পৌঁছাল। একে অর্থের টানাটানি, তার উপর এই তো পিতৃ-দত্ত উপহার! পিতৃগৃহ তাঁর নিকট অরণ্যবৎ মনে হোল।

ছোট লাটের সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের সময় বার্ড সাহেব কত উৎসাহ দিয়েছিলেন। আজ একটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ম প্রার্থনায় বললেন, অপেক্ষা কর।

অথচ ১৮৪৫ সনে আগস্ট মাসে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী পেয়েছেন, রাজশাহীতে তিনি এখন হাকিমী করছেন।[৮৩] রামবাগানের দত্ত আর সাগরদাঁড়ির দত্ত বাংলার লাট সাহেবের চোখে কি এক নয়?

বাবার কীর্তি শুনলেন—মায়ের কথা মনে পড়ল। একবার ভাবলেন ছুটে যাই মায়ের কাছে। ঐ বেদনার অংশ ভাগ করে নিই। পরক্ষণেই ভাবলেন—কি হবে গিয়ে। কি হবে শাস্ত্র ও সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করে? কে শুনবে তাঁর কথা? গুরু-পুরোহিত জ্ঞাতি-কুটুম্ব ঢের বেশি শক্তিশালী। হিন্দুর যে পরকাল আছে! আমি বিধর্মী পুত্র, পিণ্ডদানের অধিকারী নই।

ভালবাসা ও কর্তব্য পরাজিত হোল তথাকথিত ধর্ম ও দেশাচারের কাছে। ইন্দ্রজিৎ-ই কি একা পরাজিত হয়েছে? এই তো বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক জীবন! বহুপত্নীকতা পাপ নয়, ধর্মান্তর পাপ। বাল্যবন্ধু গণেশচন্দ্র-রঙ্গলালদের মায়ের দুর্দশা দেখেছেন। হুগলীর কুলীনব্রাহ্মণ তাঁর প্রথমা পত্নীকে ভ্রাতৃগৃহে ফেলে রেখে অন্য পত্নীর গৃহ-আলোকিত করে আছেন! সেই মূঢ় শাস্ত্রের অনুসরণ আজ নিজের গৃহে দেখতে হবে!

তস্করকে আজ কে পথ দেখাল?

"The people of this country do not know the pleasure of domestic life." এদেশের মানুষ গার্হস্থ্য-জীবনের সুখ কি তা জানে না।

মধুসূদন পালালেন—আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব কেউ জানল না। বিমূঢ়া বিষণ্ণা জননী জাহ্নবী দেবীও না।

যখন জানবেন, তখন পুত্র মধুসূদন সমুদ্রবক্ষে! কবতক্ষ নদ তখন কোথায়!

পাদটীকা

১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত— যোগীন্দ্রনাথ বসু। পৃষ্ঠা-২৫
   মধুস্মৃতি, পৃষ্ঠা-১২

১ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাল্যজীবনী—ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৩

২. Bengal Directory, 1836.

৩. The Calcutta Christian Observer, 1847, February, pages 110-112.

৪. The Missionary Herald, November, 1843.

৫. Bengal Directory, 1824.

৬. Bengal Directory, 1843.

৭. Bengal Directory, 1827.

৭ক. Bengal Directory, 1823.

৮. সাহিত্যসাধক চরিতমালা—মধুসূদন দত্ত—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা-৭-১০

৮ক. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ— শিবনাথ শাস্ত্রী। নিউ এজ সংস্করণ, পৃঃ ৬৩।

৯. Report of the General Committee of the Public Instruction for the Bengal Presidency etc., For 1836; Appendix No. 10, Hindoo College, p. 167.

১০. Awakening of Bengal—Edited by Prof. Gautam Chatterjea.

১১. Unpublished Records of the Hindoo College—1848.

১২. Calcutta Courier, February 10, 1840.

১৩. Friend of India, January 2, 1873.

১৪. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট। পৃঃ ৬৫৬

১৫. জীবন-চরিত— ঐ। পৃঃ ৬৬৬

১৬. ঐ, ঐ। পৃঃ ৬৪১

১৭. ঐ, ঐ। পৃঃ ৬৬৬

১৮. ঐ. ঐ। পৃঃ ৬৫৯

১৯. ঐ, ঐ। পৃঃ ৬৬০

২০. ঐ, ঐ। পৃঃ ৬৫৫

২১. মধু-স্মৃতি—সোম। পৃঃ ৬১২-৬১৫

২২. নবজীবন—পৌষ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ—মধুসূদন দত্ত।

২৩. ঐ

২৫. Unpublished Records of the Hindoo College—1848. Thirty-third Annual Report.

২৬. মধু স্মৃতি—পৃঃ ৬২০।

২৭. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট।

২৮, ঐ।

২৯. ঐ।

৩০. ঐ।

৩১. ঐ।

৩২. কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃঃ ৯৬।

৩৩. বঙ্কুবিহারী দত্তের স্মৃতি-চারণ।

৩৪. Literary Gleaner—Vol, II, No. 3.

৩৫. Bengal Herald, September, 1843.

৩৬. নবজীবন, পৌষ, ১২৯৪।

৩৭. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট।

৩৮. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট। বঙ্কুবিহারী দত্ত।

৩৮ক. সোমপ্রকাশ—১২৬৯, ৭ জ্যৈষ্ঠ।

৩৯. আমার দেখা লোক—মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯-১০। ভূদেব পাবলিশিং হাউস।

৪০. ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলী—বসুমতী সংস্করণ, দুর্গাপূজা, পৃঃ ৩২৮।

৪০ক. Friend of India—May 29, 1845.

৪০খ. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট।

৪১. Bengal District Gazetteers Vol. 26. Midnapore. L. S. S. O'. Malley, 1911. pages 225-226.

৪২. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট।

৪৩. ঐ।

৪৪. ঐ।

৪৫. সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৩, ১লা বৈশাখ।

৪৬. John Bull—17 September, 1830.

৪৭. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

৪৮. ঐ।

৪৯. ঐ।

৫০. ঐ।

৫১. Calcutta Courier, January 13, 1840.

৫২. Bengal Hurkaru, November 5, 1842.

৫৩. কৃষ্ণমোহন—দুর্গাদাস লাহিড়ী। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী—১২৯২ বঙ্গাব্দ। এই গ্রন্থের তথ্যাদি কৃষ্ণমোহন-কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী হুইলার সরবরাহ করেছেন। এই গ্রন্থ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়; ঐ বৎসরই কৃষ্ণমোহনের মৃত্যু ঘটে।

৫৪. ঐ।

৫৫. Friend of India, October 18, 1856.

৫৬ক. Friend of India, 17 July, 1851.

৫৭. ঐ ঐ

৫৮. Friend of India, 22 April, 1852.

৫৯. Calcutta Christian Observer, January, 1853.

৬০. মধু-স্মৃতি—৪র্থ সংস্করণ। পৃঃ ৪৫।

৬১. ঐ, পৃঃ ৪৫।

৬২. Christianity in India—George Smith, Edinburgh, 1864, page 20.

৬৩. জীবন-চরিত—পৃঃ ১০৭।

৬৪. Derozio—Edwards. হরমোহন চ্যাটার্জির সাক্ষ্য উদ্ধৃত।

৬৫. Calcutta Christian Observer, April, 1850.

৬৬. The Church Magazine –18 February, 1843. Printed and Published by J. A. Gibbsons at the Asiatic Press, No. 72 Creek Row, Dhurumtollah. Sold by Thacker & Co., St. Andrews Library, Rs. 15 per annum.

৬৭. Friend of India, 6 & 12 August, 1841.

৬৮. The Christian Advocate, 30 December, 1843.

৬৯. The Calcutta Christian Observer, December 1854.

৭০. Unpublished Records of the Hindoo College—Receipts and Expenditure. 1841-1843.

৭০ক. Unpublished Records of the Hindoo College, Thirty-third year Report 1848. The Calcutta Christian Observer, August, 1848.

৭১. Friend of India, 20 April, 1843.

৭২. The Christian Intelligencer, April, 1855.

৭৩. The Christian Herald, April, 1843.

৭৪. Bengal Directory, 1836.

৭৭ক. মধুসূদন দত্ত—সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১৯।

৭৮. Bengal Directory, 1843-1848.

৭৯. ঐ ঐ

৮০. Unpublished Records of the Hindoo College, 1846-1848.

৮১. Friend of India, 6 March, 1845.

৮২. Englishman, 12 April, 1845.

৮৩. ঐ, 14 August, 1845.

॥ ১ ॥

"যখন কলকাতা ত্যাগ করি, তখন অশান্তি ও উৎকণ্ঠায় আমি প্রায় অর্ধোন্মাদ হয়ে পড়েছিলাম। আমার অন্তরের অভিপ্রায় দুই-তিনজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানত না।"

বিশপস্ কলেজে বৎসর দুই যাপনের পর বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ শিথিল হয়ে গেল ; চিঠিপত্র কম পাচ্ছিলেন, দেখাসাক্ষাৎ আরও কম হোত। বন্ধুরা নানাজন নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ নতুন-পাওয়া চাকরী নিয়ে ব্যস্ত ; কেউ চাকরীর খোঁজে ব্যস্ত ; কেউ হিন্দু কলেজে তখনও লেখাপড়ায় ব্যস্ত— যেমন গৌরদাস, জগদীশনাথ ও রাজনারায়ণ।[১] রাজনারায়ণের সঙ্গে পরিচয় হয় নি, বাক্যালাপ ছিল না।

কলকাতায় তাঁর কোন চাকরীবাকরী হোল না ; ছোটলাট তাঁকে সবুর করতে বললেন। তখন কি অপেক্ষা করার সময়? বাবা মাসোহারা বন্ধ করে দিয়েছেন ; বইপত্র বেচে হাতখরচ চালাতে হচ্ছে।

রাজনারায়ণ দত্ত আর টাকাপয়সা দেবেন না ; মধুসূদনেরও আর চাইবার প্রবৃত্তি নেই। যে কুকর্ম করেছেন! মায়ের কাছে চাইবার মুখও নেই। তিনিই যেন অপরাধী! সবাই ভাবছে মায়ের দুর্গতির জন্য তাঁর দায়িত্ব সর্বাধিক। অতএব এক্ষেত্রে দেশত্যাগই শ্রেয়স্কর। অকূলে যদি কূল পাওয়া যায়!

মধু কলকাতার কবি। কিন্তু কলকাতার কবি হওয়ার জন্য কলকাতা ত্যাগ করতে হবে। নতুন কলকাতা বিশ্ব-ভাবধারায় স্নাত। বিলেত যাওয়া না হোল ; প্রদেশের গণ্ডী তো ভাঙ্গা হোল। জাতের গণ্ডী ভেঙ্গেছেন, এবার সমাজের গণ্ডী ভাঙ্গলেন। জঙ্গমতা চঞ্চলতা আধুনিক জীবনের অঙ্গ।

বিশপস্ কলেজের রেজেস্ট্রিতে সিংহলী ছাত্র অভিধায় চারজন ছাত্রের নাম পাই—

W. H. Gomes.
H. Mootu Kistna.
H. Dm. Saram.
J. R. Ontdatjee.

জেনারেল বা 'লে' স্টুডেন্ট হিসাবে মিঃ এ. দিয়াসকে পাচ্ছি। দিয়াস ধর্মান্তরিত কঙ্কণী ব্রাহ্মণ সন্তান, তিনি গোয়ার অধিবাসী। তাঁকে ঠিক দক্ষিণের অধিবাসী বলা চলে না। চার জনের মধ্যে অন্তৎজী ছিলেন সিংহলের (লঙ্কা) অধিবাসী। বাকী সবাই দক্ষিণ ভারতের। সম্ভবত তখন তামিল ভাষার ব্যাপক প্রচলনের জন্য সবাইকে সিংহলী বলে অভিহিত করা হয়েছিল।[২]

এঁদের সঙ্গেই মধুসূদন অকূলে ভাসলেন। ১৮৪৭ সনে ২৪-এ ডিসেম্বর তারিখে তিনি মাদ্রাজ বন্দরে এসে উপনীত হলেন। তিনি চারদিন জাহাজে ছিলেন; সাধারণত সে যুগে জাহাজে সৈন্যবিভাগের লোকজনই বেশি যাতায়াত করত। 'নেটিব'দের জন্য সংরক্ষিত থাকত জাহাজের ডেক।[২ক] মধুও ঐ ডেকে আশ্রয় নিয়েই মাদ্রাজে এসে হাজির হলেন। সহায়-সম্পদহীন অবস্থায় মাদ্রাজে এলেন। বন্ধুবান্ধব তাঁর কোথায় এখানে?

এসে উঠলেন 'ব্ল্যাক টাউনে', অধুনা যার নাম জর্জ টাউন। বন্ধুরা ব্ল্যাক টাউন ডিস্ট্রীক্ট চার্চের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ব্ল্যাক টাউনে তখন দু'জন চ্যাপলিন ছিলেন—চার্লস ডি. গিবসন এম. এ., ও জেমস ভি. বুল বি. এ.[৩]। এঁদের সঙ্গে পরিচিতির সুবাদে একটা আশ্রয় জুটল। কিন্তু মাদ্রাজের মাটিতে পা দেবার কয়েক দিন পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন; অসুখ মানে সাংঘাতিক অসুখ—বসন্ত। ব্ল্যাক টাউনের মেডিক্যাল অফিসার মিঃ ডেভিডসনের চিকিৎসায় এবং বন্ধুবান্ধবদের শুশ্রূষায় তিনি ধীরে ধীরে নিরাময় হয়ে উঠলেন।[৪]

মাদ্রাজে তখন মিশনারীদের বেশ তৎপরতা। ইতিপূর্বেই পাড়ায় পাড়ায় গির্জা তৈরি হয়ে গেছে—জর্ডান নদীর জল ছিটানোর কাজও বেশ চলেছে। যে রাস্তাটির উপর ব্ল্যাক টাউন ডিস্ট্রীক্ট চার্চ অবস্থিত, সে রাস্তার নাম হোল পপ্‌হাম ব্রডওয়ে। ঐ একটিই ছিল তখন শোভন-সুন্দর রাজপথ ব্ল্যাক টাউনে। ১৮০৪ সনে প্রথম গির্জাটি স্থাপিত হয়েছে। ১৮২৪ সনে ব্ল্যাক টাউনে আরও একটি গির্জা স্থাপিত হয়, নাম চার্চ মিশন চ্যাপেল। ১৮২৬ সনে পাশের পল্লী ভেপেরীতে সেন্ট ম্যাথিয়াস গির্জা গড়ে ওঠে। পানথিয়ন রোড ও মাউন্ট রোডে ১৮৪২ সনে গির্জা তৈরি হয়েছে।[৫]

মাদ্রাজে ইউরোপীয়দের পল্লী আর নেটিবদের পল্লী পৃথক ছিল। এক সময় ব্ল্যাক টাউন ছিল পুরো নেটিবদের আবাসস্থল।[৫ক] প্রাচীর দিয়ে দুই পৃথিবী

আলাদা করা ছিল। কিন্তু ১৭৯২ সনে ঐ প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা হোল। এর মধ্যে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বেড়েছে, আবার বর্ণসংকরদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। তারা ব্ল্যাক টাউন, রয়াপুরম, ভেপেরীতে ছড়িয়ে পড়ল। বর্ণসংকর বা ইউরেশীয়দের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

মাদ্রাজেই ইউরোপীয়রা প্রথম উপনিবেশ গড়ে; কাজেই মাদ্রাজের উপর তাদের একটা বিশেষ মমতা আছে। সামরিক বা অ-সামরিক কাজে নিযুক্ত কোন ইংরেজ হঠাৎ মারা গেলে তাঁদের আত্মীয় পরিজন, বিশেষ করে অপোগণ্ডগুলি পাথারে পড়ত।

সামরিক বিভাগে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের অনাথ শিশুসন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৭৭৮ সনে মিলিটারী মেল অরফ্যান এ্যাসাইলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিমেল অরফ্যান এ্যাসাইলামও একই বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে একটি এগমোরে, অপরটি পুনামাল্লে রোডে। অ-সামরিক ইংরেজ মারা গেলে তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের দেখাশোনার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হোল। মিশনারীরা দেখেছিলেন, বাবা মা-মারা গেলে তাদের শিশু-সন্তানগুলি শুধু যে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে, তা নয়; হীন জীবিকা গ্রহণে তারা বাধ্য হয়। অনেকে পাপ পথ বেছে নেয় নিছক দেহ ধারণের জন্যই। ব্রিটিশ প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম-যাজকেরা ১৮০৭ সনে ব্ল্যাক টাউন চার্চের সঙ্গে দু'টি অনাথ আশ্রম স্থাপন করলেন—একটি বালকদের জন্য, অপরটি মেয়েদের জন্য। বালক বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন মিঃ প্রাইস। মহিলা অধ্যক্ষা নিযুক্ত ছিলেন বালিকা বিভাগের জন্য। বালক বিভাগের সঙ্গে একটি স্কুল যুক্ত ছিল। এবং এই প্রতিষ্ঠানে ইউরেশীয় বালকদের প্রবেশাধিকার ছিল না—এই রকম একটা খবর মাদ্রাজ একজামিনারে বেরিয়েছিল।[৩] মধুর চিঠিতে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। এটি যে মূলত একটা ইউরেশীয় প্রতিষ্ঠান, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ Eurasian পত্রিকায় এই মর্মে একটি সংবাদ ছিল—"The school is essentially an East Indian Institution." Eurasian, April, 29, 1850। প্রতিষ্ঠানটি ইউরেশীয়, না ইউরোপীয় এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের এত মাথা ব্যথার অবশ্য একটা সঙ্গত কারণ আছে। এই প্রতিষ্ঠানে মধু যেমন চাকরী করতেন, এদের বালিকা বিভাগে তেমনি রেবেকা ছিলেন অধিবাসিনী।

ব্ল্যাক টাউনের এই অনাথ আশ্রম দু'টি ও বিশপ করিস গ্রামার স্কুল—

তিনটি প্রতিষ্ঠানই ইংলণ্ডীয় চার্চের (Anglican Church) অধীন ছিল।[৭] করিস গ্রামার স্কুল পপহ্যাম ব্রডওয়েতে অবস্থিত ছিল। করিস গ্রামার স্কুল শুধু পুথিগত বিদ্যা বিতরণ করত না। সেখানে কিছু হাতের কাজ শেখানো হোত। অনুরূপ ব্যবস্থা যাতে 'মেল অরফ্যান এ্যাসাইলামে' গ্রহণ করা হয়, তার জন্য উদ্যোগ হোল। ১৮২৯ সনে মাদ্রাজে ফিলানথ্রপিক এসোসিয়েশন (Madras Philanthropic Association) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ১৮৪৬ সনে এই প্রতিষ্ঠানটি 'মেল অরফ্যান এ্যাসাইলামে'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। যুক্ত হওয়ার পূর্বে একটি বিশেষ তহবিল (fund) সৃষ্টি করে অনাথ আশ্রমের কার্যাধ্যক্ষের (superintendent) হাতে সেই তহবিল তুলে দেওয়া হোল।

মেয়েদের জন্য যে আলাদা বিভাগ ছিল, তার সঙ্গে পাঠশালা যুক্ত ছিল না। কিন্তু অচিরেই একটা সুযোগ জুটে গেল। ১৮৩৫ সনে পুনামাল্লেতে মহিলা সঙ্ঘ নামে (Ladies Institution) একটি সমিতি গঠিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল "Sound religious education" প্রচার করা। ব্ল্যাক টাউনের বালিকাদের শিক্ষার প্রয়োজনে তারা একটা শাখা খুললেন শুধু বহিরাগত ছাত্রীদের (Day scholar) জন্য।

ইংল্যাণ্ড থেকে আগতা জনৈকা ভদ্রমহিলা (A lady from England) স্কুলটি পরিচালনা করতেন।[৭ক] ছাত্রীদের মাথাপিছু বেতন ছিল মাসে তিন টাকা। এঁরা বিশাখাপত্তনমেও একটি শাখা খুলেছিলেন।

মধু মাদ্রাজে এসে পৌঁছুবার সময় অনাথ আশ্রম দু'টির সম্পাদক ছিলেন মিঃ সি· কিনেট (C. Kennet)। তাঁর এক রিপোর্ট থেকে জানতে পারি যে, তাঁরা মাত্র ৫০০ টাকা বৎসরে সরকারী অনুদান পেতেন। সুতরাং শিক্ষকদের বেতন ছিল অতি সামান্য।[৮]

মধুসূদন ব্ল্যাক টাউনে থাকতেন। বসন্ত ব্যাধি সেরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে চাকরী পান নি। কারণ, সংক্রামক ব্যাধি। মনে হয় ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি বা মার্চ মাসে তিনি ঐ স্কুলে চাকরী পান। মধুসূদন ঠাট্টা করে বলেছেন—'usher'. 'Usher'—শব্দের অর্থ যেমন সহকারী শিক্ষক, তেমনি নকীব। মধুসূদন কোন্ অর্থটি অধিকতর গ্রাহ্য মনে করতেন? 'শিক্ষক' অপেক্ষা 'নকীব' অর্থটি বেশী প্রচলিত। অপ্রচলিত অর্থ গ্রহণ করার অর্থ প্রচলিত অর্থকে অগ্রাহ্য করা নয়।

এই সামান্য চাকরী তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করল, যদিও রাজনারায়ণ দত্তের পুত্রের মত নয়। বাস করছেন পপহ্যাম ব্রডওয়েতে। স্কুলে যাতায়াতের পথে পড়ে মাদ্রাজ সার্কুলেটার পত্রিকার কার্যালয়। মিঃ ফেগুারলিগুার হলেন পত্রিকার প্রকাশক, আর মিঃ এইচ. ফার্টনিজ (H. Fartnig) হলেন পত্রিকার মালিক। কাগজটির সপ্তাহে তিনটি সংখ্যা বের হোত।

মধু স্কুলে যাওয়াব পথে পত্রিকার কার্যালয়ের সম্মুখ দিয়ে যেতেন। বিনা আমন্ত্রণে সেখানে একদিন ঢুকে পড়েন তিনি। সম্পাদকের হাতে দুই-একটি কবিতা দিয়ে এলেন, যদি ছাপা হয়।

তখন মধু স্বনামে লিখছেন না, লিখছেন ছদ্মনামে। Timothy Penpoem নামটি তিনি কেন গ্রহণ করলেন জানি না। মধুর বহু আচরণ এই রকম রহস্যময়। কলকাতায় ফিরে আসার সময় তিনি আর একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন, মিঃ হোল্ট।

মাদ্রাজে খ্রীস্টীয় আচার্যদের বেশ প্রভাব। স্বভাবত মনে হতে পারে সাধু পল (Saint Paul)-এর প্রিয় শিষ্য টিমথির নাম গ্রহণ করেছেন ভক্ত খ্রীস্টান মধু। টিমথি অন্য অর্থও জ্ঞাপন করে। টিমথি একটি তৃণবিশেষ, যে তৃণটিকে বপন করা হয়েছে পরদেশে। মধুর ছদ্মনাম গ্রহণের পিছনে প্রবাস-জীবনের গ্লানি লুকিয়ে থাকা অসম্ভব কি? বিশেষ করে যখন কবিতাগুলির শীর্ষে লেখা থাকত—Disjecta Membra Poetae. ল্যাটিন কবি হোরেসের ব্যঙ্গাবলী (Satires I. IV. 62) থেকে এই পঙ্‌ক্তিটি উৎকলিত। এর অর্থ, এ তো কবিতা নয়, এ হোল বিভাজিত কবির বিচ্ছিন্ন দেহাংশ। কলকাতা ছেড়ে, বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে, জননী জাহ্নবী দেবীকে ছেড়ে তিনি যে বিভাজিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী, এ বিষয়ে সন্দেহ কি!

আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁর চারিটি কবিতা প্রকাশিত হোল। একজন দেশীয় খ্রীস্টানের পক্ষে এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। মাদ্রাজের লেখক-মহলেও একটা সাড়া পড়ে গেল।

কবিতাগুলি কবিতা বটে, কিন্তু সবটাই কল্পলোকের নয়। কবির ব্যক্তি-জীবনের ইতিহাস এর মধ্যে প্রবেশ করছে। ফলে কবিতাগুলির চরিত্র পূর্বতন কবিতা থেকে বদলে যাচ্ছে। হিন্দু কলেজে ছাত্রজীবনে যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না, আত্মম্ভরিতা ছিল—নিজেকে

জাহির করার উৎকট বাসনা ছিল—মুর-বাইরনের মেজাজের সঙ্গে তাই ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখনও মুর-বাইরনের আঙ্গিক তিনি ব্যবহার করবেন, কিন্তু কথাবস্তু বদলে যাবে। এমন কি, কবিতার বহির্ভুবন বাস্তবজীবন থেকে ঋণ গ্রহণে ইতস্তত করছে না। এটা একটা বড় ধাপ।

কবিতা কয়টি দুই জাতের, এক শ্রেণীর কবিতায় জীবনের বর্তমান অভিজ্ঞতার আন্দোলন বড ; আর এক শ্রেণীর কবিতায় অতীত জীবনের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস প্রবল। একটিতে মাদ্রাজ, অপরটিতে বাংলাদেশ।

সার্কুলেটারে মুদ্রিত প্রথম কবিতাটি হোল একটি 'ওড'—'On Hearing A Lady Sing'.

একবার তমলুকে গিয়েছিলেন ; সেবার সমুদ্র অপেক্ষাকৃত সন্নিকটে বলে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এবার তিনি সমুদ্রতীরে বাস করেছেন। সমুদ্র তাঁর কবিতার প্রকৃতি বদলাবে। সেই গহীন সুনীল চিরচঞ্চল কলকল্লোলিত অশান্ত সমুদ্র এই কবিতার উদ্দাম পটভূমি। কবি বর্ণনা করলেন—"Flowery shore upon the blossom of the deep." এই বর্ণনাটুকু সম্পূর্ণ কবির নিজের। বাতাস অকাতরে বয়ে চলেছে, ঢেউগুলি ফুঁসে-রুষে এগিয়ে আসছে শনৈঃ শনৈঃ, তট ছুঁয়ে অকারণে পিছিয়ে যাচ্ছে, উপহার দিচ্ছে শুভ্র কলহাস্য অজস্র।

এই বাস্তব দৃশ্যপটের উপর আজ এক রমণীরত্ন এসে দাঁড়ালেন। বই থেকে উঠে-আসা শুকনো মানুষ নয়, বাস্তবের মানুষ, টস্‌টসে মানুষ!

এই সমুদ্র-সান্নিধ্য মধুসূদনের জীবনে এক বড় ঘটনা। লঙ্কা কবতক্ষ তীরে নয়, সমুদ্র-মেখলা। মাদ্রাজের উপকূল শত অলঙ্কারে তাকে অলঙ্কৃত করেছে।

এই সব কবিতায় তাই নিহিত ভবিষ্যতের ভূমিকা।

সমুদ্রের কলরোল ছাপিয়ে ভেসে আসছে মানবীর মর্ম-দোলানো কণ্ঠস্বর—বর্ণনায় আতিশয্য আছে, মুর-বাইরন একেবারে নির্বাসিত নন।

> But, Lady! sweeter in the dream
> The voice awakens in the breast,
> It tells of Eden's land of beam,
> Its glory, and its bow'r of rest,

ছাত্রজীবনে 'নীলনয়না' অনামিকার জন্য কী প্রবল উৎকণ্ঠা প্রকাশ

পেয়েছিল! আজ সেই পুস্তকবাসিনীর পরিবর্তে জীবনবাসিনীর দেখা মিলছে।

এই সময়ই রেবেকার সঙ্গে তাঁর পরিচয়—ছাত্রী হিসাবে নয়। সাধারণ এক তরুণী হিসাবে তাঁকে তিনি দেখতে পান। 'ফিমেল অরফ্যান এ্যাসাইলাম'টি ছিল 'মেল অরফ্যান এ্যাসাইলামের' পার্শ্বে অবস্থিত। সেখানে অনেক বালিকার সঙ্গে থাকেন রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস্। পড়াশুনা করেন সংশ্লিষ্ট 'লেডিস ইনস্টিটিউশনে'। লেডিজ ইনস্টিটিউশন ব্রডওয়েতে ডিস্ট্রিক্ট চার্চের কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেয়ে এবং তাঁদের আনুকূল্যে একটি শাখা খুলেছেন।

রেবেকার পিতৃপরিচয় সংগ্রহ করা কষ্টকর। তাঁর বাবার নাম পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে ঠাকুর্দার নাম—ডুগ্যাল্‌ড ম্যাক্‌টাভিস্। তিনি ছিলেন একজন নীলকর; মাদ্রাজের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আরবুথনট কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কুডাপ্‌পা জেলায় কাজ করতেন। জীবনীকারেরা বলেছেন, তাঁরা স্কটল্যাণ্ডদেশীয়, আবার জনৈক প্রবন্ধকার বলেছেন, আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী।[৮ক]

কথাটা মিথ্যা না-ও হতে পারে। মধু বলছেন, "Mrs. D. is of English parentage". স্কটল্যাণ্ড বা আয়ার্ল্যাণ্ড যেখানে গৃহ-নিবাস থাকুক, তাতে ইংরেজ বলে পরিচয় দিতে বাধা নেই। রেবেকা যে ইউরেশীয় বা বর্ণসংকর নন, তারও কোন প্রমাণ নেই। কারণ 'ফিমেল' বা 'মেল' উভয় অনাথ আশ্রমে মিশ্রজাতির ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ থাকত এবং লেখাপড়া করত। "The school is essentially an East Indian Institution." গৌরদাসের এক পত্র থেকে জানতে পাই যে, মধুর স্ত্রী ছিলেন ধনী-কন্যা, মাদ্রাজ প্রদেশে তাঁর কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। কতটা ধনী, এখবর বলা মুশকিল। তবে খুব বড় রকমের ধনী নন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ মাদ্রাজের কোন কবরখানায়, কুডাপ্‌পার কোন কবরখানায় ম্যাক্‌টাভিস্ উপাধিধারীদের নামাঙ্কিত কোন কবর নেই। কবরে যে স্মারকলিপি খোদিত থাকে, তার থেকে মৃতের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমাধিলিপির জন্য মৃতের আত্মীয়দের প্রায় সহস্র টাকার ব্যয়ভার বহন করতে হোত। ম্যাক্‌টাভিসেরা যথেষ্ট ধনী হলে নিশ্চয়ই এই ব্যয়ভার বহন করতেন।[৯]

রেবেকার পরিচয় বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে শ্বেতাঙ্গিনী, বয়ঃপ্রাপ্তা এবং শিক্ষিতা, এটা জানা যায়। মধুসূদনের বধূ হবার প্রাথমিক যোগ্যতা তাঁর ছিল।

রেবেকার সঙ্গে তাঁর প্রণয়, স্কুলে শিক্ষকতা আর কবিতা লেখা সমান তালে চলেছে। কবিতার শিরোদেশে হোরেসের সেই আত্মনাশী উক্তি উদ্ধৃত হলেও কবিতার বক্ষে অন্য সুর ফুটে উঠতে থাকে। মস্তিষ্ক আর হৃদয়ের আলাপ এক প্রকার হয় না। বিষাদের সুর ফিকে হয়ে আসে।

দ্বিতীয় কবিতা প্রকাশিত হোল—তার নাম "On a Faded Lily given to the Author by a Lady." এ কবিতা আরো বাস্তবের মাটি-মাখা।

চারপাশের পৃথিবী কী চমৎকার! সব কিছু আমি দু'চোখ ভরে দেখি, কিন্তু তার অর্থ প্রণিধান করতে পারি না। কারণ "that speaks of my far home to me." দেশত্যাগ করে দেশের প্রতি প্রতিনিয়ত আকর্ষণ বোধ করছেন—"distant Albion's shore" কবির হৃদয়ের কাছেও অতীব 'distant'—দূরবর্তী হয়ে পড়ে। দেশ ছেড়ে বড় কঠিন মর্মান্তিক অনুভূতি জাগায় এই নির্জনতা, এই একাকীত্ব। বিনিময়ের মত ব্যক্তি নেই।

How fearful thus to feel alone
With not a heart responsive to mine own.

নির্জনতার গুমোট কেটে 'তুমি' দেখা দিয়েছ। তোমাকে দেখে আমি শান্ত হই, যেন কোন প্রচণ্ড ঝড়ের অবসান এইমাত্র হয়ে গেল। তুমি তোমার নিশ্বাসের দোলায়-দোলায় আমার ঘুমন্ত আশার কুসুমগুলি ফুটিয়ে দাও, জাগিয়ে দাও।

হিন্দু কলেজের বানিয়ে-বলা গল্প এখন জীবনের স্পর্শ পেয়ে ভিন্ন রূপ নিচ্ছে। সৌখীনতার স্থলে আন্তরিকতা দেখা দিচ্ছে।

মাদ্রাজ সার্কুলেটারে আরও দু'টি কবিতা ছাপা হোল। চতুর্থ কবিতাটির প্রসঙ্গে প্রথমে বলি। এই কবিতাটির নাম "A Vision"। পরবর্তী কালে ক্যাপটিব লেডির সঙ্গে "Visions of the Past" নামে যে কাব্যাংশ প্রকাশিত হয়েছিল, উল্লিখিত কবিতাটি তারই অংশ। প্রথম অংশ।

এই কবিতা তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের কথায় ভরা। "A Vision" কবিতাটি মাদ্রাজে অযাচিত অভিনন্দন পেল। জনৈক পত্র-লেখক ধন্য ধন্য করে চিঠি লিখলেন—একাধিক কবিতা পর পর ছাপা হতে মধু বুঝতে পারছিলেন যে, মাদ্রাজে তাঁর কবিতা হেলা-ফেলার মত নয়। এই পত্রলেখকের প্রশংসা তার বেশি কিছু। "The classical elegance of your composition, the admirable command

which you evidently possess over the resources of English language, and your thorough knowledge of the mysteries of the "Divine Art" are well calculated to attract attention of no ordinary kind."৯ক এই প্রশংসা নিঃসন্দেহে মধুর সৌভাগ্যসূচক।

'A' Vision কবিতা যেমন স্বদেশ-স্মৃতিতে আচ্ছন্ন, তেমন 'ক্যাপটিভ লেডি'।

The home of youth, 'tis far, oh, far away,
The hope of youth, they have fled and taught to weep,
The friends of youth e'en they, oh, where are they ?
Ask memory and the dreams which haunt in sleep.
Wing'd messengers and sweet from, Past ! thy donjon
keep !

বঙ্গ-স্মৃতিময় হলেও মাদ্রাজও রয়েছে। যেহেতু রয়েছে সমুদ্র।

মাদ্রাজ শহরই সমুদ্রময়। যেখানে যাও, সমুদ্র তোমার সঙ্গ ছাড়বে না। তার হাওয়া তোমাকে ব্যজন করবে, তার সঙ্গীত তোমাকে আহত করবে, আর ফাঁক পেলে সেই নীলনয়না সস্মিত আননে তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে। "A fleet of light upon a crystal sea !"

এইভাবে বাংলার শ্যামশ্রী প্রদেশান্তরের সমুদ্র-নির্ঘোষের সঙ্গে মিলে গেছে। চিত্র ও সঙ্গীত একদেহে সমন্বিত হয়েছে। Visions of the Past-এ পাচ্ছি—

As when, Bengala ! On thy sultry plains
Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan—slumberous haunt and cool—
Echo in mimic accents 'mong the flocks,
Couch'd there in noon-tide rest and soft repose,
Repeats the deafening and deep-thunder'd roar
Of him.—the royal wanderer of thy woods !

এই বড়ো (বুড়োও বটে) বটগাছটার বহু বছর পরে দেখা পাওয়া যাবে আবার চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে। মধুর কাব্যে কোন পদপাত-ই আকস্মিক নয়। নিঃসঙ্গ নয়।

মধুর প্রণয়-পর্ব অনেকটা এগিয়ে গেছে। প্রাথমিক স্তর হয়তো সহজিয়া

স্তর, কিন্তু খুব সহজ স্তর নয়। কন্যার নিকট-আত্মীয় বা আত্মীয়া কেউ নেই, বন্ধুরা আছেন, শুভানুধ্যায়ীরা আছেন। বংশের চেয়ে কঞ্চি দড়। তাঁরা ভয় দেখালেন, একে কালা আদমী (যথার্থ জেন্টেলম্যান নয়), তার উপর উপর বেতন তো ঐ সর্বসাকুল্য ৪৬ টাকা।

গেরস্ত বাড়ির স্মৃতিশাস্ত্র সবত্রই এক। বর একে হলেন মাস্টাব, তার উপব লেখেন তো কবিতা! কোন্ যুগেই বা একে সুপাত্র বলা হয়েছে!

ক্যাপটিভ লেডি লেখা হয়ে গেছে। তার একটি উপক্রমণিকা লিখে ফেললেন। সেখানে বিরাজ করছেন অনামিকা দেবী। তবে উদ্দিষ্টা রমণীরত্নকে চিনতে কারো অসুবিধা হয় না।

কবির পরিণয়-পূব জীবনের অনেকখানি ইতিহাস এখানে পাওয়া যায়। পূর্ব-লিখিত প্রেমেব কবিতার সঙ্গে এই কবিতাটির পার্থক্য আছে। প্রত্যক্ষতার সঙ্গে বাস্তবতার যেমন পার্থক্য।

পরবর্তী কালে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে হেনরিয়েটার উদ্দেশে তিনি যে সনেট লিখেছেন, তার সঙ্গেও এই কবিতাটির পার্থক্য আছে। যৌবনের সঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের পার্থক্য শুধু নয়, প্রণয়িনীব প্রতি যে আবেগ আর পরিণীতা রমণীর প্রতি যে আবেগ, তার মধ্যে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য।

মধুসূদনের সমগ্র রচনায় এমন সতৃষ্ণ উচ্চভাষী রগরগে প্রেমের কবিতা আর নেই। এর জন্য রেবেকার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

রেবেকা মধুর জীবনে একমাত্র প্রেমিকা, দ্বিতীয় জনা শুধু স্ত্রী। শুধু স্ত্রী হলেন জননীর নামান্তর।

এই কাব্য সাময়িক পত্রে যখন প্রকাশিত হয়, তখন বন্ধু মিঃ নেলরের নামে উৎসর্গ হয়েছিল। এ খবর খুব জরুরী নয়, কিন্তু উৎসর্গপত্রে একটি বাক্যাংশের তলায় দাগ টানতে হয়—"Literary wreck of bitter and happier days." বলা বাহুল্য, এই "bitter and happier days" হোল রেবেকার সঙ্গে পূর্বরাগের চিত্তহারী কাল। এই রঙিন দিনের আলো এই কাব্যের চিত্তে কতখানি লেগেছে, তা বলা তর্কসাপেক্ষ, কিন্তু উপক্রমণিকা-অংশটি যে, আলোয় ঝলমল করছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা সেই আলোয় নেয়ে-ওঠার উদ্যোগ করছি।

ভালো লাগে, ঐ চোখের সঙ্গে চোখ মেলাতে ভালো লাগে। কারণটা এই নয় যে, চোখ দু'টি ভারী সুন্দর। ভালবাসা তার সব কিরণ সব কোমলতম

জ্যোতি ওখানে জমা করে রেখেছে। দু'টিচোখ ভালবাসার শমীবৃক্ষ! তার হাসি? সে-ও তো অনুনয় ডেকে আনে। এই মন এতদিন কাঁদত, কাঁদত কারণ কোথায় তার অনুভবগুলো রাখবে! কোথায় তার শমীবৃক্ষ! বাংলার কথা মনে পড়ে, কারণ—বন্ধুদের কথা মনে পড়ে: আর একজনের কথাও হয়তো মনে পড়ে। কিন্তু তাঁর নাম আর উচ্চারণ করার সাহস নেই।

The home of youth, 'tis far—Oh! far away—
The hopes of youth, they've fled and taught to weep:—
The friends of youth, e'en they, —oh! where are they?
Ask memory and the dreams which haunt in sleep.—
Wing'd messengers and sweet form, Past! thy donjon keep!

কিন্তু আজ কেন কাঁদব? আর কেন কাঁদব? যখন আমার জন্য তুমি আছ, আমার নিজস্ব একান্ত তুমি!

Dost smile in tranquil joy, like star on sapphire throne? অসীম সমুদ্রে পথহারা নাবিক যে শুভ্র তারাটি দেখে পথ চেনে, তুমি সেই তারা—আমার জীবনে, আমার গানে। কবির জীবনে তুমি হলে অনুপ্রেরণা। আমার এই অভাব-বিজড়িত সংসারে তোমার আগমনে আজ আর অনুতাপ নেই—তুমি মহার্ঘ্যতম রত্ন এবং একান্ত আমারই। জীবন স্বপ্ন দেখে কেন? না, তার দৃশ্যপট রাঙিয়ে নেবার জন্য। ভালবাসা সেই কাজটি করে দেয়—তুমি আমার সেই মূর্তিমতী স্বপ্ন! সানন্দিত বাস্তবে। স্পন্দিত ভুবনে। জীবনের বহু বসন্ত বৃথায় ঝরে গেছে, আজ আর তার জন্য অশ্রু মোচন করব না। আজ এসেছে এক আরক্ত বসন্ত। আমি যেন এক বৃক্ষ যার দেহের উপর মিষ্ট বায়ুপ্রবাহ আঘাত হেনে শুকনো পাতা সব ঝরিয়ে দিয়ে যায়, আরো, আরো ঢের বেশি শ্যামল আস্তরণে ভূষিত করে দেবে বলে।

কাব্যের ব্যূহমুখে প্রিয়তমার বন্দনা শেষ হোল। বন্দনা শেষে আহ্বান জানালেন কাব্যলক্ষ্মীকে। তিনি এসে কবির হৃদয়বেদীতে অধিষ্ঠিতা হোন।

এখন শুরু হবে মাতৃভূমির গৌরবগান; সুরটা কারুণ্যে ভরা এবং বিষয়টা মহিমাময়। অশ্রু সর্বদা দুর্বলের অবলম্বন নয়। বেদনায় সর্বদা পরাজয় অভিব্যক্ত হয় না।

ক্যাপটিভ লেডির প্রকাশনার সঙ্গে মধুর নবজীবনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

রেবেকা কি অনাথ-আশ্রমে বন্দিনীর মত ছিলেন? কি জানি! কবিতা আর জীবন হয়তো সর্বদা পরস্পরের মুখাপেক্ষী না-ও হতে পারে।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে মুগ্ধা নায়িকাও এক প্রকার বন্দিনী। সেই অর্থে বিচার করলে বিমুগ্ধা সেই 'ক্যাপটিভ লেডি' মুক্ত হয়েছেন—বন্ধুরা ছিলেন সাক্ষী। কাব্যের সুর ছিল কোমল-মধুর; জীবনের সব ঘটনা তেমন ভাবে বর্ণিত হয় না। অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে হয়ে গেল, হয়তো কোন বিশপ মহাশয়ও এসেছিলেন আশীর্বাদ জানাতে। কিন্তু রেজিস্ট্রী করে বিবাহ হয় নি, কারণ রেজিস্ট্রী খরচ বহন করাব মত আর্থিক সঙ্গতি মধুর ছিল না। ৪৬ টাকা বেতনভোগী এক সামান্য শিক্ষকের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিবাহ তখন ছিল দরিদ্রের নবাবী করার মত হাস্যকর ব্যাপার। মাদ্রাজে বিবাহ-অনুষ্ঠান বেশ ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। লাইসেন্স ফি ছিল ৭০ টাকা, তদুপরি কেরানী বিদায় ছিল ৭ টাকা। এছাড়া অঙ্গুরীয়, মালা, এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতির জন্য একটা মোটা টাকা লাগত। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সম্মুখে পর্যন্ত শপথ গ্রহণ (Solemn proclamation) মারফৎ যে বিবাহ হোত, তাতে খরচ লাগত সাড়ে সতের টাকা আর কেরানীকে দিতে হোত মাত্র দুই টাকা অর্থাৎ উনিশ টাকায় সব কাজ সমাধা হয়ে যেত। এই প্রকার বিবাহকে বলা হোত Marriage by Banns.[১০]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মাদ্রাজে তাঁর মত দরিদ্র খ্রীস্টান কি কেউ ছিলেন না? তাঁরা কি বিয়ে করেন নি? করেছেন। দেশীয়দের মধ্যে, ইউরেশীয়দের মধ্যে অনেকে যৎসামান্য রোজগার করতেন বন্দরে, ছাপাখানায়, সওদাগরী অফিসে। যাঁরা সামান্য বেতনের চাকুরে, তাঁরা অধিকাংশই এই শেষোক্ত উপায়েই বিয়ে করতেন।

১৮৫০ সনে এই কারণে ধর্মনিষ্ঠ খ্রীস্টানেরা এই বিবাহবিধি সংস্কারের জন্য আইন বাঁধতে উঠে-পড়ে লাগলেন। ১৮৫২ সনে যে বিবাহবিধি গৃহীত হোল; তাতে বলা হোল ইউরোপীয়দের জন্য রেজিস্ট্রেশন হোল আবশ্যিক, 'নেটিব'দের জন্য নয়।

মধুর বিবাহ রেজিস্ট্রী করে হয়েছিল কিনা এ জিজ্ঞাসার সদুত্তর মিলবে না আজ, কারণ তখনকার নথিপত্র সবই নষ্ট হয়ে গেছে। (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)

১৮৫০ সনে মাদ্রাজ সরকার এক আদেশ জারী করে বললেন, "Parties desirous of being married should apply direct to some

Surrogate residing near them ; but from places where there is no Surrogate, application should be made to the Registrar, who will procure a commission under the episcopal seal, authorising some person to administer the usual oaths and grant the necessary license. None but a clergyman of the Church of England can marry by virtue of an episcopal licence."[১১]

এই বক্তব্য থেকে এটা বুঝা যায় যে, মাদ্রাজে বিধিবদ্ধ বিবাহ হয় নি, এমন বিবাহের সংখ্যা কম ছিল না। এই কারণে ১৮৪৮ সনে মাদ্রাজ খ্রীস্টীয়ান ইনস্ট্রাক্টার লিখছে, "The spiritual condition of many families bearing the christian name in Madras and the suburbs is degraded and godless beyond anything:" খবরটি ক্যালকাটা ক্রিস্টীয়ান অবজারভার পত্রিকায় ১৮৪৯ সনের জানুয়ারি সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়।[১২]

১৮৫২ সনে ৯ই মার্চ মাদ্রাজ একজামিনারে ক্রিস্টীয়ান এ্যাডভোকেট পত্রিকার ২৩-এ ফেব্রুয়াবির একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিল, তাতে বলা হয় মাদ্রাজে এমন বহু বিবাহ ঘটে গেছে, যেখানে আদৌ কোন বিশপ উপস্থিত থাকেন নি। নিজেরা বসে বন্ধুবান্ধবদের সমক্ষে পারস্পরিক শপথ বাক্য-বিনিময়ে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। "Who is to prevent clandenstine marriages of all kinds ?" নেটিবরা, ইস্ট-ইণ্ডিয়ানরা বা পর্তুগীজরা যে ইউরোপীয় তরুণীদের প্রলুব্ধ করছে, এর প্রতিবিধান কি ? তাদের বিবাহ-যোগ্য বয়স হয়েছে কিনা, সেটাই বা কে নির্ণয় করবে ? আরও অনেক প্রশ্ন ঐ পত্রিকায় তোলা হোল। "How are the degrees of consanguinity to be guarded ? What is to give publicity, solemnity, consent of parents, and probity to this most solemn of all engagements and where is the lawful register of such contracts to be deposited ? And what is to become of the question of legitimacy, for instance, and a thousand others affecting property ?"[১২ক]

বলা বাহুল্য, এর পরে আর আমাদের উচিত হবে না মধুসূদনের বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে তদন্ত করা।

হৃদয়ের বিধানে এ বিবাহ সুসিদ্ধই হয়েছিল। "এখানে আসার পর থেকে এখানে স্থায়ী সংস্থান একটি পাবার জন্য আমাকে বিলক্ষণ মেহনত করতে হয়েছে, বিশেষ করে একজন নির্বান্ধব অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুকের পক্ষে সেটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। যা হোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার দুঃখের রজনীর অবসান ঘটেছে।" "and I now begin to look about me very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale!" চিঠির এই উপমাটি খুব লাগসই হয়েছে। কবি চেঁচিয়ে উঠলেন—"Here's a simile for you, my boy!"—এ যেন অভিনয়ের মাঝখানে অভিনেতাশ্রেষ্ঠ দর্শকদের জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে হে! আর কাব্যে লিখছেন—

Yes,—like that star, which on the wilderness
　　Of vesty ocean, woos the anxious eye
Of lonely mariner,—woos to bless,—
　　For there be hope with on her brow on high,
He recks not darkling waves,—nor fears the lightless sky!

মধুর জীবনে এই সময়ে মিঃ জর্জ নর্টন দেখা দেন; মধুর মুদ্রিত কবিতা তাঁর নজরে পড়েছিল পূর্বেই।

মধুর বিবাহে তিনি ঘটকালি করেছিলেন বলে জীবনচরিতের লেখক একটি খবর দিয়েছেন।[১৩] খবরটি ঠিক নয়। যাঁর সঙ্গে আলাপই হয় নি, তিনি কি করে বিবাহের মধ্যস্থতা করবেন, বা কি করে ধর্মপিতা (God-father) হবেন। বিবাহ হয়ে গেলে মিঃ নর্টনের সঙ্গে মধুর আলাপ হয়।

মাদ্রাজ সার্কুলেটারে যখন কাব্যটি প্রকাশিত হয়, সেটি তাঁর বন্ধু মিঃ নেলরের নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশনাকালে নেলরের নাম প্রত্যাহৃত হলেও বন্ধুত্ব প্রত্যাহৃত হয় নি। নেলর ছিলেন মধুর দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। রেবেকা ও মধুসূদনের জীবনে তিনি ছিলেন যোজকস্বরূপ। কলকাতায় মধুসূদন মাঝে মাঝে তাঁর দেখা পেয়েছেন; মধুর মাদ্রাজ-ঔৎসুক্য তিনিই নিরাকরণ করতেন। মধুর, কলকাতার মধুর কি মাদ্রাজ-ঔৎসুক্য আদৌ ছিল? ইতিবৃত্ত নীরব।

॥ ২ ॥

মধুসূদন কাজ করেন সামান্য। তা সত্ত্বেও মাদ্রাজের শিক্ষিত মহল তাঁর পাণ্ডিত্য, রচনাশক্তি ও সুমধুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠল। মাদ্রাজে প্রায় দশখানা সাময়িক পত্র ছিল—তার সবগুলিই ইংরেজদের নয়। The Crescent এবং The Rising Sun ছিল দক্ষিণীদের পত্রিকা—The Crescent চালাতেন গজালু লক্ষ্মী নারসু চেট্টি; The Rising Sun চালাতেন বেঙ্কট রয়লু নাইডু।

গজালু লক্ষ্মী নারসু চেট্টি ছিলেন সিদ্দলু চেট্টির ছেলে; ঐ ভদ্রলোক ছিলেন নীলের ব্যবসাদার; এ ছাড়া মিশরে কাপড়-চোপড় চালান দিয়ে তিনি প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিলেন।[১৩ক] লক্ষ্মী নারসু ১৮৪০ সনে মাদ্রাজে 'নেটিব এসোসিয়েশন' গঠন করেন; তাঁর মতলব ছিল মিশনারীদের কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা। যাঁরা ধর্মান্তরিত হতেন, মাদ্রাজে সরকারী কাজকর্মে তাঁদেরই সুযোগ বেশি দেওয়া হোত। নারায়ণস্বামী নাইডু নামে এক ভদ্রলোক 'নেটিব সার্কুলেটার' নামে একখানা কাগজ চালাতেন। লক্ষ্মী নারসু কাগজটির স্বত্ব কিনে নিলেন; এবং নামও পালটে দিলেন। প্রাক্তন সময় বিভাগীয় কর্মচারী মিঃ হার্লিকে সম্পাদক নিযুক্ত করলেন।

মিশনারীদের খ্রীস্টীয়ান রেকর্ডারের সঙ্গে পাল্লা কষার জন্য 'ক্রিসেন্ট' বেরুল। মাদ্রাজ সরকার প্রথম থেকে ভালো ব্যবহার করে নি; ফোর্ট সেন্ট জর্জ গেজেটে ঐ পত্রিকা সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞাপন পাঠান হলে গেজেট কর্তৃপক্ষ তা ছাপতে অস্বীকার করলেন।

লক্ষ্মী নারসু মিশনারীদের কাযকলাপে প্রতিবাদ জানিয়ে এক স্মারকলিপি তৈরি করলেন; মাদ্রাজ শহরের শেরিফের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ১৮৫৩ সনে কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির সময় তিনি বারো হাজার দেশীয় ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি উপস্থাপন করলেন।

দেশীয়দের অপর কাগজ The Rising Sun-এর বেঙ্কট রয়লু নাইডু একদা ছিলেন সরকারী চাকুরে; সরকারী দপ্তর থেকে কোন নথির নকল পাচার করার অভিযোগে তাঁর চাকরী খতম হয়। মাদ্রাজের দরখাস্ত বিভাগে (Petition Department) তিনি ছিলেন তেলেগু অনুবাদক।[১৩খ] ১৮৫৩ সনে সনদ পুনর্বহালের সময় তিনি পার্লামেন্টের সম্মুখে ভারতীয়দের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য বিলেত যাওয়ার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন।[১৪] তিনি

ছিলেন ·হিন্দু ডিবেটিং সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী মিঃ স্যালমন ছিলেন তার সভাপতি। কিন্তু তাঁর ব্রিটিশ-বিরোধী আচরণের জন্য মিঃ স্যালমন পদত্যাগ করেন। মিঃ টি· এস· স্মাইথ ছিলেন নতুন এ্যাডভোকেট জেনারেল ; তাঁকে সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি প্রথমে রাজী হন ; পরে অসম্মতি জানালেন। সেপ্টেম্বরের ১লা তারিখ এথেনিয়াম পত্রিকায় বলা হোল, দেশীয় ও ইউরোপীয়দের সহযোগিতা দেশপ্রেম-বিরোধী নয়—"no enemy to patriotism."

পাচাইয়াপ্‌পা হলে (১২ই আগস্ট) দেশীয়দেব এক সভা হয়ে গেছে ; সেখানে ইণ্ডিয়া বিলের উপর দেশীয়দের বক্তব্য নিয়ে এক স্মাবকলিপি তৈরী করা হোল। তর্ক এতদূর গড়াল যে, ডিসেম্বব মাসে হিন্দু ডিবেটিং সোসাইটি যখন স্কুলগৃহ ব্যবহার করতে চাইল, তখন তাকে অনুমতি দেওয়া হোল না।

মধু শুধু যে শিক্ষকতা করেন আর অনুগত গৃহস্থের মত নবপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে মধুযামিনী যাপন করেন, এমন নয়। মধুসূদন এইসব বিতর্কের মধ্যে ছিলেন। অন্যান্য 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর মত মধু ছিলেন ইংরেজ-দেশীযদের সহযোগিতায় বিশ্বাসী। উপরন্তু তিনি ইংরেজ-সম্পাদিত পত্রিকার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। প্রথমে ছিলেন মাদ্রাজ সার্কুলেটারের সঙ্গে যুক্ত ; পরে এথেনিয়ম এবং স্পেকটেটারেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

মধু এই সময় মাদ্রাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ইংবেজের সংস্পর্শে আসেন। এথেনিয়ামের সম্পাদক এক সময় ছিলেন জন ব্রুস নর্টম (১৮১৫-১৮৮৩)। ওঁব বাবার নাম জন ডেভিড নর্টন, তিনি মাদ্রাজের পুইনি জজ (Puisne Judge) ছিলেন। জন ব্রুস নর্টন প্রথমে ব্যারিস্টারী করতেন, পবে ১৮৬৩ সনে (মধু মাদ্রাজ ত্যাগ কবলে) তিনি এ্যাডভোকেট জেনাবেল হয়েছিলেন। এথেনিয়াম পত্রিকা সম্পাদনা করা ছাড়াও তিনি মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির অন্যতম গভর্নর ছিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন স্পেকটেটার পত্রিকার মালিক মিঃ অক্‌টরলোনী ; মাদ্রাজ মেল এ্যাণ্ড ফিমেল অরফ্যান এ্যাসাইলামের অন্যতম ডিরেকটর ছিলেন। সেই সূত্রে মাইকেলেব সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি মাইকেলের গুণগ্রাহী ছিলেন। নানান সংবাদপত্রের সঙ্গে মধুর যোগাযোগের পিছনে তাঁর সহযোগিতা থাকা বিচিত্র নয়। তিনিও মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির অন্যতম গভর্নর ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ১৮৫৬ সনের আগস্ট

মাসে মধু তাঁরই স্পেকটেটারে যোগদান করেন, তখন স্পেকটেটার দৈনিক পত্রিকায় উন্নীত হয়েছে। অক্টোরলোনী মাদ্রাজ লিট্‌রারী সোসাইটির সদস্য ; রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সহায়ক সদস্য। মাদ্রাজে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তাঁর পরিচালক সমিতিব সভ্য হন। এ ছাড়া মাদ্রাজ ক্লাবেব এবং East Indian Emigration Society-র সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন স্থানীয় বণিক সমাজেব নেতা ; মাদ্রাজ চেম্বার অব কমার্সের ছিলেন সভাপতি। ১৮৪৮ সনে প্যারী এণ্ড কোম্পানীব সদর দপ্তরে মাদ্রাজেব শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এক সভা হয। বন্দরেব শুল্কহার নিয়ে ঐ সভায় আলোচনা হয়। অকৃটরলোনী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।[১৫] তিনি গ্র্যাণ্ড জুরির সদস্য ছিলেন ; জ্যাস্টিস্ অব পীস্ ছিলেন। এ হেন কর্তাব্যক্তি মধুর মাদ্রাজে শিক্ষক ও সাংবাদিক জীবনেব বরাবর সহযোগী ছিলেন।

এই দুইজনের মত এত দীর্ঘ দিন না হলেও মিঃ জর্জ নর্টন ছিলেন মধুর অন্যতম শুভানুধ্যায়ী ; সম্ভবত শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

মিঃ জর্জ নর্টন ব্যবহারজীবী হিসাবে প্রথমে বোম্বাই উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর নাকি দক্ষিণা ছিল বিলেতেব যে কোন ব্যাবিস্টারের সাত গুণ।[১৬] বোম্বাইয়ে তিনি টিকতে পাবেন নি। ১৮২৭ সনে ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি মাদ্রাজেব এ্যাডভোকেট জেনাবেল নিযুক্ত হন। ১৮৫৩ সন পর্যন্ত মাদ্রাজের এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন; ১৮৮৮ সনে ৮৫ বৎসব বযসে বিলেতে তাঁর পবলোক প্রাপ্তি ঘটে। মিঃ জর্জ নর্টন প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাতা ; তাছাড়া মাদ্রাজে ধর্মনিবপেক্ষ শিক্ষা বা আধুনিক শিক্ষা প্রসারে তাঁর ভূমিকা সকলের থেকে অধিক। মধুব জাবনে তিনি ছিলেন অকৃত্রিম সুহৃদ। বন্ধুর জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু কববাব পূর্বেই তিনি অবসব গ্রহণ করে বিলেতে চলে যান। মধুব কবিতা পড়ে খুশি হয়ে তিনি লিখেছিলেন —"he will consider it an honour to have a work "exhibiting such great powers and promise" dedicated to him." তারপর যেদিন ঐ বৃদ্ধের হাতে বই তুলে দিতে তাঁর সম্মুখে হাজির হলেন— "The old man received me as kindly as I could expect" তাঁর সাংসারিক বৈষয়িক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিলেন ; প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁর যোগ্য কোন সরকারী চাকুরী তিনি যোগাড় করে দেবেন।

মধুকে তিনি এক গাদা সেরা সেরা গ্রন্থ উপহার দিলেন—"a most valuable number of classical works, as a token of his regard." এবং সত্যসত্যই ইউনিভার্সিটিতে কাজ যোগাড় করে দিয়েছিলেন। দেশীয়দের মধ্যে মধুই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ প্রকার পদ পেয়েছিলেন; আর সবাই ছিলেন দেশী ভাষার শিক্ষক।

মাদ্রাজে মিঃ হেনরি মীড-ও ছিলেন মধুর অন্যতম গুণগ্রাহী; মধুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন; পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনে তিনি এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। জন ব্রুস নর্টন অবসর নিলে হেনরি মীড এথেনিয়ম পত্রিকার সম্পাদক হন।

কিশোরীলাল হালদার বলেছেন, "It was no small honour for a young Bengalee in those days to have earned by his journalistic writing the esteem and friendship of such distinguished men as John Bruce Norton and Henry Mead."[১৭]

ইউরেশীয়দের মধ্যে মিঃ নেলর ও মিঃ কেনরিক ছিলেন মধুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁরা দু'জনই ছিলেন নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত। নেলর ছিলেন শিক্ষক; মিঃ কেনরিক ছিলেন পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ।

মাদ্রাজ সার্কুলেটার ও এথেনিয়মে তাঁর লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। এটা দেখে জনৈক প্রকাশক সম্পূর্ণ তাঁর উপর নির্ভর করেই একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন—নাম হোল ইউরেশীয়ান (Eurasian)—৩রা নভেম্বর ১৮৪৯ সনে পত্রিকার ১ম সংখ্যা বের হোল। ইয়ং মেন্স লিট্রারী সোসাইটির পক্ষে মাদ্রাজের সিমকিনস এণ্ড কোম্পানী হোল এর প্রকাশক। এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে মাইকেলের রিজিয়া কাব্যনাট্য ছাপা হতে লাগল। নভেম্বর মাসে ১০, ১৭, ২৪, ডিসেম্বর মাসে ১, ৮, ১৫, ও জানুয়ারি মাসে ১২ তারিখে নাটকের নয়টি দৃশ্য ছাপা হোল।

এ ছাড়া মধুর কলকাতায় বসে লেখা ১৮৪৬ সনের কবিতা—'Lines written in a Lady's Album' ২২-এ ডিসেম্বর ছাপা হোল। ১২ই জানুয়ারি King Porus পুনর্মুদ্রিত হোল। পূর্বে কলকাতায় এই আখ্যান-কবিতাটি লিটরারী গ্লীনারে ছাপা হয়েছিল। ৯ই মার্চ 'Sonnet on the Departure of my Wife and child to the Upper Provinces' ছাপা হোল।

প্রথম সন্তান প্রসবের পর জননী রেবেকার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। স্বামীর কত উৎকণ্ঠা! স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠালেন কবি। কিন্তু কবির গৃহ তো শূন্য। বিরহের বেদনা বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল—My home is lonely, I seek, in vain. গৃহ আমার শূন্য, বৃথাই আমি তল্লাস করি। এই পত্রিকায় তাঁর প্রিয় শিক্ষক ডি. এল. আর.-এর কবিতা পুনর্মুদ্রিত করলেন। একবার শশিচন্দ্র দত্তের গঙ্গার উপরে লেখা একটি 'ওড' পুনঃপ্রকাশ করলেন—কবিতাটি পূর্বে 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ ছাপা হয়েছিল। কোথায় জর্ডন নদী! গঙ্গা সমাদৃত।

ইউরেশীয়ান পত্রিকায় লেখালেখি যতটা উৎসাহের সঙ্গে চলছে, শিক্ষকতাও ততটা উৎসাহের সঙ্গে চলছে। ১৮৪৮ সনে এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল দেখে গুণীজনেরা প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। সংবাদপত্রে বলা হোল "very satisfactory"; বলা হোল, "must have been gratifying to the directors of the Institution and to all who take an interest in this excellent charity."[১৮] তবু এই সময় সার্কুলেটারে একটি খবর বেরুল যে, মাদ্রাজ মেল অরফ্যান এ্যাসাইলামের পরিচালকেরা বিলেত থেকে ইংরেজ শিক্ষক চেয়ে পাঠিয়েছেন।

ইউরেশীয়ান পত্রিকায় এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হোল, এবং পরোক্ষ ভাষায় মধুর প্রসঙ্গ বলা হোল। আমরা এই প্রতিবেদনটি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। "I do not mean to question the propriety of a European master being appointed instead of an East Indian, but we do most uncompromisingly. The school is essentially an East Indian institution; the Directors are East Indians, and why ought the master of the school to be a European? We cannot find words strong enough to denounce the grovelling sycophancy and mental slavery of those who thus continue to burn the incense of abject submission to a difference of colour".[১৯]

বিশপস্ কলেজের তিক্ত অভিজ্ঞতা এখনও তিক্ততর হয় নি; মাঝে মাঝে ধাক্কা খান, তবু মধ্যবিত্তের 'বড়র পিরীতি'র লোভের নিবৃত্তি নেই। হিন্দু কলেজের 'এ্যাংলোফিল'-এর রক্তের মধ্যে দ্বিচারিতার জীবাণু

প্রবেশ করেছে যে! ডিরেকটারদের ধিক্কার দেওয়া হোল; জিজ্ঞাসা করা হোল মেল অরফ্যান এ্যাসাইলামে কি যোগ্য শিক্ষক নেই? অন্তত একজন যোগ্য শিক্ষক যে আছেন, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ নেই। তিনিই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত (in-charge)। তাঁর যে-যোগ্যতা, তার জন্য তিনি আরও উচ্চতর বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করার উপযুক্ত—তিনি "in point of intellect, talents and energy is second to no European and eminently fitted for the conduct of schools of far higher pretensions than those of the Black Town Male Orphan Asylum."[২০]

সম্পাদক এরপর একটা নির্মম সত্য কথা বলে ফেললেন। "The voice of the white apis hath spoken, and the sound thereof the whole Army of Directors must fall down and worship the hueless image, kissing its foot and placing the said foot on their necks. Really it is too much to think on with calmness, so we shall drop our pen."[২০ক]

ইউরেশীয়ান পত্রিকায় বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আরও সত্য-ভাষণ থাকত। ধর্মাচরণে সেদিন সাদা-কালোর ভেদ সহ্য করা হোত; সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাই বলা হোল অপরাধ শুধু ইউরোপীয়দের নয়, ইস্ট-ইণ্ডিয়ানদেরও। তারা কবে জাগবে, কবে ঈশ্বরের ভবনে এই অপমানের বিরুদ্ধে শপথ নেবে, রুখে দাঁড়াবে? প্রবন্ধ লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, ভাষণ লিখে কোন ফল হবে না। দাসসুলভ নিষ্ক্রিয়তার ও অথর্বতার বেড়া ভেঙ্গে তাদের আজ কিভাবে জাগান যাবে, এই হোল জিজ্ঞাসা। গালাগাল, অনুনয়-বিনয়, অপমান সব ব্যর্থ হয়েছে। "God only knows what will stir them up to act as free-born men, living under a free constitution." প্রচুর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ মিশিয়ে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। প্রবন্ধের বাক্যযোজনার প্রতিটি বাঁকে বাঁকে মধুসূদনের লেখনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে।

বিশপস্ কলেজের সেই প্রতিবাদী যুবক ছাত্রটি আজ মাদ্রাজে শিক্ষক আসনে বসেও মিইয়ে যান নি। পাত্রভেদে মধুর যেমন স্বাদ বদলায় না, চাকভেদে মক্ষিকারও তেমনি হুলের ধার কমে না।

মধু খ্রীস্টধর্মাবলম্বী, কিন্তু খ্রীস্টান নন। মাঝে মাঝে খ্রীস্টান হবার চেষ্টা করেছেন—সেটা তাঁর সত্য ভূমিকার বিরোধী। মধু উনিশ শতকের

উন্নত মতির মধ্যবিত্ত—মতি উন্নত, কিন্তু মতি সদা স্থির, একথা বলা চলে না।

মধু খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের নানা কাজ পছন্দ করেন না। সেন্ট টমাস মাউন্টে খ্রীস্টীয় প্রচারকেরা ধরে ধরে অশিক্ষিত দুর্গত জেলে ও অন্যান্য নীচু জাতের লোকদের ধর্মান্তরিত করছে—মধু একে ধর্মীয় জুলুম বলে মনে করেন। ইউ-রেশীয়ান পত্রিকায় এ বিষয়ে যে সমালোচনা ছিল, তার লেখক মধু ছাড়া অন্য কেউ হতে পারেন না।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আত্মমর্যাদার লড়াই মাদ্রাজে আরও অনেকে শুরু করেছেন। মধুর মাদ্রাজে পদার্পণের পূর্বে একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয়। মাদ্রাজের কোর্ট অব ডিরেকটার্স-প্রচারিত একটি সমাচারে (despatch) হিন্দুদের সম্বন্ধে 'হিদেন' শব্দটি ব্যবহৃত হলে তীব্র আপত্তি ওঠে। তখন বলা হোল, আর যেন এই শব্দটি ব্যবহার করা না হয়। সরকারী কাজে, বিশেষ করে বিচার বিভাগের নথিপত্রে ও আদেশনামায় এ বিষয়ে নজর রাখতে হবে। গভর্নর টুইনডেলের নামে (Tweendale) এই আদেশনামা প্রকাশিত হয়।[২১] এই ব্যাপারে বেঙ্কট রয়লু নাইডু ও গজালু লক্ষ্মী নারসু চেট্টী প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন।

॥ ৩ ॥

বিবাহের কয়েক মাস পরে কলকাতার বন্ধুরা তাঁর খোঁজ পেলেন। আমরা সচরাচর মনে করি, ১৮৪৯ সনে ১৫ই ফেব্রুয়ারি লিখিত চিঠিই তাঁর প্রথম মাদ্রাজ থেকে লেখা চিঠি। কিন্তু তা নয়, মধুর সঙ্গে গৌরদাসের জানুয়ারি মাসের শুরুতেই যোগাযোগ ঘটেছে। কারণ ২২-এ জানুয়ারি মধুকে লেখা এক চিঠিতে গৌরদাস লিখছেন, "It is very strange that you did not answer the principal questions that I put to you."

সম্ভবত কলকাতার খ্রীস্টীয় মহল মধুর গতিবিধির খবর জানতেন; এবং ১৮৪৭ সনের ১৯-এ মে-র পর গৌরদাসের কাছে মধু আর কোন পত্র লেখেন নি। অন্তত কোন লিখিত পত্র পাওয়া যায় না। যোগাযোগ যে হ্রাস পেয়েছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

খ্রীস্টীয় মহল খবর রাখলেও তাঁরা মধুর বন্ধু ছিলেন না, অন্তরঙ্গ ছিলেন না। এঁদের কারো কাছ থেকে মধুর বিবাহ, চাকরী ও সাংবাদিক

বৃত্তির সংবাদ পেয়ে গৌরদাস তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। প্রথম পত্র শুধু মামুলি, দ্বিতীয় পত্রে মধু তাঁর প্রিয় বন্ধুর কাছে ব্যক্তি-জীবনের বহু ঘনিষ্ঠ প্রসঙ্গ বর্ণনা করলেন। গৌরদাস ডাকলেন, চলে এস, চলো যাই দু'জনে লাহোর পর্যন্ত বেড়িয়ে আসি। আবার লিখছেন (৩রা মার্চ, ১৮৪৯), "I should only impress upon you the feasibility of your return to Calcutta, that such a genius should be lost in wilderness, that it should bloom and ripen unseen and unadmired is a thing I can never bear."

গৌরদাস তখনও মধুর কাব্য Captive Lady দেখেন নি; সে বই ছাপাখানার গহ্বর থেকে মুক্তি পায় নি। তবু তিনি বলছেন এমন একটি প্রতিভা মাঠে মারা যাবে, এ আমি সহ্য করতে পারি না। সুদূর প্রবাসে এই প্রতিভা ফুটবে, পরিপক্ক হবে, অথচ কেউ দেখবে না, তারিফ করবে না, এমনতর অবস্থা আমি সহ্য করতে নারাজ।

ক্যাপটিভ লেডি অতঃপর ছাপাখানার গহ্বর থেকে বহির্গত হোল। মাদ্রাজের কাগজে-কাগজে সমালোচনা আর সুখ্যাতি।

দুঃখ-কষ্টের দীনতা এ রচনার দেহে কোথাও নেই—এতে আছে শুধু সৌন্দর্য, নিসর্গ ও মানব-দেহের সৌন্দর্য থোকা-থোকা, মানব-মনের সৌন্দর্য ছিটেফোঁটা। বন্ধু ভোলানাথ চন্দ্র এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "It rose as an Aurora borealis from amidst the stern cold of want and poverty. We had had in our day Anglo-Bengalee poets, such as Kasiprosad Ghosh, Rajnarain Dutt, Gurucharan Dutt, O. C. Dutt and others; Modhu distances them all.

মাদ্রাজের এথেনিয়ামে সমালোচক লিখেছেন, "What I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own." এ সমালোচনায় কাব্যের কোন সৌন্দর্য ধরা পড়ে নি, শুধুই প্রশংসা।

আর একজন সমালোচক লিখেছেন, "The beautiful little poem is the work of a Bengali youth of four and twenty. The reader cannot but be struck with the author's marvellous command over the English language that every page of this poem displays." এ সমালোচনাতেও সাহিত্যিক সৌন্দর্য বিশ্লেষিত নয়।

বিদ্বেষমূলক সমালোচনা বেঙ্গল হরকরা (মে ১৯, ১৮৪৯) ও হিন্দু ইন্‌টেলি-জেন্‌সারে বেরিয়েছিল।

কাব্যখানি দুই সর্গে সম্পূর্ণ; কিংবদন্তী-মেশানো ইতিহাস অবলম্বনে রচিত।

ভারতের সকল সামন্ত নৃপতি কনৌজরাজ-আয়োজিত রাজসূয় যজ্ঞে যোগ দিয়েছেন; যোগ দেননি কেবল দিল্লীশ্বর। তিনি হলেন মহান পাণ্ডুবংশীয় নৃপতি। দিল্লীশ্বর ভেবেছিলেন তিনি যদি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তাহলে কনৌজরাজ জয়মল্ল রাজচক্রবর্তীর সম্মান লাভ করবেন।

দিল্লীশ্বরের অনুপস্থিতিতে কনৌজরাজ খুব চটে গেলেন। দিল্লীশ্বরের এক স্বর্ণ প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে যজ্ঞস্থলে সংস্থাপন করলেন। অনুপস্থিত নৃপতির ঐ হোল যোগ্য প্রতিনিধি!

দিল্লীশ্বর চুপ করে থাকলেন না; তিনি সহসা একদিন ছদ্মবেশে প্রাসাদে প্রবেশ করে সেই সুবর্ণ-নির্মিত মূর্তি ও তৎসহ অধিকতর মহার্ঘ্য স্বর্ণপ্রতিম রাজকুমারীকে অপহরণ করে পলায়ন করলেন। এই রাজকুমারীর তিনি পূর্বে একবার পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন।

কনৌজরাজ তাঁর কন্যার পুনরুদ্ধার করলেন, দুর্গে তাকে বন্দিনী করে রাখলেন। রাজকন্যাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না: তিনি ভাটের ছদ্মবেশ ধারণ করে দুর্গ থেকে একদিন অন্তর্ধান হলেন।

তাঁর পিতা এই ঘটনাকে দারুন অপমানজনক বলে মনে করলেন। কোনদিন এই জ্বালা ভুলতে পারলেন না।

গজনীর সুলতান মহম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করল; জয়মল্ল জামাতার সাহায্যে এগিয়ে এলেন না। গজনীর আক্রমণকারী তাঁকেও খাতির করে নি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

মাইকেলের কলমে গল্পটির পুরাতন ঝোঁক বদলে গেল। যুদ্ধবিগ্রহসঙ্কুল আখ্যায়িকাটি প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক নির্ভরতার উপাখ্যানে রূপান্তরিত হয়েছে। নিজের পছন্দ অনুসারে বিবাহ করব, কেবল এই শপথের জন্য রাজার কন্যা কতখানি কষ্টই না জীবনে বরণ করলেন!

মাইকেলের জীবনে রেবেকা হল প্রথমা নারী। প্রেমের প্রথম অভিজ্ঞতার অমৃতরসে এইভাবে বিশ্বাসের পাত্রটি ভরে উঠল। মাইকেলের সাহিত্যজীবনের প্রথম কাব্য ক্যাপটিভ লেডি; দুঃসহ অভাবের মধ্যে তার জন্ম।

মধুর সর্বশেষ রচনাও একই প্রকার অনটনের মধ্যে রচিত হবে।

মধুসূদন স্বাচ্ছন্দ্যের কবি নন, নন স্বচ্ছলতার শিল্পী। অথচ তাঁর কাব্যে ঐশ্বর্য আর সম্পদের নিত্য ছড়াছড়ি। বিষয়ে ঐশ্বর্য, ভাষায় ঐশ্বর্য, (বিশেষণ ও অলঙ্কার ব্যতীত তিনি কোন কালে বাক্য শেষ করতে পারেন না), ছন্দে ঐশ্বর্য। সম্পদ আর ঐশ্বর্য এই স্বভাব-দরিদ্র কবির আজন্ম ঈপ্সিত ও আমরণ বিলাসকৌতূহল।

'ক্যাপটিভ লেডি'তে ভবিষ্যতের অনেক উপকরণ থেকে গেছে।

এই কাব্যে তিনি চল্‌তি উপকরণের অন্তর থেকে নিজস্ব প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেছেন। বস্তুর অন্তরে বস্তু-অতীত যে সত্তা লুকিয়ে থাকে, তার সন্ধান পেয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলালের কাব্যে বস্তুর বহিঃরূপ আছে, আন্তর রূপ নেই।

এই কাব্যের উপমা-উৎপ্রেক্ষায় পর-নির্ভরতার দৈন্য ঘুচেছে।

ক. Yes,—like that star which, on the wilderness
Of vesty ocean, woos the anxious eye
Of lonely mariner,—and woos to bless,—
For there be hope writ on her brow on high,
He recks not darking waves,—nor fears the lightless sky!

খ. A task which ill beseems the brave
With thoughts as free as ocean-wave!

গ. Go,—ope the por-tals far and wide
And let the overwhelming tide,
Of foe-men like an ocean glide!

ঘ. The very ocean wore his chain.

এই কাব্যে পরবর্তী কাব্যের প্রিয় বিষয়বস্তু ও দুই-একটি প্রিয় অনুষঙ্গ দেখা দিয়েছে।

ক. From proud Himala's realms of snow
To where upon the Ocean-tide
Fair Lunka smiles in beauty's glow
And breathes soft perfumes far and wide—
And sits her like a regal maid

৫. And brathes soft perfumes far and wide
And sits her like a regal maid
In her gay, bridal wreathes array'd !

৭. Or—how to Beauty's lonely bow'r
The false one came at noon-tide hour,
And plucket its brightest—fairest flow'r ;
And on his aery-wheeled car
He wafted her to realms afar—
And how the Wanderer of the wood
Came home—but came to solitude—
And in his grief sought her in vain
O'er mount—in cave—by found—on plain :
But when he knew the cruel hand
That tore her from her sunny Land,
How in the hero's madden'd ire
He swore in words—all breathing fire—
That he would cross the ocean-wave
And make fair Lunka all a grave,
And light a quenchless funeral pile
On the green bosom of that isle—
Incarnadine the very wave
That comes its fairy shore to love !

লঙ্কার সৌন্দর্য ও সীতার মাহাত্ম্য তিনি একাধিকবার বল্‌ছেন। এবং যে-যে প্রসঙ্গ উল্লেখ করছেন, তাই তো তাঁর পরবর্তী অবলম্বন।

তবে লক্ষ করবার এই যে, এখানে রাবণ প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছেন না, প্রধান হলেন রাম। তাঁর অভিযানই কাব্যের অভিযান।

তুলনা করুন The Anglo-Saxon and The Hindu প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে। সেখানে "the faithless Seeta had deserted the arms of her exile-husband, and brought desolations and disaster and woe to the spicy and pearly shores of Lunka. !"

সীতার চরিত্রহনন তিনি করলেন সম্ভবত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের পদাঙ্ক অনুসরণ হেতু। এই জাতের পণ্ডিতদের ভারতবিদ্যা গবেষণাকে বিদ্রূপ করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক যে অসতী, এই সীতার ব্যবহারই তাহার উত্তম প্রমাণ। সীতা যেমন ঘরের বাহির হইল, অমনই অন্য পুরুষ ভজনা করিল। রামকে ত্যাগ করিয়া রাবণের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। নির্বোধ রাম পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।"[২২]

গ. How fondly in the moon-lit bow'r,
When midnight came with star and flow'r,

Young Krishna with his maidens fair
Rov'd joyously and sported there—

Or, on the Jumana's holy stream
Where star-light came to sleep and dream,

From his light skiff, that sped along,
His soft reed breath'd the gayest song,

Which swelling on the fitful sweep
Of the lone night-wind's sigh-so deep—

Wing'd ravishment wheree'r it fell—
Loves accents in her aery spell!

কৃষ্ণ ও রাধার লীলাপ্রসঙ্গ কবির পৃথক একটি কাব্যের সমগ্র পরিসর অধিকার করে বসবে। সেখানে ভাষার ও ছন্দের নবীন রাসলীলা হবে। সমালোচকেরা কেউই সে-যুগে ক্যাপটিভ লেডির যথার্থ মূল্য নির্ণয় করতে পারেন নি—ক্যাপটিভ লেডি কবির শৈশব-লীলার খেলাগৃহ হতে পারে, কিন্তু সেখানেই ভবিষ্যৎ-যুদ্ধের শাণিত অস্ত্র নির্মিত ও রক্ষিত হয়ে আছে।

পূর্বেই জানিয়েছি, কলকাতায় ক্যাপটিভ লেডি সম্বর্ধনা পায় নি; হরকরা প্রশংসা করে নি, হিন্দু ইনটেলিজেন্সার প্রশংসা করে নি, বেথুন দ্ব্যর্থবোধক কথা বলেছেন।

শিক্ষক ডি. এল. আর. কলকাতায় আছেন কিনা, তা তিনি জানতেন না, তাই তাঁকে কোন বই পাঠান নি। তাঁর মতামতও তিনি জানতে পারেন নি। কলকাতায় এই কাব্য যে আদৌ কোন সংবর্ধনা পায় নি, এমন মনে হয় না। ১৮৪৯ সনে প্রকাশিত 'The Muse in India' কাব্যের উৎসর্গপত্রে দেখছি[২২ক]—

And in his 'Captive Ladie', M. S. Dutt.
(I think the pamphlet holds some 80 pages).
Says "life hath its Dreams to beautify" but
"None softer in its store"—Save when it rages.

মধুর কাব্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্রিত। Captive Lady তো একা প্রকাশিত হয় নি, তার সঙ্গে যুক্ত ছিল Visions of the Past। এই কাব্যাংশে কবি ভিন্ন দেশের পুরাণ ব্যবহার করেছেন। তবু বার বার বাংলার শ্যাম জনপদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বা উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। মধুর পক্ষে বিপথগমন স্বভাববিরুদ্ধ।

১. I stood entranc'd
With roof enwoven of green—fragrant leaves.

২. —As when Bangala! On thy sultry plains
Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan—slumberous haunt and cool—
Echo in mimic accents 'mong the flocks.

জীবনানন্দ দাশের অনেক বৎসর পূর্বেই 'বাংলার মুখ' আমরাও 'দেখিয়াছি'—।

কবির মনের মেঘ কেটে গেছে, সে সংবাদ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। তাঁর জীবনতরী ঈপ্সিত ঘাটে এসে ভিড়ছে, সে খবরও আমরা হর্ষভরে জানিয়েছি। কাব্য-বিশ্লেষণে আমরা পাই যে স্বভাষার সঙ্গে বিচ্ছেদ সত্ত্বেও কবিকে স্বগৃহ-অভিমুখী করেছে। ইংরেজী গীতাঞ্জলি কি ভারতবর্ষীয় নয়? এই সময়ে বন্ধু 'নেলরকে উদ্দেশ করে লেখা দু'টি সনেট আমাদের চম্‌কে দেয়। এ কী বিপরীত বক্তব্য!

Richard! there is a grief which few can feel.
It cuts into the bosom's deepest core;
And with unwearied fingers aye doth steal
Its summer gladness, and its faiery store
Of hopes and aspirations.

যে-সমুদ্র অবিরত তরঙ্গময়, সদা অশান্ত, অথচ এই কবিতায় তার বর্ণনা হোল—

The heart is as a tideless sea.

দ্বিতীয় কবিতাটিতেও সেই মসীময় দুঃখের কথা বলা হয়েছে, যার দুঃসহ প্রভাব থেকে পরিত্রাণের জন্য কী ঐকান্তিক চেষ্টা! কিন্তু পরিত্রাণ নেই।

সনেট দু'টি লেখা হয়েছে ২৭-এ জুলাই ১৮৪৯ সনে। বড় আশ্চর্যজনক তারিখটি! প্রথম কাব্যগ্রন্থ ছাপা হয়ে গেছে, মুদ্রাকর পাওনা টাকার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। ক্রমাগত তাগাদা।

প্রায় ঐ সময়ই এক চিঠিতে লিখেছেন—Do you know that I expect to be a father soon? Heigh ho! my stars are brightening.

এর পূর্বের চিঠি জুন মাসে লেখা। কাজেই এ চিঠির কোন তারিখ না থাকলেও অনুমান করা যায় যে, এটি জুলাই মাসেই লেখা হয়েছে। পরম সুখের মুহূর্তে তাঁর বুক থেকে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। বহু পরেও একই রকম ঘটনা দেখব। 'মেঘনাদবধ কাব্য' আর 'আত্মবিলাপ' সমকালীন রচনা।

নিশার স্বপন সুখে সুখী যে—কি সুখ তার!
জাগে সে কাঁদিতে!

কিন্তু আজ তো 'নিশার স্বপন' নয়, বাস্তবের অর্ঘ্য। আজ তো কাঁদবার কথা নয়। প্রতিভাবানের আচরণ ন্যায়শাস্ত্রের সরল অঙ্গুলি ধরে হাটে না।

মধু-রেবেকার দাম্পত্যজীবনের আনন্দমুখর দিনে রচিত হয়েছে রিজিয়া কাব্য-নাট্য। 'ইউরেশিয়ানে'র রিজিয়া আর 'মধু-স্মৃতি'র রিজিয়া কিছু পৃথক;[২৩] তবু রিজিয়া তাঁর প্রিয় চরিত্র। আবার বাংলায় পৃথক নাটক লিখতে চেয়েছিলেন তাঁকে নিয়ে। কিন্তু হায় বাংলা নাট্যমঞ্চ। সেখানে মুসলমান চরিত্র অবিবেচ্য।

ক্যাপটিভ লেডি আর রিজিয়া একই গল্পের দুই রূপ—সংযুক্তা যথার্থ বন্দিনী; আর রিজিয়া দৃশ্যত ভারতসম্রাজ্ঞী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বন্দিনী। প্রেমের কারাগারে বন্দিনী বললে অপূর্ব কবিত্ব করা হয়, কিন্তু প্রেমের কারাগারে নয়, একেবারে বাস্তব হিংসা-দ্বেষের কারাগারে বন্দিনী তিনি। প্রাসাদ-চক্রান্ত, আমীর-ওমরাহের নিরবচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র রিজিয়ার নারী-সত্তাকে পিষে মারার চেষ্টা করেছে। কবি মুক্তির দু'টি জানালা খোলা রেখেছেন—সে জানালা দু'টি শিরিন ও লীলার হৃদয়। লীলা বাংলাদেশের মেয়ে—my melody-voiced Nightingale/from green Bengala's grove! সবকিছু ফেলে এই ব্যক্তি বাংলায় ফিরে আসবেন না তো কে আসবে!

শিরিন গেয়েছে ভালবাসার গান, সেখানে সাদীর ছায়াপাত ঘটেছে। পূর্বেও সাদীর ছায়া মধু অনুগমন করেছিলেন।

লীলার ভাষণে যে বঙ্গ-প্রশস্তি আছে, তা প্রবাসী মধুরই প্রশস্তি।

My Land of palmiest grave—and bluest stream.

বাংলার মাটি থেকে পা তুলে নিয়েই মধু বাংলার মাটির দাম বুঝেছেন। গোবৎস এক স্তন্যবৃন্ত থেকে আর এক বৃন্তে স্থানান্তরিত হলে মাতার পরিত্যক্ত স্তন্যের বোঁটায় দুগ্ধক্ষরণ ঘটে। লীলার প্রথম গানে বাংলার একটি লোকাচার বর্ণিত হয়েছে—গঙ্গায় প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়ে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে আছে তরুণী। দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া অবধি যদি ঐ প্রদীপ জলতে থাকে, তবে সে নিশ্চিত আসবে, নিশ্চিত ফিরবে সে!

যুদ্ধ-বিগ্রহ-ষড়যন্ত্র-হত্যা-বিশ্বাসঘাতকতা! শ্বাসরোধকারী পরিবেশে জলছে এমন নির্ভরতার দীপশিখা!

লীলার মুখের একটি গানে মুসলমান বাহিনী-কর্তৃক দিল্লী বিজয়ের প্রসঙ্গ আছে। বন্দিনী সংযুক্তার সংবাদও পেলাম।

He sought-but fought in vain for Beauty's loveliest flow'r!

লীলার সর্বশেষ গানে স্থান পেয়েছে পুরুর প্রসঙ্গ। 'King Porus' নামে মধুর একটি স্বতন্ত্র কবিতা আছে; এখানে তিনিই এসেছেন 'Brave King Porus' হয়ে। নাট্যকার বলছেন,

> "It is a lay of Eld,
> Wave by a youthful Minstrel of my land—
> Of green Bengala—"

নিজেই তাঁর পূর্বতন কবিতার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। মধুর সাহিত্যজীবনে এটা একটা সাধারণ ধর্ম। তিনি একই কথাবস্তু বারবার ব্যবহার করেন, যতক্ষণ না তার শেষ রহস্যটি উদ্ঘাটিত হয়। একই বর্ণনা, একই অলঙ্কার বহুবার ব্যবহার করেন; ঘর্ষণে-বর্ষণে তাদের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। রিজিয়া নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেন—

> Why should'st thou fear?
> Earth hath no glory brighter than thine own!
> (Sc. vii)

দ্বিতীয় ক্রীতদাস বলেছে—

She had the manliest heart—
Tho' a woman. (Sc. viii)

এ সকল উক্তিই কমবেশি তাঁর প্রমীলা ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর একাধিক নায়িকাদের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। বৃক্ষের উপমা বাংলা কাব্যে বহু-প্রচলিত; কিন্তু বিরাট সু-উচ্চ বৃক্ষ মধুর কাব্যে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে—

I sat beneath a towering trees
In yon wide wood! It was a stately tree,
But wither'd and all naked as the mast
Of some tall ship, lefl to the surging wrath
Of storms and ocean-waves— (Sc. ix)

'এ্যাংলো-স্যাক্সন'-এও এই উপমাটি আছে।

বাংলার উন্নত বৃক্ষের উপর ঝাপ্‌টে পড়ছে মাদ্রাজের উদার সমুদ্র-অনুষঙ্গ।

॥ ৪ ॥

নতুন দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান এসেছে। মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির গভর্নর মহোদয়েরা ২১-এ জানুয়ারি এক প্রস্তাব নিয়ে মিঃ এইচ. বাওয়ার্সের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন, আর মধুসূদনকে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করলেন।[২৩ক]

"The Board have unanimously elected Mr Dutt, a Native of Calcutta educated at the Hindu College, and subsequently at Bishop's College, to supply his place. This gentle man's attainments, as well in classical as in English literature, are of a distinguished quality and although a young man he has already had considerable experience in tuition.

Sd. George Norton.
Jas. Ouchterlony.
John Bruce Norton.

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, মিঃ জর্জ নর্টন ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী; তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। অক্টরলোনী জানতেন মধুর রচনাশক্তি ও

MADRAS UNIVERSITY.

President

GEORGE NORTON ESQ

Governors

[illegible] ESQ | [illegible] ANANDUM ESQ

[illegible] NORTON ESQ

Secretary

A. J. ARBUTHNOT ESQ.

—

[illegible]	E. B. POWELL ESQ
[illegible]	A. A. GORDON ESQ
[illegible] MR G. G. WHITE	[illegible] MR J. M. FISH
[illegible] M. DUTT	[illegible] F. B. FELLIN

[illegible] MR F. I. JOHNSON

[illegible] VIJIARUNGA MOODELY	Interpreter
GUNNISH GUNGADER SASTRY	Mahratta Pundit
VIZAGAPERMAUL IYER	Tamil [illegible]
SIRLEENEVASSA RAGAVA CHARRY	Do. [illegible]
[illegible] CHINNIAH SOOREE	Telugu Pundits
HYAGREEVA SASTRY	

মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির পরিচালক ও শিক্ষকমণ্ডলীতে মধুসূদন

ব্যক্তিত্বের মাধুর্য। মিঃ জন ক্রস নর্টনও মধুর যোগ্যতা সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না। অতএব চাকরী হোল—ছেচল্লিশ টাকা থেকে এক লাফে দেড় শত টাকা বেতন ; তদুপরি সেরা শিক্ষায়তনের চাকরী।

তাঁর নতুন কাজে যোগদানের সময় 'মেল অরফ্যান এ্যাসাইলামের' স্কুলে ভীষণ অশান্তি শুরু হয়েছে। এ্যাসাইলামের চেয়ারম্যান রেভরেণ্ড টেলার মোটা মাহিনা দিয়ে একজন ইংরেজ সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করেছিলেন। খাস ইংরেজ মিসট্রেস বা শিক্ষিকাও বেশি বেতন দিয়ে নিয়োগ করা হোল। রেভারেণ্ড হেনরি টেলার অনেকগুলি খারাপ অভিযোগ উথাপন করেছিলেন। সেই সব অভিযোগের জবাব দিয়ে ৪০ পাতার এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ; অবশ্য ঐ পুস্তিকায় বার্ষিক কার্যবিবরণীও স্থান পেয়েছিল।[২৪] ক্রিসেন্ট ও মাদ্রাজ একজামিনার ঐ পুস্তিকার বক্তব্যের সঙ্গে ঐক্যমত ঘোষণা করল।[২৫]

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনে পাদ্রী টেলার এক জনসভা আহ্বান করলেন ; সেখানে তিনি মেল অরফ্যান এ্যাসাইলামের স্কুল পরিচালনার যাবতীয় দোষ-ত্রুটি সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দিলেন। তাঁর অভিযোগ এইরূপ :—বালক-বালিকাদের নৈতিক মান একেবারে অবহেলা করা হয়েছে ; লেখাপড়াও বিশেষ কিছু শেখান হয় নি। ব্যাকরণ ও গণিত, এমন কি বানানশিক্ষা অবহেলিত হয়েছে।[২৬]

১৮৫০-৫২ সন। বাঙ্গালা দেশের সামাজিক জীবনে তখনও তেমন কোন কোলাহল শুরু হয় নি। রামমোহন-উত্তর যুগের বাংলার সমাজজীবনে সর্বাধিক আলোড়ন-সৃষ্টিকারী ব্যক্তিপুরুষ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি তখনও রণক্ষেত্রে যোদ্ধার বেশে আবির্ভূত হন নি।

কলকাতায় তখন সবে বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর বাল্য-বন্ধুদের মধ্যে অনেকে, যথা আবদুল লতিফ, বেণীমাধব বসু, গৌরদাস বসাক, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, জগদীশনাথ রায় ও বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সেই বিতর্কিত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এই সভার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং সভার পঠিতব্য প্রবন্ধাদির নির্বাচক ছিলেন। ঠিক একই সময়ে বোম্বাই-এ

ছাত্ররা সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমিতি গঠন করেছে—মহারাষ্ট্র জ্ঞান (Dnyan) প্রচারক সভা (Subha), গুজরাটী জ্ঞান প্রচারক মণ্ডলী নামে দুইটি সভা গঠিত হয়েছে। দাদাভাই নৌরাজী ও জগন্নাথ শংকরশেট এর উদ্যোক্তা।

কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ—সর্বত্র একই সময়ে মধ্যবিত্তসমাজ জন্মলাভ করেছে। তাদের মুখে নতুন ভাষা; সেই ভাষায় উচ্চারিত হচ্ছে নতুন নতুন দাবী ও ইচ্ছার কথা।

মধুর সময়ে মাদ্রাজে ৫টি সভার নাম পাওয়া যায়।[২৭]

1. Young men's Literary Society.
2. Hindoo Reading Room.
3. Vepery Mutual Improvement Society.
4. Madras Hindoo Debating Society.
5. Native Progressive Seminary.

মধুও এই সব সভাসমিতি সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন। বলা বাহুল্য, কোন-কোনটির পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি যে-সব প্রবন্ধ লেখেন, তার থেকে তাঁর সহানুভূতি কোন দিকে তা স্পষ্ট বুঝা যেত।

হিন্দু ক্রনিকল ১৮৫০ সনে প্রকাশিত হয়; মাদ্রাজে যেহেতু তার কোন ফাইল অলভ্য, তাই কোন্ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল বলা যাবে না। ১৮৫০ সনে যে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রমাণ ১৮৫১ সনের Madras Almanac-এ[২৮] তার নাম পাওয়া যাচ্ছে। তখন প্রকাশক ছিলেন ইউরে-শিয়ানের প্রকাশক সিমকিন্‌স এণ্ড কোম্পানী (Simkins & Co.); ৪২নং মাউন্ট রোডে এ্যাডভারটাইজার প্রেসে ছাপা হয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার বেরুত। ১৮৫২ সনের Almanac-এ দেখছি যে, প্রকাশক বদলে গেছে—তখন প্রকাশক হয়েছেন C. M. Pereyra. পেরেরাদের আরও দু'খানা কাগজ ছিল। ৬১নং আর্মেনিয়ান প্রেসে ছাপা হোত। প্রেসও বদলে গেছে। নতুন মালিক সপ্তাহে দু'বার পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ১৮৫২ সনে জুলাইতে পত্রিকাটির প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। Madras Examiner ৩রা আগস্ট তারিখে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই কারণে দুঃখ প্রকাশ করেছে। সাংবাদিক মহাশয় বলেছেন যে, এই পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁদের যে বিশেষ ঔৎসুক্য আছে, তার কারণ এই পত্রিকার প্রাক্তন সাংবাদিককে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন—"personal regard for the former

editor and admiraton of the splendid talents which obtained for it "a local habitation and a name", a name which we lament to state it is now rapidly losing." মধু সম্ভবত ১৮৫২ সনের মার্চের গোড়ার দিকে এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার ত্যাগ করেন। কারণ ইউনাইটেড সার্ভিস গেজেটের ২৩-এ মার্চের সংখ্যায় লেখা হয়েছে—"We notice with regret the retirement of Mr. Dutt from Editorial charge of the Hindu Chronicle. He is one of the most pleasing writers in India, and although a Hindu by birth is completely a European in sentiment and information"[২৯]. মার্চ মাসে মধুসূদন সম্পাদনার ভার ত্যাগ করেন; তারপর জুলাই পর্যন্ত পত্রিকাটি কোনমতে টিকে থাকে। সম্পাদক মধুর প্রশংসা করে মাদ্রাজ এক-জামিনারও সম্পাদকীয় লিখেছিলেন।[৩০]

১৮৫০ সনে মধুর লেখা কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নি। ১৮৫১ সনের লেখা দু'টি প্রবন্ধ পাওয়া গেছে; ১৮৫২ সনের লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইগুলি বিশ্লেষণ করলে বুঝা যাবে যে, মধুর সমাজ-জিজ্ঞাসা কোন্ পথে মীমাংসা খুঁজছে।

১৮৫১ সনে গজালু লক্ষ্মী নারসু চেট্টীর 'ক্রিসেন্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ বাগাড়ম্বরের প্রতিবাদে তিনি একটি প্রবন্ধে লেখেন:

"The Crescent, we perceive, has managed to delude the Friend of India, Father John, as they of Calcutta reverentially call him, into the belief of that the Dravida Hindus, that is to say, the people of this country, may allow their women to form matrimonial connections if deserted by their husbands; but they do not. Now, we beg leave to assure the Friend that the fundamental laws of Hinduism are the same whereever it is professed; and that the passage cited by the Crescent as permitting wives whose husbands degrade themselves by apostacy, to remarry is obsolete, and does not apply to this age—the Kali.Yogum. We took the earliest opportunity to draw the attention of the Crescent

to the ridiculous blunder and we have since heard that the twice-born editor of the Vurtamane Tarangini, a Telegu journal has been condemning the Crescent rather bitterly for his ignorance of the customs and manners of those whose cause he has undertaken to advocate—for a consideration of course. We entreat the Friend never to attach much weight to what the Crescent says about such matters. Our local contemporary amusing enough when club in hand, he talks for like a superannuated Hercules, to demolish the poor missionaries and their converts, but as for being instructive he is seldom guilty of that."

মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও হিন্দু নারীর দুরবস্থা ও তার সম্পত্তি অধিকারের উপরে রচিত। এখানেও ক্রিসেন্টের সঙ্গে তাঁর তর্ক চলে।

"Those who impunge Justice Burton's judgment have yet to show that the shastras as well as the manners and customs of the Hindu unanimously recognise the existence of seperate rights as regards a Hindu wife. The solitary verse quoted from Menu by the Crescent won't do."

প্রবন্ধে অতঃপর মেয়েদের স্বামী-আনুগত্যের প্রসঙ্গ বিস্তৃত করে বলা হয়েছে।

বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীর সম্পত্তি-অধিকার—এ দু'টি প্রশ্নে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গেই সরব হয়েছেন। এমন কি বহুবিবাহের বিষয়েও তিনি একত্রে কথা বলেছেন। ইয়ং বেঙ্গলের একজন যোগ্য প্রতিনিধির মত বেঙ্গল স্পেকটেটরের বক্তব্যের তিনি প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন মাদ্রাজে। ১৮৫১ সনে ডিসেম্বর মাসে তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি মাদ্রাজ একজামিনারে (১৮৫২, ২ জানুয়ারি) উদ্ধৃত হয়। মধু হিন্দুদের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করে বলেছেন, বহুবিবাহ এর জন্য দায়ী। বেদনার ব্যক্তিগত ইতিহাস মধু তাঁর জীবনে কখনও মুখ ফুটে বলতেন না; এই প্রবন্ধের বকলমে তার প্রকাশ ঘটল। তিনি বলছেন, শুধু বহুবিবাহ নয়, বিবাহের ব্যাপারে পিতার অতি-প্রভুত্ব হিন্দু সমাজকে

ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। হিন্দু বালক সূচনায় সত্যি খুব বুদ্ধিদীপ্ত; তারপরে ধীরে ধীরে সে কেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আর বহু স্ত্রী থাকার ফলে তার সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। শেষপর্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতায় সে বিকৃত ও বিভ্রান্ত হয়।

মধুর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হোল মাদ্রাজে 'Emigration Society'-র কার্যকলাপ ও বক্তব্যের সমালোচনা। জীবনীকারেরা কেউ-কেউ রায় দিয়েছেন যে, মধু বিধর্মী ও মধুর অন্তর বিজাতীয় ভাবনায় কলুষিত। তাঁদের বক্তব্যের ভুল কোথায়, এ প্রবন্ধটি তা ধরে দেবে। তাঁর সোজাসুজি প্রশ্ন, খ্রীস্টানদের স্বদেশ ছেড়ে চলে যাবার কি কারণ ঘটেছে? এদেশে যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান সকলের স্থান হয়ে থাকে, তবে তাদেরই বা স্থান হবে না কেন? পরিশেষে তিনি গভীর আবেগের সঙ্গে লিখলেন, "Has India, our good old Mother, really grown too weak to nurse those, her latest born?"[৩১] এমন সর্বভারতীয় বক্তব্য আর কেউ সে-যুগে তুলে ধরতে পারেন নি—সম্ভবত রামমোহনও নন।

তৃতীয়টি আরও আশ্চর্যজনক। পড়লে বুঝা যায় যে, এই প্রবন্ধের লেখকই Rizia লিখতে পারেন, যে-রিজিয়া 'Inde'-এর সম্রাজ্ঞী বলে গর্ববোধ করেছেন। বহিরাগতা ঠাউরান নি নিজেকে।

বন্দিনীর দশায় বীরশ্রেষ্ঠ রুস্তমের কাহিনী নয়, তিনি শুনেছেন পরাজিত অথচ গরীয়ান পুরুর কাহিনী। মধু পরবর্তী কালে কারবালা-যুদ্ধ অবলম্বনে পৃথক মহাকাব্য লিখতে চেয়েছিলেন, মুসলমান-জীবন অবলম্বনে নাটক লিখতে চেয়েছিলেন। সে-যুগের অন্ধ সংস্কার তাঁর লেখনীকে শাসন করেছিল।

মধু এইবার ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে মুসলমান শাসনের এক তুলনা করে বসলেন; মুসলমান রাজত্বের সুখ্যাতি করে ফেললেন। তিনি বললেন, মুসলমান যুগে ভারতে প্রভূত-ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছিল, প্রভূত সম্পদ সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সুখের ব্যাপার সেই সব সম্পদ দেশেই রক্ষিত হয়েছিল। "India under the Moslem rule was more prosperous than under Leadenhall rule."[৩১ক] (পরিশিষ্ট—২)

মাদ্রাজে বসে এই কথা বলা! পবিত্র ব্রিটিশ শাসনের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করা! একেবারে ভীমরুলের চাকে গিয়ে ঢিল পড়ল। এথেনিয়াম লিখল, যে মুখে প্রবন্ধকার মুসলমান শাসনের প্রশংসা করছেন, আবার সেই মুখে কর্ণাটের

সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা নতুন যুগের বাণী নয়। ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সের জন্য শুধু নয়। সারা বিশ্বে উদারতার বাণী—মানববাদ ছড়িয়ে পড়ছে। মাদ্রাজেও তার আঁচ লেগেছে—সঙ্গতভাবেই লেগেছে।

কিন্তু পূর্বে ইউনিভারসিটিতে ছাত্রভর্তি নিয়ে তুমুল গণ্ডগোল হয়। মাদ্রাজ ইউনিভারসিটির গঠনতন্ত্রের ৫নং ধারায় ছিল "members of all creeds and sects shall he admissible, consistently with which primary object, care shall be taken to avoid whatever may tend to violate or offend the religious feelings of any class."[৩৮] এই ধারার বলে মাদ্রাজ মেডিকাল স্কুল থেকে 'ট্রান্সফার' নিয়ে একটি ছাত্র ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়। ছাত্রটি ছিল পড়িয়া বা অচ্ছুৎ।

শহরে খুব উত্তেজনা দেখা দিল। ইউনিভারসিটির পর্ষৎ এ-বিষয়ে প্রথমে গুরুত্ব দেয় নি, কিন্তু ক্রমশ উত্তেজনা বাড়তে লাগল। অভিভাবকেরা আবেদন করলেন। দু'জন পর্ষদ সদস্য রঙ্গনাথম্ শাস্ত্রী ও শ্রীনিবাস পিল্লে পদত্যাগ করলেন ইউনিভারসিটির পরিচালক সভা থেকে। শেষোক্ত ব্যক্তি পাচাইয়াপ্পা বিদ্যালয়েরও সভাপতি ছিলেন। এঁদের পদত্যাগে সভার কোরাম হোত না। পিল্লে, চেট্টি, সুব্রহ্মণ্যম উপাধিধারী ছাত্ররা স্কুল ত্যাগ করতে লাগল।

মধুসূদন মাদ্রাজে অত্যন্ত বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন। দেশী-বিদেশী উভয় মহলে তাঁর বন্ধু ও শত্রু সমান সংখ্যায় ছিল।

তামিল ও তেলেগু ভাষীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগছিল। পূর্বেই বলেছি, বেঙ্কট রয়লু নাইডু ও গজালু লক্ষ্মী নারসু চেট্টি উভয়ে দু'টি পত্রিকা চালাতেন। এঁরা ইংরেজদের সঙ্গে সর্বপ্রকার অসহযোগিতা চাইতেন—এটা কত আন্তরিক তা বোঝা মুশকিল।

মাদ্রাজের ইংরেজ সমাজের একাংশ মধুসূদনকে বিবেচক মনে করতেন। একবার যা ঘটেছিল, তা সংক্ষেপে বলছি। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ-এর মেয়াদ বৃদ্ধির তারিখ এসে গেছে। মাদ্রাজের হিন্দু ডিবেটিং সোসাইটি এ ব্যাপারে দেশীয়দের কতকগুলি দাবি-দাওয়া সংবলিত একটি স্মারকলিপি রচনার দায়িত্ব নিল। একটি সভাও ডাকা হোল; সভায় দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনাকালে যে-মনোভাব প্রকাশ পেল, তাতে সমিতির সভাপতি মিঃ স্যালমন প্রমাদ গণলেন। স্যালমন ছিলেন নামজাদা ব্যারিস্টার। তিনি পদত্যাগ করে বসলেন।

মাদ্রাজ নেটিব এসোসিয়েশনও এগিয়ে এল ; তারাও একটি স্মারকলিপি তৈরী করতে লাগল।

এই সময়ে এথেনিয়াম পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে বলা হোল, দেশীয়রা ইউরোপীয়দের সঙ্গে সহযোগিতা করলে দেশদ্রোহিতা হয় না। 'রাইজিং সান'-এর সম্পাদক বেঙ্কট রয়লু নাইডুর প্রসঙ্গ টেনে এনে বলা হোল, তিনি বিরোধিতার পথ বেছে নিয়েছেন। অথচ মাদ্রাজের বর্তমান অবস্থায় সহযোগিতার পথ বাতিলযোগ্য নয়। তখন উঠল মধুসূদনের কথা।

"We have also had an example of a newspaper editor possessing real original ability, and a considerable share of selfreliance in the person of Mr. Dutt."[৩৯] এই থেকে বোঝা গেল যে, মধুসূদন কবি হতে চাইলেও সমাজ-সংসার সম্বন্ধে উদাসীন বা যোগী পুরুষ ছিলেন না।

মধুসূদন মার্চ মাসে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। মাদ্রাজের এথেনিয়াম পত্রিকার ৯ই মার্চ (১৮৫২ সন)-এর একটি সংবাদ উদ্ধৃত করে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া জানাচ্ছে যে, হিন্দু ক্রনিকলের সম্পাদক শীঘ্রই সম্পাদনাভার ত্যাগ করছেন। "Mr. Dutt has been appointed a teacher in the grammar school and his superiors fear that the editing of a journal might interfere with his educational duties ; there is, however, a doubt whether this idea will be acted upon and we sincerely hope the Governors of the iustitution will think better of their resolve as the tone and matter of the Hindoo Chronicle afford the brightest promise for the future Native Press of Madras".[৪০] এসব উপদেশ বা অনুরোধ কেউ শোনেন নি ; মধু বিদায় নিলেন। বিদায়সূচক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন ; নতুন সম্পাদক এলেন। তিনি লিখলেন—আমার পূর্ববর্তী সম্পাদক খুবই সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন ; তিনি এই পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তাঁর পদাংক আমরা অনুসরণ করব। "We are not behind him in honesty of purpose, in the will and desire to please."[৪১]

দেশীয় সাংবাদিক বলতে তিনি কার্যত একা ; ইউরোপীয়দের মধ্যেও তাঁর

সমকক্ষ কোন সাংবাদিক ছিলেন না। এই জীবিকা থেকে তিনি বিদায় গ্রহণে বাধ্য হলেন। মার্চ মাসে তিনি নতুন চাকরীতে যোগ দিলেন। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ আয়ার বার্টন পাওয়েল, কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার; গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করতেন। অপরাপর অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন মিঃ এ. গর্ডন; তিনি পড়াতেন ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র; মিঃ এইচ. বাওয়ার্স ছিলেন ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজী রচনার অধ্যাপক। তা ছাড়া ছয়জন 'টিউটর' ছিলেন—মিঃ জি. জি. হোয়াইট, মিঃ এম. দত্ত, মিঃ টি. বি. পেপিন, মিঃ জে. নেলর, থীরু বেঙ্কট নাইডু, এ. নারায়ণ রাও। ১৮৫৫ সনের শিক্ষাবর্ষের পূর্ব পর্যন্ত এই শিক্ষকমণ্ডলী (Teaching staff) অপরিবর্তিত থাকবে। (পরিশিষ্ট-৩)

১৮৫৫ সনে প্রথম টিউটর পদত্যাগ করে চলে যান। তিনি ভেপেরী সেন্ট পল স্কুলের অধ্যক্ষ হন। তাঁর স্থলে মিঃ জে. এস. জেনকিনস্ নিযুক্ত হন।[৪২]

পূর্ব থেকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি অধ্যাপক পদ মঞ্জুর ছিল; দু'টি পদেই লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এবার তৃতীয় একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হোল। মধুসূদন ভেবেছিলেন, ও পদটি তাঁকে দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁকে দেওয়া হোল না। যে ভদ্রলোক দু'বৎসর আগে টিউটরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকেই ঐ পদে ডেকে বসান হোল।

অথচ শুভানুধ্যায়ীদের সংখ্যা কম নেই। কিন্তু সামাজিক শক্তি ব্যক্তি-বিশেষের সামর্থ্য থেকে অনেক প্রভাবশালী। মধুর এখানে পদোন্নতির কোন আশা নেই।

মধুর প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন মিঃ জর্জ নর্টন। সরকারী মহলে তাঁর প্রভাব ছিল অসাধারণ। ১৮৫১ সনে তাঁর অবসর গ্রহণে মধুর প্রকৃত সহায় অন্তর্হিত হলেন। ১৮৫১ সনে ১২ এপ্রিল মাদ্রাজ হাইস্কুলে জর্জ নর্টনকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান হোল।[৪৩]

অপর সদস্যদ্বয় অক্টরলোনী এবং জন ব্রুস নর্টন মধুকে জানতেন। কিন্তু তাঁরা উভয়ে ঝুঁকি নিয়ে কিছু করার বিরোধী ছিলেন। গোঁড়া মিশনারীরা মধুর উপর বিরক্ত, উপরন্তু রক্ষণশীল দক্ষিণী সম্প্রদায়ও মধুর প্রতি অনুকূল ছিলেন না। জন ব্রুস নর্টন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম-নিরপেক্ষ চরিত্রটি বিনষ্ট করার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি রক্ষণশীল দক্ষিণীদের সঙ্গে কলহে অবতীর্ণ হতে চান নি।

ROUTINE OF STUDIES OF THE HIGH SCHOOL.

[illegible] of Teachers, including a Pupil teacher. 7

Mr G G White,	1st Tutor
„ M Dutt,	2d do
„ T B Peppin,	3d do
„ J Nailer,	4th do
C. Terooveengadum Naidoo	5th do.
„ G Lane,	6th do
„ T F Johnson	*Writing Master*

No of Scholars 179

Teachers.	*Subjects.*	*Books*	*Remarks*
	5th Class—[illegible] Boys.		
Mr G G White,	Reading, History, Poetry, Geography Arithmetic, Elements of Composition,	Murray's English Reader Pinnock's Goldsmith's History of England Calcutta Poetical Reader No III Symonds Geography of India	
Teroovengadum Naidoo,	Euclid, Algebra,	Williams' Symbolical Euclid Pinnock's Algebra, Part II	
Mr T F Johnson,	Copy Writing		
	4th Class—[illegible] Boys.		
Mr G G White,	Geography Arithmetic,	Symonds' Geography of India	
Mr M Dutt,	Reading, History, Poetry, Elements of Composition,	Murray's English Reader. Pinnock's Goldsmith's History of England Calcutta Poetical Reader, No. III	
Teroovengadum Naidoo,	Euclid, Algebra	Williams' Symbolical Euclid Pinnock's Algebra, Part I	
Mr T F. Johnson,	Copy Writing,		
	3d Class—[illegible] Boys.		
Mr M Dutt,	Poetry, Geography,	Gay's Fables, Goldsmith's Grammar of Geography.	
Mr T B Peppin	Reading and Spelling, History, Grammar, Arithmetic, Writing from Dictation,	Pinnock's Roman History do. Murray's Abridged Grammar Bonnycastle's Arithmetic.	
Mr T F. Johnson,	Copy Writing		
	2d Class. Division B—[illegible] Boys.		
Mr J Nailer,	Reading and Spelling Writing from Dictation Poetry, Geography, History, Grammar, Arithmetic,	Pinnock's Roman History Gay's Fables Goldsmith's Grammar of Geography Pinnock's Roman History Murray's Abridged Grammar Bonnycastle's Arithmetic	
[illegible] T F Johnson,	Copy Writing.		
	2d Class. Division A—[illegible] Boys.		
[illegible] M Dutt,	Poetry, Geography,	Gay's Fables. Goldsmith's Grammar of Geography	
[illegible] T B. Peppin,	Writing from Dictation, Reading and Spelling, History,	Pinnock's Roman History. do	
Teroovengadum Naidoo,	Grammar, Arithmetic,	Murray's Abridged Grammar Bonnycastle's Arithmetic	
[illegible] T F Johnson,	Copy Writing		
	1st Class. Division B—[illegible] Boys.		
[illegible] G Lane	Reading and Spelling, History, Grammar, Geography, Arithmetic,	History of Greece do. Principles of Grammar Pinnock's Catechism of Geography	
Mr T F Johnson,	Copy Writing,		
	1st Class. Division A—[illegible] Boys.		
A Normal Pupil	Reading and Spelling, History, Grammar, Geography, Arithmetic,	History of Greece do. Principles of Grammar Pinnock's Catechism of Geography	
Mr T. F. Johnson	Copy Writing,		

Mr. Lane takes division B for one fortnight, and then division A. for the next. The object of this arrangement is to prevent either division suffering [illegible] from a want of experience on the part of the Normal Pupil

April [illegible], 1853.

মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে মধুসূদনের 'ক্লাস রুটিন'

মধু সর্বোচ্চ শ্রেণী (4th class) থেকে তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াতেন। তিনি ইতিহাস ও কবিতা পড়াতেন; রচনা শিক্ষা দিতেন। যে সব বই পড়াতেন, তার মধ্যে ছিল মারের ইংলিস রীডার, গোল্ডস্মিথের হিস্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড, ক্যালকাটা পোয়েট্রিক্যাল রীডার নাম্বার থ্রি। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াতেন কবিতা ও ভূগোল; দ্বিতীয় শ্রেণীতেও কবিতা-ভূগোল।

মধুর শিক্ষকজীবনে কবিতা ও ভূগোলের সহাবস্থান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর দানে বাংলা কাব্য-জগতের পরিধি বহুগুণ বেড়ে যাবে।

বাৎসরিক পরীক্ষায় ছেলেরা উন্নতমানের পরিচয় দেয়। ১৮৫৩ সনে বহিঃ-পরীক্ষক (External Examiner) ছিলেন মাদ্রাজের এ্যাডভোকেট জেনারেল এডওয়ার্ড স্যালমন। ছাত্রদের পরীক্ষা করে তিনি যে রিপোর্ট দেন, তা তুলে দেওয়া গেল। তিনি শেক্সপীয়র বিষয়ে বিশেষ করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

"Speaking generally, I should say that the language is better and more English than any that I have yet seen—it is freer from pretension and those unmeaning ambitious phrases which are the besetting sin of the English composition of the Natives."[৪৪]

মাদ্রাজ একজামিনারে শিক্ষা-বিষয়ে হিন্দু ক্রনিকলের একটি সম্পাদকীয় উদ্ধৃত হয়। ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয় যে, "The public authorities must remain firm in their resolution to give education to all classes, sects, & creeds, who are otherwise qualified to receive it." শুধু শিক্ষক নন, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর উদার চেতনা ছিল।

কলকাতার হিন্দু কলেজের নজির টেনে তিনি লিখলেন যে, সেখানে তাঁতী-তেলীর ছেলেরা চাটুজ্যে-মুখুজ্যের ছেলেদের পাশে বসে দিব্যি লেখাপড়া করে। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে নতুন যে-সংস্কার হোল তাতেও সব জাতের ছাত্রকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কই তাতেও তো বাংলাদেশে কোন সোরগোল হয় নি?[৪৫] মধু সাংবাদিকবৃত্তিতেও শিক্ষকসুলভ।

মধুসূদন অতি-হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধে লিখে মাদ্রাজে তথাকথিত জাতীয়তা-বাদী মাদ্রাজীদের বিরূপতা অর্জন করেন। মাদ্রাজী ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ২৮-এ

আগস্ট এই নিয়ে সাময়িক পত্রিকায় এক কড়া প্রবন্ধ লেখেন। মধুসূদন অতি-খ্রীস্টানী প্রবণতারও ছিলেন বিরুদ্ধাচারী। তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু তিনি স্বজাতিদ্বেষী বা স্বধর্মদ্বেষীও ছিলেন না। 'সার্কু-লেটার' পত্রিকার সঙ্গে একবার তাঁর এই নিয়ে বিরোধ হোল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, আমরা যে-সমাজে জন্মেছি তার নৈতিক দৃষ্টিকোণ (moral point of view) খ্রীস্টীয় সমাজ থেকে হীনতর ছিল, একথা মানি না। তবে হিন্দু সমাজের প্রভূত উন্নতিসাধনের অবকাশ রয়েছে।

হিন্দু সমাজের দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন, কিন্তু হতাশ হন নি। "The Hindu mind though crushed by a false faith and a cruel system of moral tyranny is still as a lamp dim but with life in it.[৪৬] অবশ্য তাঁর এই অভিমত সব খ্রীস্টানী পত্রিকায় সমালোচিত হয়েছিল। ইস্টার্ন গার্ডিয়ান ১০ই মে ১৮৫১ সনে লিখেছিল —"By what process of understanding the editor of Hindu Chronicle ever became a convert to the Christian religion, it will not be easy for us to say if this most obvious evidence of the superiority of the Christian religion over the Hindu creed of reforming the morale of a community and stamping society with at least an outward respect for Good and Virtue be excluded from all sphere in his conversion".[৪৭]

১৮৫৫ সনে ১৭ই আগস্ট মাদ্রাজে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটল। উডের সুসমাচার (Wood's Despatch, 1854) অনুযায়ী ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠিত হোল; কয়েকজন স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোল। প্রেসিডেন্সী কলেজে দু'টি বিভাগ খোলা হোল—সিনিয়র ডিপার্টমেন্ট ও জুনিয়ার ডিপার্টমেন্ট। এছাড়া একটি প্রাইমারী স্কুল ও একটি নর্মাল স্কুল খোলা হয়। বিভিন্ন জেলায়, যথা— কোয়েম্বাটর, কালিকট, বেলারী, রাজমহেন্দ্রী, কুড্ডালোরে স্কুল খোলা হল।

কোথাও কোন সম্মানজনক পদ মধু পেলেন না। অথচ জর্জ নর্টন তাঁকে কত আশ্বাসই না দিয়েছিলেন!

মিঃ এ. জে. আরবুথনট শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার হিসাবে যোগ দিলেন।[৪৮]

মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির সিনিয়র ডিপার্টমেন্ট কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের আদর্শে গঠিত হবে, ১২ই মার্চ এই মর্মে একটি সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোল।[৪৯]

তারপর শুরু হোল ঐ প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপদানের চেষ্টা। মধুসূদন শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে ছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি সুবিচার করবেন। ১৮৫৪ সনে অক্টোবর মাসে যখন বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে, তখনও দেখতে পাই মধুসূদন ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা নিচ্ছেন।[৫০] সেদিনও তাঁকে মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির হাইস্কুল বিভাগের দ্বিতীয় টিউটর পদে অধিষ্ঠিত দেখতে পাই। ১৮৫৫ সনের ৩০-এ এপ্রিল নতুন রদবদলের ফলে থিরু বেঙ্কটম নাইডু কলেজ বিভাগে অস্থায়ী-ভাবে উন্নীত হয়েছেন, কিন্তু মধুসূদন স্কুল ডিপার্টমেন্টের সেই দ্বিতীয় শিক্ষক পদেই অধিষ্ঠিত। তাঁর আর কোন পরিবর্তন নেই। প্রাদেশিকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি এই নির্বাচনের পিছনে একটা বড় রকমের প্রভাব ফেলেছিল; মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনিবাহক কমিটিতে দেশীয় সদস্য ছিলেন দু'-জন; সি. শ্রীনিবাস পিল্লে এবং সি. রঙ্গনাথম। উভয়েই ইংরেজী শিক্ষার প্রবল সমর্থক; কিন্তু তাঁরা সমর্থক ছিলেন এই হেতু যে ইংরেজী হোল রাজার ভাষা এবং লোভনীয় চাকুরীর প্রবেশপত্র।

ইংরেজী শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষায় পরিণত হতে দিতে তাঁদের আপত্তি ছিল। কলকাতায় যেমন ছিল রাধাকান্ত দেব মহাশয়দের আপত্তি। সে-যুগের মাদ্রাজে সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী দেশীয় ব্যক্তি ছিলেন পুলিশ রাঘবাচারী। তিনি ছিলেন শহর কোতোয়াল; তাই নামের আগে 'পুলিশ' শব্দটি সগর্বে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পাচাইয়াপ্‌পা বিদ্যালয়ের সভাপতি ও ট্রাস্টি। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক সদস্য শ্রীযুক্ত পিল্লেও ছিলেন পাচাইয়াপ্‌পা স্কুলের অন্যতম কর্ণধার। এঁদের উভয়েরই চিত্র পাচাইয়াপ্‌পা স্কুলে সংরক্ষিত আছে। শ্রীনিবাস পিল্লেকে দেখতে পাই এইরূপ: মুখে একজোড়া মস্ত গোঁফ, কপালে ও নাকে তিলক ও ফোঁটা, মাথায় পাগড়ি এবং কাঁধে উত্তরীয়। শ্রীযুক্ত পিল্লে ছিলেন অতীব আচারনিষ্ঠ ও শাস্ত্রাচারী।[৫১] মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫১ সনে অচ্ছুৎ ছাত্র ভর্তি হলে প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। মাদ্রাজের এই মাতব্বর সমাজপতিরা বঙ্গদেশ থেকে আগত খ্রীস্টীয় হিন্দু যুবককে যে-পছন্দ করবেন, এমন মনে হয় না।

মধু পদত্যাগ করলেন।

১৭ই আগস্ট যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের নতুন অধ্যাপকমণ্ডলীর নাম প্রকাশ পেল ; সেখানে মম. এ. দত্ত বলে আর কাউকে দেখা গেল না।[৫২]

॥ ৫ ॥

মাদ্রাজে মধুর শিক্ষকজীবনের পরিসমাপ্তি হয়ে গেল। তাঁর জন্য এই অনিশ্চয়তার প্রয়োজন ছিল। কলকাতা তাঁকে ডাকছে ; এবং তিনি কি সহজে সাড়া দিলেন? মাদ্রাজের আট বৎসরের জীবনে প্রায় সাড়ে সাত বৎসর কেটে গেছে শিক্ষকতায়। সে ইতিহাসও নিন্দনীয় নয়। তাঁর ছাত্ররা অনেকে পরবর্তী জীবনে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন স্যার টি. মুথুস্বামী আয়ার। ১৮৫৩-৫৪ সনে মাদ্রাজ হাই স্কুলে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়েন ; এবং তখন সর্বোচ্চ শ্রেণীতে সাহিত্য পড়াতেন মধুসূদন। ঐ সময়ে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয় ; বিষয় ছিল—"National vices and the means to rectify them"। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু দেখে বুঝা যায় যে, এর নির্বাচনের পিছনে কার ভূমিকা প্রধান ছিল। কলকাতার হিন্দু কলেজের শিক্ষানীতির প্রতিধ্বনি মাদ্রাজে বেজেছে। মুথুস্বামী ঐ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

এই মুথুস্বামী দক্ষিণী বলে ১৮৫৬ সনে শিক্ষাবিভাগের নতুন রদবদলের সময় স্কুল ইনস্পেকটারের চাকরী পেয়েছিলেন, তাঁর গুরুকে যা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মুথুস্বামী, পরবর্তী কালে, প্রভূত উন্নতি করেছিলেন ; তিনি হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত হয়েছিলেন এবং স্যার উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শেক্সপীয়রের অন্যতম বিশেষজ্ঞ পাঠক। এর পিছনে একজনেরই শিক্ষা আছে। স্যার মুথুস্বামী আয়ার আমরণ এক বাঙ্গালী শিক্ষকের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে গেছেন।

মধু আবার সংবাদপত্র-জগতে ফিরে এলেন। জে. অক্টরলোনী তাঁর প্রতি আস্থাভাজন ছিলেন। সরকারী চাকুরীতে এই প্রবাসী বাঙ্গালীর জন্য যখন কিছুই করা গেল না, তখন তাঁর পত্রিকায়, যা তখন দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়েছে, যোগ দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানালেন।

মধু মাদ্রাজ পরিত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত অক্টরলোনীর পত্রিকার সহ-সম্পাদক

ছিলেন। অক্টরলোনীর পত্রিকার নাম The Spectator. ১৮৩৬ সনে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। মেটকাফ কর্তৃক সংবাদপত্রের স্বাধীনতাদানের ফলে বাংলাদেশের মত মাদ্রাজেও বিভিন্ন বেসরকারী পত্রপত্রিকা দেখা দিতে থাকে।

নিজেকে সহ-সম্পাদক হিসাবে পরিচয় দিলেও তিনিই ছিলেন কার্যত সম্পাদক। বেঙ্গল হরকরা তাঁর লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করে দুইবার তাঁকে সম্পাদক বলে অভিমত প্রকাশ করেছে।

১. Native Christian who is supposed to be the Editor of Madras Spectator. (18. 12. 1855)

২. Native Editor of the Madras Spectator. (29. 12. 1855)

সংবাদপত্রের পরিচালনা-ভার প্রায় সম্পূর্ণটাই মধু নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

উনিশ শতকে সারা পৃথিবীজুড়ে আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছিল। শেলী তাঁর 'Queen Mab' কাব্যে খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধেই কি বিদ্রোহ করেন নি? ফরাসী বিপ্লব ও ফরাসী দর্শন ধর্মকে আচার-অনুষ্ঠান, গির্জা-মন্দির ও যাজক-পুরোহিতের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। বাংলাদেশেও তার হাওয়া লেগেছিল; রামমোহনের আন্দোলন সেই আন্তর্জাতিক আন্দোলনেরই অংশ।

✓খ্রীস্টান মধু ছিলেন নবীনতার উপাসক। একজন পুরো আধুনিক মানুষ।

মাদ্রাজে রক্ষণশীলদের প্রতাপ; কিন্তু কলকাতায় উন্নতিকামীরা সরব। কলকাতার ঘটনাবলীর উপর মধুসূদন মাদ্রাজের পত্রিকায় নানা মন্তব্য প্রকাশ করতেন। প্রসঙ্গবিশেষে সমর্থন জানাতেন, প্রতিবাদ জানাতেন। হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে ষোল আনা সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পিছনে হিন্দুসমাজের জাত্যভিমান কাজ করেছে।

"It is not the Metropolitan College, the institution which the old Bengal founded, because it could not appreciate the spirit of liberality that led the Government to throw open the Presidency College to all classes of the community. Is it not the hot-bed of casteism ?"[১৩]

হরকরা একই তারিখে স্পেকটেটার থেকে আরও একটি প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করবে; এবং হরকরা দুই প্রবন্ধের মধ্যে পরস্পরবিরোধী যুক্তি দেখতে পায়। "Opposite reasonings are so jumbled together by him that one can hardly see what he is really driving at."

ভিন্ন জাতের লোকের সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা খুব কষ্টকর, বিশেষ করে সে জাত যদি যুক্তি-বর্জিত ধর্মমতে বিশ্বাসী থাকে। সলোন, বা ড্র্যাকোর মত আইন-প্রণয়নকারীও এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যাবেন। তবু পিছু হটলে চলবে না; কারণ ভারতবর্ষ আজ প্রতিদিন গতিশীলতা অর্জন করছে—যুগধর্ম অনুযায়ী তাকেও আইন প্রণয়ন করতে হবে। পণ্ডিত ও মৌলবীদের মনপ্রাণ মনুসংহিতা ও কোরানের চরণে গচ্ছিত আছে। তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই নতুন বিধান তৈরি করা আবশ্যক। তবে ভারতের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার সঙ্গে যতদূর সম্ভব কলহ বা সংঘর্ষ পরিহার করতে হবে। "Bacon-fed and be-Shakespeared men can have but little reverence for Menu and the gymo-sophists of old." এই বক্তব্য সম্বন্ধে হরকরা সমালোচনা লিখেছে—স্পেকটেটার সহনশীলতা, না অ-সহনশীলতার পক্ষে ওকালতি করছে, তা বুঝা গেল না।

মধুসূদন হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ সমর্থন করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের আইন প্রণয়নেব সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারেন নি। মাদ্রাজ-জীবনের সূচনাতেই এ বিষয়ে বলেছেন 'ইয়ং বেঙ্গলের' প্রতিনিধি হিসাবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের সমর্থনে লিখিত প্রথম পুস্তিকা ১৮৫৫ সনে জানুয়ারি মাসে প্রচারিত হয়েছে এবং বাংলাদেশে এই মতের পক্ষে ও বিপক্ষে বিপুল সাড়া পড়ে গেছে। প্রবাসী মধু হলেন কলকাতার প্রকৃত সন্তান। কলকাতা-কাঁপানো সকল আন্দোলন তাঁকেও কাঁপিয়ে দিয়েছে।

তিনি এই প্রশ্নের উপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। তাতে তিনি অন্য প্রদেশের প্রতিক্রিয়ার খবরও উত্থাপিত করলেন। একথা কি আমরা এত দিন জানতাম যে, পুণার ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত এই আইনের পক্ষে আইন পরিষদে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন? কলকাতার রক্ষণশীল সমাজ এই আইন বরবাদ

করার জন্য ৫০ হাজার টাকা চাঁদা তুলেছে, এ খবরও তিনি জানিয়েছেন। সঙ্গে-সঙ্গে বলেছেন, তাঁদের প্রয়াস সফল হবে না।

মাদ্রাজের অবস্থা মধু ভালভাবেই জানতেন। তাই মাদ্রাজের প্রসঙ্গ টেনেই প্রবন্ধ শেষ করেছেন। "Madras has often been reported as the Headquarter of Native Intolerance, but we trust that the conduct of her educated Hindu will in this instance prove that the taunt has ceased to apply."[৫৪]

প্রবন্ধটি রচনার দশদিন পরেই তিনি মাদ্রাজ ত্যাগ করেন। তিনি যখন জাহাজে, তখন প্রবন্ধটি বেঙ্গল হরকরাতে পুনর্মুদ্রিত হয়।

আগস্ট মাসেই মধুসূদন স্পেকটেটাবের সহ-সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে মাদ্রাজ শহরে 'The Mail' নামে যে-দৈনিক পত্রিকাটি আছে, তার সঙ্গে মাদ্রাজ স্পেকটেটার পত্রিকাটি সংযুক্ত হয়ে গেছে।[৫৫]

মধুসূদনের এই নতুন চাকরীতে মাহিনা যৎসামান্য; মধুব সংসার বড় হয়ে গেছে—দুই ছেলে দুই মেয়ে। স্ত্রী রেবেকা ভারতীয় সমাজের মেয়ে নন; তবু এক ভারতীয়কে বন্ধু-বান্ধবদের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি জীবনের সঙ্গীরূপে বেছে নিয়েছিলেন।

মধু তাঁর পত্নী সম্বন্ধে 'ক্যাপটিব লেডি'র ভূমিকায় যা বলেছেন, তা তাঁর বিবাহ-পূর্ব রূপ। বিবাহ-উত্তর জীবনে রেবেকার ব্যক্তিত্বে কোন পরিবর্তন ঘটে নি। মধু বন্ধু গৌরদাসকে প্রথম চিঠিতে তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, "She is a fine girl." চার সন্তানের জননী তখনও রয়েছেন 'girl', 'lady' হতে পারেন নি। প্রভাতের কোমল কিরণ মধ্যাহ্নেও প্রখর হোল না। মধুর বন্ধুরা চিঠিতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখলে শ্রীমতী খুব খুশি হতেন। চাকরীর ব্যপদেশেও বটে, আবার তাঁর 'Good Lady'-র মনোরঞ্জনের জন্যও বটে, মধু ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করতেন। নিজেকে নিয়ে মধু রসিকতা করবার সামর্থ্য রাখতেন—তাই লিখলেন বিদেশী ভূষায় তাঁকে চলনসই "ট্যাশ ফিরিঙ্গী"র মত দেখাচ্ছে।

বন্ধুদের কাছে চিঠি লেখার মত পয়সা যখন ট্যাকে নেই, বিয়ারিং চিঠি পাঠাচ্ছেন, তখন তিনি লিখছেন, "Heigh ho! my stars are brightening." চিঠিতে লিখলেন এই বাক্যটি। লিখলেন—শীঘ্রই যে তিনি বাবা হতে চলেছেন। সুখ-দুঃখ তাঁর হাতে দু'টি যমজ ভাই। কবিতার

বই ছাপালেন ধারে, ছাপাখানার মালিক জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। কিন্তু স্ত্রী রেবেকা তাঁকে অর্থের জন্য উত্যক্ত করে তুলেছেন, একথা তো কোন চিঠিতে নেই। বরং ভূদেবকে 'heathen' বলায় ভদ্রমহিলা রাগ করেছেন, এই ছোট্ট খবরটুকুও তিনি বড়ো আনন্দে দিয়েছেন। প্রথম সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তাঁকে উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া বদলাতে পাঠিয়েছেন। শূন্য গৃহের দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছে, এই সামান্য খবরও তিনি গোপন করেন নি।

তারপর মাদ্রাজ প্রবাসের ছ'বছর কেটে গেছে। বন্ধুর কাছে অকপটে জানালেন, পৃথিবীতে যেমন আশা করেছিলাম, তেমন উন্নতি আমি করি নি। ঐ চিঠিতেই তিনি বললেন, আমার এক চমৎকার ইংরেজ বৌ আছে, চারটি সন্তান আছে। বন্ধু বিপত্নীক হয়েছেন বলে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। অন্যায় অজুহাতে স্ত্রী ত্যাগ করার মনোভাবের মানুষ কি এই লোক?

কলকাতা-যাত্রার তারিখ পূর্বাহ্ণেই ঘোষণা করছেন, কাজেই পালাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

একমাস পূর্বে দিনক্ষণ স্থির করেছেন। প্রস্তুত হচ্ছেন কলকাতায় যাত্রার উদ্দেশ্যে। "আমার মত গরীব মানুষের পক্ষে কলকাতায় যাওয়া যে কি ব্যয়-সাপেক্ষ, তা তুমি জানো।"

বন্ধুকে নিশ্চয়ই আরও দুই-একখানা চিঠি লিখেছিলেন, নানা বিষয়ে বিস্তৃত সংবাদ দিয়ে। সে সব চিঠি আমরা পাই নি। এক চিঠিতে বন্ধু লিখছেন, শুনেছি তোমার বৌ "সম্পত্তির অধিকারিণী। যদি তাই হয়, তিনি কোন বিশ্বাসী বন্ধুর হাতে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে চলে আসতে পারেন না?"

তোমার ছেলেমেয়েগুলি কত বড় হয়েছে? আমি তোমার বাচ্চাদের দেখবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি। তোমার প্রিয় স্ত্রীকে আমার শ্রদ্ধা জানিও।" ঐ চিঠিতেই বন্ধু সান্ত্বনা দিলেন যে, তোমার বাবার যে-সম্পত্তি আছে, তা বেচলে বা দখল করলে তোমার যাতায়াতের খরচ উঠে যাবে।

বাংলাদেশ তাঁকে সবসময় ডাকত—বাংলাভাষাও তাঁকে ডাকছিল—"Am I not preparing myself for the great object of embellishing the tongue of my fathers?" এই উদ্দেশ্য সাধনে দিনে রাতে আঠারো ঘণ্টা তামিল পড়েছেন; হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত, ল্যাটিন ও

ইংরেজী ভাষার সম্পদ আয়ত্ব করছেন। একটি মাত্র উদ্দেশ্য, বড় কবি হবো—মাতৃভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করব। উদ্দেশ্য একটি, অনন্যচিত্তে সাধনা করে চলেছেন—মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার আহ্বান সর্বদা তাঁর কানে বাজছে।

অ-বরেণ্যকে বরণ করে গ্রন্থকীট কত কালহরণ করেছেন। আজ বরেণ্যকে বরণ করবেন।

এতকাল পরধনলোভে মত্ত হয়েছিলেন! আজ দৃষ্টি দেবেন মাতৃগৃহের রত্নরাজির দিকে। মাদ্রাজ থেকে লেখা প্রথম চিঠিতে বন্ধুর কাছে কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের গ্রন্থ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। মাতৃভাষা ভুলে যাচ্ছি বলে শঙ্কাবোধ করেছিলেন।

ঐ দুই বৃদ্ধ বঙ্গ-কবির প্রতি আকর্ষণ ভাগ্যদেবতার পরিহাস। বেথুনের উপদেশ তো তার অনেক পরবর্তী ঘটনা? "যা রে ফিরি ঘরে।"

যখন যে-অবস্থাতেই থাকুন, মধু কখনও স্বাজাত্যবোধ খোয়াতেন না। বিশপস্‌ কলেজে থাকার সময় বন্ধুরা 'খ্রীস্টান সুহৃদ' বলে সম্বোধন করলে আপত্তি জানাতেন। কিভাবে সম্বোধন করতে হবে, তা হাতে ধরে শিখিয়ে দিতেন।

যখন মাদ্রাজে সবে পা দিয়েছেন, তখন কি করেছিলেন জানি না। কিন্তু মাদ্রাজ সার্কুলেটর থেকে তিনি মধুসূদন দত্ত। হিন্দু ক্রনিকল যখন আত্ম-প্রকাশ করল, তখন সম্পাদকের নাম বেরুল Madhu Sudhon Dutt. মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. দত্ত, কখনও কখনও Mr. Dutt, সিটি অব মাদ্রাজ ইয়ংমেনস্‌ লিটারারী সোসাইটির কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় এম. দত্ত।[৫৬] 'এ্যাংলো-স্যাক্সন এণ্ড দি হিন্দু' পুস্তিকায় M. S. Dutt, Esq. উৎসর্গ-পত্রেও M. S. Dutt. বাসস্থান বারবার পরিবর্তিত হচ্ছে। কখনও রয়াপুরম, কখনও পপহ্যাম ব্রডওয়ে, কখনও ভেপেরী কাশলেট : কিন্তু নাম অপরিবর্তিত থাকছে। 'এ্যাংলোস্যাক্সন এণ্ড দি হিন্দু' পুস্তিকায় খ্রীস্টধর্মের মহিমা প্রচার করছেন, কিন্তু খ্রীস্টীয় নাম মাইকেল শিরে বরণ করছেন না। তাঁর এই স্বাজাত্যবোধ সমগ্র বাঙালী জাতিকে গৌরবান্বিত করেছে। সূর্যকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর স্বজাতি-প্রীতির অর্থ বুঝা যাবে। সূর্যকুমার ডাঃ গুডিবের সাহচর্যে বিলেত গিয়েছিলেন; খ্রীস্টান হয়েছিলেন,* শ্বেতাঙ্গিনী

*** Feb 21, 1852—At the Union Chapel Soorjacoomar Goodeve Chakrabortty, Esq., M. D. to Miss Sarah Dryland (Friend of India—1852, Feb. 26).**

বিবাহ করেছিলেন, প্রথম ভারতীয় Covenanted officer হয়েছিলেন। আবার সগর্বে গুডিব নামটিও বরণ করে নিয়েছিলেন।

মাদ্রাজে খ্রীস্টধর্ম বিশেষ রকম প্রভাবশালী হলেও মধু গায়ে পড়ে কারও সঙ্গে আত্মীয়তা করেন নি। তাঁর যোগ্যতা তাঁকে সর্বজনপরিচিত করেছিল।

শুধুই কি দেশপ্রেম? অঞ্চলপ্রেমও তাঁর মধ্যে সাংঘাতিকভাবে ছিল। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর পঙ্‌ক্তি ফুঁড়ে সে কথা বারবার বেরিয়ে এসেছে। পরবর্তী কালে তাই এঁর মুখে—"আমি শুধু বাঙালী নই, আমি বাঙাল, যশুরে বাঙাল"—এই উক্তি আমাদের অবাক করে না।

এখন প্রশ্ন, The Anglo-Saxon & the Hindu পুস্তিকাখানি তিনি আদৌ কেন লিখলেন? পুস্তিকাটি হোল একটি বক্তৃতা—পুস্তকের নাম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে Lecture 1. উপসংহারে বলা হয়েছে যে পরবর্তী আলোচনার বিষয়টি আরও বিশদ করা হবে। বক্তৃতা শ্রোতাদের দাবী অনুসারে প্রদত্ত হয়; এবং শ্রোতাদের রুচি যে বক্তার উপর প্রভাব ফেলে না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

মধু লিখেছেন—এ্যাংলা-স্যাক্সনদের এটি হোল গৌরবজনক কর্তব্য হিন্দুদের উজ্জীবিত করা, পুনর্জীবিত করা, বা এক কথায় খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা।

স্বভাবতই, এ দেশের যাঁরা হিন্দু নন, এমন ব্যক্তিও মধুর এই উক্তিতে ক্ষুব্ধ হতে পারেন।

ক্ষুব্ধ হবার পূর্বে দু'টি প্রসঙ্গে অবহিত হতে হবে—

১. মাদ্রাজে খ্রীস্টধর্মের খুবই প্রসার ঘটেছে। ১৮৫৩ সনের একটি হিসাবে দেখছি বাংলায় ও বোম্বাই-এ যেখানে ১০১ ও ৩৭ জন মিশনারী, মাদ্রাজে সেখানে ১৬৪ জন বিশপ। বোম্বাই ও বাংলায় দেশীয় প্রচারকের সংখ্যা ১১ ও ১০৫ জন, মাদ্রাজে সেখানে ৩০৮ জন। বাংলায় ও বোম্বাই-এ গির্জার সংখ্যা ৭১ ও ১২টি মাত্র; মাদ্রাজে সেক্ষেত্রে ১৬২টি। বাংলা ও বোম্বাই-এ খ্রীস্টধর্মান্তরিতদের সংখ্যা ১৪, ৪০১ এবং ৫০০ জন মাত্র; সেখানে মাদ্রাজে ৭৪,৫১২ জন।[৫৭]

মাদ্রাজে খ্রীস্টধর্ম অপেক্ষাকৃত প্রসারশীল ও জীবন্ত ধর্ম; ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে মাদ্রাজের খ্রীস্টীয় মিশনারীরাই কেবল প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, হিন্দুরা নয়। বাংলাদেশে যেমন রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও তাঁর

শিষ্যগণ, ও বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কারপন্থী হিন্দু সনাতন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, মাদ্রাজে তেমন কোন শক্তির উদ্ভব ঘটে নি। একমাত্র 'প্রগতিশীল' বা 'সংস্কারপন্থী' হিন্দু ছিলেন বেঙ্কট রয়লু নাইডু। তিনিও আবার খ্রীস্টান।

২. মধু খ্রীস্টধর্মের পক্ষে প্রচার চালিয়েছেন,' ঠিকই ; কিন্তু সে কি প্রচলিত খ্রীস্টধর্ম? ত্রিত্ববাদী খ্রীস্টমতে মধুর আস্থা ছিল না। মধু যে খ্রীস্টমতে বিশ্বাস করতেন, তা হোল যুক্তি-শাসিত খ্রীস্টধর্ম। লকের বিখ্যাত পুস্তিকা—'Reasonableness of Christianity' সে-যুগের হিন্দু কলেজের সব ছাত্রই পড়তেন, মধুও পড়েছিলেন। তিনি নিউটনের গ্রন্থও পড়েছিলেন ; মধু ডেভিড হিউমের 'Enquiry concerning Human Understanding' গ্রন্থে 'মিরাকলে'র উপর যে অধ্যায়টি আছে, সেটি পড়েছিলেন, শুধু হিউমের লেখা ইংল্যাণ্ডের ইতিবৃত্ত পড়েন নি। টমাস পেইনের গ্রন্থসমূহের সঙ্গে মধু পরিচিত ছিলেন, বিশেষ করে তাঁর 'Rights of Man' এবং 'Age of Reason'—সে যুগের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্যগ্রন্থ। মধুসূদন যে ধর্মের জয়গান করেছেন, সে ধর্ম লোক বেকনের, নিউটনের ধর্ম। রেঃ প্রাণনাথ বিশ্বাস তাঁর "Reminiscences of the Death of Michael Madhusudan Datta" নিবন্ধে লিখেছেন "Michael believed that there was no special spiritual benefit in joining any particular church ; in his eyes all churches were the same and he thought he might attend divine worship wherever he pleased." এই অ-সাম্প্রদায়িক ঈশ্বরবোধের জন্য অন্তিমকালে তাঁকে উত্যক্ত হতে হয়েছিল ; তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন—"I care not for man-made churches nor for anybody's help." মনুষ্যসৃষ্ট গির্জার উপর আমি নির্ভরশীল নই, ব্যক্তিবিশেষের দাক্ষিণ্যও আমি চাই না।'[৮]

ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধর্মের বিশ্বজনীন রূপ সারা বিশ্বের উত্তরাধিকার হয়ে উঠল। রামমোহন রায় এদেশে ঐ বিশ্বধর্মের এক বড় উদ্গাতা—তিনি প্রথমে লিখলেন 'The Precepts of Jesus Christ' ; পরে লিখলেন 'Universal Religion'.

খ্রীস্টধর্মের মহিমা-বর্ণিত গ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেছেন মাদ্রাজ পলিটেকনিকের সম্পাদক মি· জে· এইচ· কেনরিকের নামে; এ ঘটনা মনে রাখবার মত। উৎসর্গ-পত্রে কেনরিকের কোন্ কোন্ সদ্‌গুণ তিনি উল্লেখ করেছেন, তাও লক্ষণীয়! "Your zeal for the cause of Science, your elegant acquirements, the urbanity of manners, the benevolence of your dispositions."

প্রথম ও তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। আধুনিক মানুষ বলতে মধু কি বুঝতেন, তা বুঝা যাবে। আদর্শ মানুষ যে আধুনিক মানুষ, এটা বড় করে বললেন। রামের গ্রাম্যতা (বন্যতা) আর রাবণের নাগরিকতা কেন এত স্পষ্ট হয়েছে, তার পাঠ আমাদের এখান থেকেই নিতে হবে। দেবকুলপ্রিয় রাম আর পরম অধর্মাচারী রাবণের মধ্যে পার্থক্য হোল নাগরিক বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে গ্রাম্যতার পার্থক্য।

জে· এইচ· কেনরিক মাদ্রাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তিনি পেটি জুরীর সদস্য; ফ্রানেক এণ্ড কোম্পানীর (M/s Franeck & Co.) অংশীদার।[৫৯] মাদ্রাজে যে শিল্পমেলা (Industrial Exhibition) হয়, তিনি তার ছিলেন একজন উদ্যোক্তা।[৬০] ১৮৪৬ সনে ১লা অক্টোবর মাদ্রাজে পলিটেকনিক তাঁরই উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি নির্বাচিত হন অবৈতনিক সম্পাদক।[৬১] ১৮৫৩ সনে এই ভদ্রলোকই মাদ্রাজে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ বসান। 'The public-spirited Mr. Kenrick of Madras has, at his own expense given the Presidency a little line of electric telegraph not without its uses'.[৬২] এথেনিয়াম পত্রিকায় কেনরিকের প্রশংসা করে বলা হয় যে, "A day will come when we shall be able to tell the sourcars in Black Town at half past twelve o' clock in the day the price of company's paper in the Calcutta bazar at one, and then actually put time out of countenance altogether."[৬৩] এথেনিয়াম-মুদ্রাযন্ত্রে মধুর 'আলোচ্য পুস্তিকাটি ছাপা হয়। কেনরিকের মত এথেনিয়ামের সম্পাদক মিঃ হেনরি মীড ছিলেন মধুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনিও মধুর মত একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন; অবশ্য কয়েক মাস পূর্বে।[৬৪] মধুর খ্রীস্টমত আধুনিকতার তাপে পরিশুদ্ধ।

মধুর প্রথম যুগের সাহিত্যসাধনার সর্ব অংশ ইংরেজীতে ; আবার ইংরেজ আমলার সৎপরামর্শেই তিনি তাঁর ভুল সংশোধন করলেন। রিজিয়া সম্ভবত বেথুন-অভিমত শোনার পূর্বে লেখা। রিজিয়া রচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিদেশী ভাষায় ভিক্ষাবৃত্তির অবসান হোল। সাংবাদিকতা করছেন, সভাসমিতিতে প্রবন্ধ পড়ছেন, কিন্তু কোন সৃষ্টিধর্মী রচনা ঐ ভাষায় লিখে আর লেখনীকে অর্থহীনতায় কলঙ্কিত করেন নি, যদিও ঐ ভাষার প্রতি তাঁর একটা প্রচণ্ড টান ছিল। "আমার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নাও কিন্তু এ্যাংলো-স্যাক্সনদের সেই চমৎকার ভাষা কেড়ে নিও না।" তাই এই ভাষায় 'রত্নাবলী', 'শর্মিষ্ঠা', 'নীলদর্পণ' নাটক খুশি মনে অনুবাদ করেছিলেন, শুধু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয়। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর প্রথম সর্গ ঐ ভাষাতে অনুবাদ করতে গিয়েছিলেন ; Queen Seeta নাম দিয়ে আর এক স্বতন্ত্র কাব্য ঐ ভাষায় লিখতে গিয়েছিলেন। ভাগ্যিস্ অসমাপ্ত ! চিঠিপত্র তো সারাজীবন ইংরেজীতেই লিখেছেন, ব্যতিক্রম শুধু একখানা। সে চিঠিখানা লিখিত হয়েছিল জনৈকা অন্তঃপুরচারিণীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে। পরবর্তী জীবনে তাঁর সাহিত্য-চর্চার মূল খাত বাংলাভাষা ; মাঝে মাঝে উৎসাহের ক্ষীণধারা অন্য খাতে বইতে চেয়েছে। সেটি বিশেষ ধর্তব্য নয়।

১৮৪৮ সন থেকে ১৮৫৫ সন্ তাঁর মাদ্রাজ-প্রবাস-জীবন। ১৮৫১ সনে মা জাহ্নবী দেবী ইহলোক ত্যাগ করলে তিনি একবার সবার অলক্ষ্যে কলকাতায় এসেছিলেন। এই সেই মা, যার আঁচলের তলা থেকে খুব জোর গলায় তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন। বন্ধু গৌরদাস তাঁর মাদ্রাজ পলায়নে মায়ের প্রতি অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে বললে মধু রাগ করেছিলেন ; বলেছিলেন, মায়ের আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকলে মানুষ বড হতে পারে না। বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এলেন মাদ্রাজে। মাদ্রাজে তখন তাঁর স্ত্রী রয়েছেন, দুই-দুইটি সন্তান রয়েছে।

ফিরে এলেন তিনি। ইউরোপের লোক যেমন মা-বাবার স্নেহচ্ছায়া অস্বীকার করে বিশ্বজয়ে বেরিয়ে পড়ে, এ-ও তাই ! আবার কলকাতার ডাক এল ১৮৫৫ সনে ; বন্ধুরা জানালেন পিতার মৃত্যু হয়েছে। বন্ধুদের অনুরোধে তিনি কলকাতায় এলেন পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের আশায়। কারণ "মাদ্রাজে আমি আশানুরূপ উন্নতি করতে পারি নি।" কিন্তু সেখানে তিনি স্থায়িভাবে থাকলেন কেন ? কেবল বন্ধুদের অনুরোধে ও উৎসাহে ?

পত্নী রেবেকা ও তাঁর সন্তানেরা হারিয়ে গেলেন কেন? জীবনী-কারেরা অনুমান করেছেন, এই সময়ে পত্নী রেবেকার সঙ্গে তাঁর ভুল বোঝাবুঝি চলছিল। অশান্তির কারণ কি? আর্থিক অনটন? নিতান্ত আর্থিক অনটনের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এতবড় বিচ্ছেদ হবে, এমন মনে হয় না! কারণ পরবর্তী কালে মধু এবং হেনরিয়েটা এর থেকে শতগুণ আর্থিক দুর্গতির মধ্যে জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু সম্পর্কচ্ছেদের জন্য ক্ষণকালের জন্যও চেষ্টিত হন নি। আর্থিক অনটন তাঁদের হৃদয়ের অনটন ডেকে আনে নি। তবে কি সবটাই রেবেকার দায়িত্ব? রেবেকা কি অর্থলোভিনী-স্বাচ্ছন্দ্যপ্রেমিকা স্ত্রী ছিলেন? তবে কি মধুর পানাসক্তি? হাস্যকর এই যুক্তি। তাহলে ইউরোপে বহু স্ত্রী স্বামীর ঘর করতেন না! জীবনে আসক্তি বিবিধ হতে পারে। রেবেকার জীবন-ইতিহাস অন্য কথা বলে। ফিরিঙ্গী ঘরের এই মেয়ের শৈশব কেটেছে পিতৃমাতৃহীন অবস্থায়, অনাথ-আশ্রমে। বিবাহ করলেন ভিন্ জাতের এক কৃষ্ণকায় যুবককে। বাবা-মা নেই, ছিলেন বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা। এই আগন্তুক অজানা বাঙালী যুবকটিকে গ্রহণ করতে তিনি কারও আপত্তি কানে তোলেন নি।

Quis novus hit nostris successit

Sedibus hospes!

Who is the stranger that has come to our dwelling!

পতিত্বে বরণ করে দেহমনের সমস্ত সুধা দিয়ে এই আগন্তুককে পরিতৃপ্ত করেছেন। যে আতিশয্য মধুর জীবনে ছিল, যা তিনি প্রশমিত করতে পারেন নি, তা হোল প্রতিভাবানদের আতিশয্য। কোন নারীই তাঁদের সবটুকু কোন কালে আয়ত্ত করতে পারেন না। মধু মাদ্রাজে মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতেন—এ খবর সাময়িক পত্রে বেরিয়েছে। কিন্তু তাতে রেবেকার অযোগ্যতা প্রমাণিত হয় না। আট বৎসরের সংসার-জীবনে তিনি মধুকে দু'টি পুত্র ও দু'টি কন্যা উপহার দিয়েছেন। দিয়েছেন জ্ঞান অনুশীলনের জন্য অপর্যাপ্ত অবকাশ; অর্থলাভ নেই, এমন নিরর্থক কাজে কদাপি বাধা দেন নি। মধুর কাব্যসাধনা অবাধে চলেছে। মধুসূদন যখন মাদ্রাজ ত্যাগ করেন, তখন তিনি ছিলেন গৌরদাসের ভাষায় "in the midst of a growing and cheerful family."

অথচ সেই মুহূর্তেই রেবেকাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। রেবেকা

২৬ বৎসরের পূর্ণা যুবতী তখন। দু'টি তট ছাপিয়ে উঠেছে। একটি শব্দও তিনি উচ্চারণ করেন নি, মধুসূদনের কাছে কোন দূত পাঠান নি—না ক্রোধ প্রকাশ করে, না অনুনয় করে। এমন নির্বাক নির্বিকার বিচ্ছেদ ইতিহাসে আমরা দ্বিতীয়বার দেখি নি।

মধুসূদন বড় ওজনের ব্যক্তি; তাঁর বিপরীতে যিনি আছেন, তিনিও হালকা নন!

১৮১৪ সন। মেরী গডউইনকে নিয়ে শেলী পালিয়ে গেলেন—সেদিন তিনি গোপনেই গিয়েছিলেন, এবং তার পূর্বে হ্যারিয়েটের সঙ্গে তিনি ভীষণ কলহ করছিলেন। একদিন অভিমানিনী হ্যারিয়েট আত্মঘাতিনী হলেন। হ্যারিয়েট ও শেলীর সন্তান দু'টির দেখাশোনার দায়িত্ব শেলীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য ব্যক্তির হাতে সমর্পিত হোল।

কই, মধুর ক্ষেত্রে এই রকম বিসদৃশ ঘটনার একটিও তো ঘটল না!

বরং মাদ্রাজ থেকে গৌরদাসের কাছে লেখা সর্বশেষ চিঠিতেও তিনি লিখছেন—"Yes, dearest Gour, I have a fine English wife, and four children." এ উক্তি পরিহাসভরে উচ্চারণ করেন নি। সারাজীবনে একটি বন্ধুকেও তিনি ত্যাগ করেন নি; পত্নীত্যাগে তাঁর এক মুহূর্ত সময় লাগল না কেন?

১৮৫৫ সনে ডিসেম্বর মাসে রেবেকা স্বামিসঙ্গ খোয়ালেন। সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর পরে মধু দেহত্যাগ করেছেন। তার পূর্বে রেবেকা আত্মঘাতিনী হন নি, অথচ তিনি জানতেন মাদ্রাজের মেয়ে হেনরিয়েটা আজ কলকাতায় মধুর গৃহ পূর্ণ করে আছেন। মধুর দেহত্যাগের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে ১৮৯২ সনে রেবেকার জীবনান্ত ঘটে। মধুর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন। মাত্র আট বৎসরের বিবাহিত জীবনের স্মৃতি নিয়ে দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর অতিবাহিত করেছেন। তিনি আর বিবাহ করেন নি—যে অনুষ্ঠান তাঁর সমাজে দ্বিতীয়বার ঘটলে এমন কোন অমার্জনীয় অপরাধ হয় না। বহুলোকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাস প্রলোভন জয় করে তিনি টিকে থেকেছেন। এই জোর তিনি কোথায় পেলেন? তাঁর চার-চারটি সন্তানের মধ্যে দু'টি শেষ পর্যন্ত বেঁচেছিল। তাদের তিনি মানুষ করে তোলেন। তাঁর সন্তানেরা পিতৃপরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। এ শিক্ষা কার?

রেবেকার এক পৌত্রের অর্থানুকূল্যে মধুসূদনের এক বৃহৎ তৈলচিত্র প্রখ্যাত

চিত্রশিল্পী অতুল বসু কর্তৃক অঙ্কিত হয়ে কলকাতায় ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে শোভা পাচ্ছে।

মধুর জনৈক সহাধ্যায়ী লিখেছেন যে, মধুর রোগ-শয্যায় রেবেকা উপস্থিত থাকতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। সেবা করতে চেয়েছিলেন।

১৮৫৫ সনের ডিসেম্বর মাসে পত্নী রেবেকার সম্বন্ধে মধু তাঁর সর্বশেষ উক্তি করেছেন। বাকি জীবনে আর কখনও রেবেকা তাঁর কলম থেকে এক ফোঁটা কালি টেনে আনতে পারেন নি।

রেবেকা ও তাঁর সন্তানেরা আর কোনদিন মধুর প্রকাশ্য জীবনে দেখা দেবে না।

কত অভিশপ্তা নারীর জন্য কত অভিযোগ তিনি উত্থাপন করবেন, কত দুঃস্থ ব্যক্তির জন্য কত কান্না তিনি কাঁদবেন। কিন্তু মধুর জীবন থেকে এই জীবনাধিকেরা হারিয়ে গেল চিরতরে।

কেন তাদের জীবন তার সব ঔজ্জ্বল্য সরসতা ও সজীবতা নিয়ে মধুর কাছে কোন প্রত্যুত্তর পেল না ?

এখন থেকে এই সব প্রশ্নের সদুত্তর আর মধুর জীবনী নয়, মধুর সাহিত্য দেবে। বাস্তবের মানুষ ধীরে ধীরে অবাস্তবের প্রাঙ্গণে এসে হাজির হবে।

রেবেকাকে মধুসূদন ছেড়ে গেলেন, কিন্তু রেবেকা কি তাঁকে কোন দিন ছেড়েছেন ?

দু'জনেই দু'জনের প্রসঙ্গে নীরব। নীরবতা যোগায় মুখরতা।

কবির কাব্যে সেই নীরবতার নারীকে নানান্ মুখের মুখোশ পরে উপস্থিত হতে হবে। ক্যাপটিব লেডিতে যিনি ছিলেন অনামিকা, পরবর্তী কাব্যে অনির্দেশ্যা হতে আর তাঁর আপত্তি কি ?

একজন মাদ্রাজে, আর একজন কলকাতায়। জীবনের দু'টি অর্ধ যেন দু'টি অধ্যায়—একটি অপরটিরই ক্রমপরিণাম, পরিশিষ্ট নয়।

মাদ্রাজ থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি সমুদ্রমুখর মাদ্রাজের প্রতি আর ফিরে তাকালেন না। এই মাদ্রাজ তাঁকে অনেক দিয়েছে, অনেক নিয়েছেও। কত ফুটন্ত ইচ্ছার সার্থকতা, কত দুরন্ত ইচ্ছার অপমৃত্যু! সব মউলে তো গুঁটি ধরে না। লংকা শুধু সমুদ্রমেখলা থাক।

All that is dearest to me thou didst give
Loved faces, ways, stars, waters language, sea.

সমুদ্রতীরের-আকাশ বড় পরিব্যাপ্ত। সেই উদার উন্মুক্ত আকাশ, তার কোটি কোটি নীরব তারা ও অট্টহাসিভরা সূর্যের কিরণমালা নিয়ে অবিরাম হাজির থাকবে তাঁর সাহিত্যে, হাজির থাকবে অশ্রান্ত সমুদ্র তার অনিবার গতি ও গর্জন নিয়ে। মানুষ অনামিকা, কিন্তু প্রকৃতি স্বনামিকা। কে কার প্রতিনিধিত্ব করছে, কে বলবে?

যে কথা মধুসূদন বলেন নি, যা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অনুমানের বাইরে—সে কথা চাপা-ই থাক। হৃদয়ের সব কথা কি হৃদয় জানে?

জীবন জীবনীর থেকে বড়, কারণ সে সদা চঞ্চল, গভীর ও রহস্যময়। শুধু নেপথ্যে তার হিসাব-নিকাশ চলবে। প্রকাশ্য পরিচিত জীবন থেকে কবির গূঢ় কাব্য-জীবন তাই বুঝি অধিকতর প্রাসঙ্গিক। জীবন কখন কখন হয়ে যায় অন্য কোন নৈসর্গিক সত্তার মত।

পাদটীকা

১. Unpublished Records of the Hindoo College—1847-1848.

২. Bengal Directory, Dec, 15-30, 1848.

২ক. Madras Examiner, Dec. 15-30, 1848.

৩. Madras Almanac, 1846.

৪. ঐ, 1847.

৫. ঐ।

৫ক. History of Madras—Madras Tercentenary Celebration Committee Commemoration Volume—C. S. Srinivasachari, 1939, p. 190.

৬. Madras Examiner, May 20, 1848.

৭. ঐ।

৭ক. Madras Almanac, 1849, p. 288.

৮. Report of the Political Department, 1847-48. Madras Government, p. 40. Madras Almanac, 1848.

৮ক. Bengal Past and Present—1923, Vol. 26, p. 191

৯. A List of Inscriptions on the Tombs or Monuments in Madras—Julien James Cotton. Madras, 1965.

৯ক. মধু-স্মৃতি—পৃঃ ৬৭-৬৮।

১০. Madras Almanac, 1847.

১১. Madras Almanac, 1850.

১২. Calcutta Christian Observer, January, 1849.

১২ক. Christian Advocate, 21 February, 1852.
Madras Examiner-এ উদ্ধৃত। 9 March, 1852.

১৩. জীবন-চরিত—পৃঃ ১৪৮।
মধু-স্মৃতি—পৃঃ ৫৮।

১৩ক. Celebrated Indians—Parameswaram Pilai. Gajalu Lakshmi Narsu Chetty.

১৩খ. Friend of India, 4 May, 1848. তথ্যটি Madras Standard থেকে উদ্ধৃত।

১৪. Madras Examiner, 3 April, 1853.

১৫. Fort St. George Gazette—7 September, 1854.

১৬. Oriental Herald, Vol. II. 1848.

১৭. মধু-স্মৃতি—পৃঃ ৫৯।

১৮. Madras Christian Herald, 29 March, 1829.

১৯. Eurasian, 29 April, 1850.

২০. ঐ।

২০ক. ঐ।

২১. Madras Circulator, 21 July, 1847.

২২. লোকরহস্য—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সংসদ সংস্করণ। রামায়ণ সমালোচনা।

২২ক. The Muse in India—Indicus, Calcutta. Printed by G. P. Roy & Co. No. 67, Emambarry Lane, Cossitollah, 1859.

২৩ ক্রন্দসী—সুশীল রায় সম্পাদিত। বর্ষ ১১। সংখ্যা ১০-১২। সুলতানার প্রত্যাবর্তন: প্রসঙ্গ কথা—ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত।

২৩ক. The Eleventh Annual Report from the Governors of Madras University for 1851-52, Madras. Printed by D. P. L. C. Connor. At the Christian Knowledge Society's Press, Church Street, Vepery, 1852.

২৪. Madras Examiner, 10 August, 1852.

২৫. ঐ, 12 October, 1852.

২৬. ঐ, 17 April, 1852.

২৭. Proceedings of the Public Department, 1855. General No. 1038. অপ্রকাশিত দলিল।

২৮. Madras Almanac, 1851.

২৯. Madras Examiner, 26 March, 1852.

৩০. ঐ, 12 March, 1852.

৩১. Madras Examiner, 17 January, 1852.

৩১ক. Madras Circulator, 29 July, 1850.

৩২. Madras Examiner, 15 January, 1852.

৩৩. ঐ, 6 January, 1852.

৩৪ Hindu Chronicle, 20 March, 1851.

৩৫. ঐ, 20 March, 1857.

৩৬ Bengal Hurkaru, 3 April, 1851.

৩৭. The Administration of Justice in the Southern India—John Bruce Norton, Madras 1853. Messers Pharoah & Co. Athenaeum Press, Mount Road.

৩৮. The Eleventh Annual Report from the Governors of the Madras University for 1851-52, Madras. Printed by D. P. L. C. Connor, at the Christian Knowledge Society's Press, Church Street, Vepery, 1852.

৩৯. Madras Examiner, 2 September, 1853.

৪০. Friend of India—1 April, 1852.

৪১. Hindu Chronicle, 18 March, 1852.

৪২. Madras Almanac, 1856.

৪৩. Madras, Examiner, 12 April, 1853.

৪৪. Friend of India, 9 October, 1851—হিন্দু ক্রনিকল থেকে উদ্ধৃত।

৪৫. Hindu Chronicle, 15 January, 1852.

৪৬. ঐ।

৪৭. Eastern Guardian, 10 May, 1851.

৪৮. Fort St. George Gazette, 15 January, 1856.

৪৯ Public Department, Madras Government. General No. 1038, page —35. অপ্রকাশিত নথিপত্র।

৫০. Selections from the Records of the Madras Government—1854.

৫১. Pachaiyappa's College—Centenary Commemoration Book. Edited by V. Thiru Venkataswami, M. A., 1942.

৫২. Selections from the Records of the Madras Government, 1856.

৫৩. Bengal Hurkaru, 18 December, 1855.

৫৪. Madras Spectator, 12 December, 1855. Quoted in Bengal Hurkaru, 29 December, 1855.

৫৫. The Mail Centenary Supplement, 19 December, 1968.

৫৬. Madras Almanac, 1854.

৫৭. The Administration of the East India Company—Christianity in India, J. W. Kaye, London 1853, page 651.

৫৮. মধু স্মৃতি—পৃঃ ৫৬৭ ।

৫৯. Fort St. George Gazette—25 April, 1948.

৬০. Madras Almanac, 1854.

৬১. Madras Almanac, 1840.

৬২. Athenaeum—Quoted in Bengal Hurkaru, 14 April, 1853.

৬৩. Madras Examiner, 24 June, 1853. Athenaeum থেকে উদ্ধৃত ।

৬৪. Madras Examiner, 23 June, 1853.

॥ ১ ॥

১৮৫৬ সনে মধুসূদন কলকাতায় এসে পৌঁছুলেন। আট বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধানে বন্ধুরা দেখলেন মধুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চেহারা, কণ্ঠস্বর, সাজপোশাক—সবই কিছু-কিছু বদলে গেছে। গিয়েছিলেন যৌবনের প্রারম্ভে, ফিরলেন যৌবনের উপান্তে। মানুষের পক্ষে এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। শালগাছ পঞ্চাশ বছর ধরে একই ভাবে ফুল ফোটায়। মানুষ তেমনভাবে থাকে না। সঞ্চয় যেমন ফেলতে ফেলতে ক্ষয় পায়; আহরণও তেমনি ফেলতে ফেলতে সংগ্রহ করে। এক কালের দাবি অন্যকালের কাঁধে চাপিয়ে দিলে ন্যায্য কাজ হবে না। পরিবর্তনই জীবন। কুঞ্চিত কেশদাম, মাঝখানে প্রসন্ন পথের মত চেবা সিঁথি, দীর্ঘায়ত হাস্যোজ্জ্বল চোখ দু'টি, উন্নত অথচ স্পর্ধাশূন্য নাসা—এ তো মধুর কৈশোর-যৌবনের পরিচিত মুখচ্ছবি। আজ নতুন দু'টি বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে—জর্জীয় দাড়ি ও গোঁফ। মধু সর্বতোভাবে নবীন হতে চেয়েছেন—এমন কি শ্মশ্রু ও গুম্ফ-পরিচর্যায়ও।

গুম্ফ ও শ্মশ্রু পরিচর্যার এই নব্য রীতি তখনকার নবীন ব্যসন। মাদ্রাজের গভর্নর স্যার হেনরি পটিনজার (১৮৪৮-১৮৫৪), লর্ড হারিশ (১৮৫৪-১৮৫৯) প্রভৃতি সকলের এই কায়দায় চুলদাড়ির পরিচর্যা। শুধু মাদ্রাজের অভিজাত বা শিক্ষিত ইউরোপীয়রা কেন, সারা ইউরোপের বুদ্ধিজীবী সমাজ একই প্রকার সাজসজ্জা ও দাড়িগুম্ফ পছন্দ করতেন। স্বয়ং ম্যাক্সমূলর সর্বক্ষণ পুরাতত্ত্ব ঘাটলেও এই নব্য ফ্যাসানের সঙ্গে বিরোধিতা করেন নি। কলকাতায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একই জাতের দাড়ি-গোঁফ ধারণ করার জন্য 'নবজীবনে'র প্রবন্ধ-লেখকের কাছে ভর্ৎসিত হয়েছিলেন। ২রা জানুয়ারি 'বেন্টিঙ্ক' জাহাজ ভোর বেলা শিবপুর বিশপস্ কলেজের ঘাটে এসে ভিড়ল। জাহাজে তাঁর আসন সংরক্ষিত হয়েছিল মিঃ হোল্ট এই ছদ্মনামে। বিশপস্ কলেজে তিনি এসে উঠলেন একা। এই দু'টি সংবাদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একা কেন? ছদ্মবেশ কেন?

মাদ্রাজ ত্যাগের পূর্বে মধুসূদন রেবেকার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন নি; কারণ এত অল্প সময়ের নোটিশে তা সম্ভব নয়। রেবেকার সঙ্গে কোন

গুরুতর কলহ হয়েছিল কি? চিঠিপত্রে বা বন্ধুদের স্মৃতিকথায় কোথাও তার কোন আভাস নেই।

হোল্ট ছদ্মনাম নিয়েছিলেন কেন? রেবেকার চোখে ধুলো দেবার জন্য? কিন্তু যাত্রার তারিখ তো পূর্বাহ্ণেই ঘোষিত। তবে কি জাহাজে ভদ্র আসন সংরক্ষণের জন্য? 'নেটিব'দের জন্য তখন বরাদ্দ হোত শুধু ডেক। মধু যখন মাদ্রাজে যান, তখন ডেকে স্থান পেয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তখন যে ছিলেন ছাত্র!

রেবেকার বাবা-মা কেউ ছিলেন না। তবে কি তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের হাত এড়াবার জন্য?

রেবেকার সঙ্গে তাঁর কোন গভীর মনোমালিন্যের খবর পাওয়া যায় নি। বিচ্ছেদ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেন হয়, তার আজও সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা হয় নি, সর্বজনীন কোন নিয়মও নেই।

তথ্যের দীনতা আমাদের দুর্গত করে। শেলীর ব্যক্তি-জীবনের বহু খবর আমাদের হাতে পৌঁছেছে, মধুর বেলায় তা নয়। বন্ধু গৌরদাসকে তিনি কি কিছু বলেন নি? গৌরদাস তাঁর মাদ্রাজ-প্রেরিত সর্বশেষ চিঠিতে মধুর ছেলেমেয়েদের দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন, বলেছেন। সেই পুত্র-কন্যা ছেড়ে একা এসে তিনি বিশপস্ কলেজে আশ্রয় নিয়েছেন। মধুকে কি তিনি প্রশ্ন করেন নি—একা কেন বন্ধু? মধু তার কি কোন জবাব দেন নি?

জবাব না দিলেও জবাব পাওয়া যায়। গৌরদাস মধুর সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে কৌতূহল পোষণ করেছেন; কিন্তু তাঁর প্রধান আকর্ষণ মধু। মধুর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে মধু কুপিত হয়—এ অভিজ্ঞতা তাঁর পূর্বেই হয়েছে। এবার আর তার পুনরাবৃত্তি করেন নি। দেখেছেন, বুঝেছেন, অথচ বললেন না কোন দিন।

১৮৪৯ সনে নভেম্বর থেকে তাঁদের মধ্যে যে পত্রালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ কি? ১৮৪৯ সনে গৌরদাস মধুর ব্যক্তিগত অর্থাৎ পারিবারিক জীবন নিয়ে কথা বলেছিলেন—ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

"I refrain from saying anything with reference of myself, because in case you should have marched off to the grave, there is a chance of others reading this learned Epistle." ঐ চিঠিতেই এক মাসের বেশি সময় বন্ধুদের কাছ থেকে চিঠি

না পেয়ে গালাগাল করেছেন, নাম স্বাক্ষর করেছেন—"yours very angrily"।

১৮৫৬ সনে মধু তার কি পুনরাবৃত্তি করবেন? মধু নীরব, গৌরদাসও নীরব।

পরবর্তী কালে বন্ধু রাজনারায়ণ বসু লিখছেন গৌরদাসকে (২৫. ১১. ১৮৮৯), "The Madras secret, I believe, is that Madhu eloped with the lady with whom he lived as wife but myself and my son knew before I corresponded with you about Madhu's life. You did not tell me anything about it.'

"এ বিষয়ে তুমি আমাকে কিছু বলো নি"—রাজনারায়ণের এই উক্তিটির গুরুত্ব আছে। রাজনারায়ণ লিখেছেন যে, মধু হেনরিয়েটাকে নিয়ে পালিয়েছিলেন। কিন্তু বিশপস্ কলেজে তিনি তো একাই এসে উঠেছেন; এবং 'বেণ্টিঙ্ক' জাহাজে হেনরিয়েটা নাম্নী কোন যাত্রীর সন্ধানও পাচ্ছি না। তবে কি হেনরিয়েটার নামটিও ছদ্মনাম?

হেনরিয়েটার বংশ-পরিচয় অস্পষ্ট; কিন্তু ব্যক্তি-হেনরিয়েটা আঠারো আনা স্পষ্ট।

"তাঁহার পত্নীও আমাকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন। তাঁহার পাশ্চাত্য পোশাক ও রীতিনীতি হিন্দু বালকের পক্ষে বিসদৃশ ও অপ্রীতিকর বলিয়া আমি তাঁহার ক্রোড়ে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ কবিলেও তিনি সমধিক স্নেহবশতঃ আমাকে জোর করিয়া ক্রোড়ে লইয়া মাতৃস্নেহে আমার মুখচুম্বন করিয়া অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন।

* * *

ভাগ্যক্রমে তিনি সতী-সাধ্বী ও পতিগত-প্রাণা পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। সদানন্দময় মধুসূদন ও স্নেহময়ী তৎপত্নী উভয়ের সম্মিলন "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" এই চিরপ্রসিদ্ধ মহাজন বাক্যের সাক্ষ্যস্বরূপ হইয়াছিল। তদীয় পত্নীও তদুপযুক্ত প্রেমময়ী ও আনন্দময়ী ছিলেন। অর্থাভাবে অসহনীয় কষ্ট হইলেও তিনি পতিমুখসন্দর্শনে সকলই বিস্মৃত হইতেন।"[১]

গৌরদাস লিখেছেন—

"He was a happy in her company as possible in this world and she was as faithful as Sabitri herself.

His wife was helpless in his presence, quite powerless to restrain him from extravagance or check him in his imprudence. Poor lady! what could she do? She forgot everything, as she stood by her side, as she looked up to his face, the face of the idol of her heart, the idol she adored and worshipped with all the fondness of womanhood."[২]

পুত্রের স্মৃতিচারণার সঙ্গে পিতার স্মৃতিচারণার কোন অসদ্ভাব নেই। লালবিহারীর চোখে হেনরিয়েটার মাতৃমূর্তি ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় চিত্রেও সে মূর্তির আভাস পাই। এর সঙ্গে আর এক মহিলার সাদৃশ্য পাই। সে মহিলা ধর্মান্তরিত পুত্রকে ক্রুদ্ধ স্বামীর দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে অর্থ সাহায্য করতেন, যে-পুত্র সদম্ভে বন্ধুকে লিখছে যে, সে মায়ের আঁচলের তলায় আবৃত থাকার জন্য জন্মে নি। প্রেমাস্পদা রূপে মধুসূদন জীবনে দুই নারীর সাহচর্য পেয়েছেন; নারী দুইজন, ব্যক্তিত্বও দ্বিবিধ। একজন নিতান্ত প্রেমিকা, আর একজন প্রেমিকার অধিক।

হেনরিয়েটা জননী-সত্তায় প্রকট; মধুসূদন প্রকাশ্য জীবনে অস্বীকার করেছেন জননীকে, গূঢ় জীবনে বরণ করে নিয়েছেন মাতৃ-স্বরূপাকে; তাঁর স্নেহাঞ্চলের জন্য তিনি নিত্য লোভাতুর। শেষে আশ্রয় হিসাবে যা তিনি কামনা করলেন, তা-ও জননীর কোল—'মহীর পদ' শুধু আনুষ্ঠানিক বক্তব্য।

জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম।

যৌবনে ছিল আর একপ্রকার স্পর্ধিত উক্তি—

Dear one! tho' time shall run his race,
Tho' life decay and fade,
Yet I shall love, nor love thee less,
My fond sweet blue-eyed maid.

পরিণত বয়সে পাই স্ত্রীর প্রতি যে সনেট, তা সম্পূর্ণভাবে অনুগত জনের জোবান। সেখানে শুধুই নির্ভরতা, প্রণয়ের ঔদ্ধত্য এবং ইহলোক-অস্বীকৃতি নেই। মাতৃস্নেহের চির-কাঙাল মধুসূদন হেনরিয়েটার মধ্যে তাঁর দোসর খুঁজে পেলেন। রেবেকা প্রেমিকা, আমৃত্যু প্রেমিকা।

সবাই দেখেছে, জীবনে যিনি হেরে গেছেন, কাব্যে তিনিই বিজয়িনী। প্রেমিকারা অনুগমন করে না, সহগমন করে। তারা সমান অধিকার চায়।

মণিপুরের রাজকন্যা রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে নতুন কথা বলেন নি, চিরকালের প্রেমিকাদের মত কথা বলেছেন।

মধুসূদন চিরকালের আস্কারা-পাওয়া ছেলে। দু'টি সহোদরের শৈশবে মৃত্যুতে গৃহের তিনি একমাত্র সান্ত্বনা ও অবলম্বন, অলঙ্কারও বটে। বাল্যে-শৈশবে এই একচ্ছত্র অধিকার তাঁর ভিতরে একটি অতি-অহংবাদী ব্যক্তি-পুরুষের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই প্রকার ব্যক্তি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারে না।

রেবেকার সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ আমরা পেয়েছি, তা থেকে বোঝা যায় তিনি যা চাইতেন, সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেন। তিনি মতামত দিতে গিয়ে নিজের মতই দিতেন, পরমতের প্রতিধ্বনি করতেন না। স্বামীর প্রতিটি মন্তব্য বা মতামতে তাঁর দ্বিধাহীন সমর্থন থাকত না—এ খবর মধুর মাদ্রাজের চিঠি থেকে জানা যায়।

রেবেকা হলেন সমকক্ষা, কখনও কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিনী, প্রেমিকারা সদাই সমকক্ষা। কদাচ নিচু আসন গ্রহণ করে থাকেন। তাই জীবনে অবলম্বনীয়া না হলেও কাব্য-জগতে মধু তাঁর উপর নির্ভর করেছেন। জননী মন্দোদরী, জননী চিত্রাঙ্গদা অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পান প্রমীলা ; তিনিই তো নায়িকা।

সমগ্র 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ শুধু প্রেমিকাদের ভিড়, সব বিক্ষোভ তাঁদের বিক্ষোভ। এমন কি জননী জনার নালিশটা পর্যন্ত পুত্রের বিরুদ্ধে নয়, পতির বিরুদ্ধে।

নারীর কাছে মধু যা চেয়েছিলেন তার অনেকখানিই হোল শুশ্রূষা ও আনুগত্য, সাহচর্য শুধু চান নি। সাহচর্য থেকে তিনি বহুবার বঞ্চিত। স্ত্রীকে রেখে বহুবার তিনি বিদেশে একা জীবন যাপন করেছেন। তিনি চাইতেন অবিরাম আনুগত্য

প্রশ্ন উঠেছে, হেনরিয়েটা কে ?

অনেকে বলেছেন, তিনি মাদ্রাজের জনৈক অধ্যাপকের কন্যা। তিনি জাতে ফরাসী। তথ্যগুলি তলিয়ে দেখা দরকার।

১৮৫৫ সন পর্যন্ত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-মণ্ডলীর তালিকায় কোন ফরাসী অধ্যাপকের নাম পাওয়া যায় নি। শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র মিঃ পেপিনের নামে ভিন্ন গন্ধ আছে, কিন্তু তিনিও ইংরেজ, কারণ তিনি 'পেটি জুরী'তে স্থান চেয়েছিলেন। বিদেশীর পক্ষে এই সম্মান অলভ্য।[৩]

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫৬ সনের শিক্ষক-তালিকায় এন. ডিক ও এ. ডিক (Dique) নামে দুইজন শিক্ষকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এঁরা পঞ্চম ও ষষ্ঠ টিউটর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর জনৈক গবেষক এঁদের ফরাসী বলে অনুমান করেছিলেন, এবং এঁদের সঙ্গে হেনরিয়েটার আত্মীয়তা থাকতে পারে, এই রকম ইঙ্গিত করেছিলেন।[৪] এই সব অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ১৮৫৬ সনে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। সে-যুগে মাদ্রাজে ফরাসীদের সরকারী চাকুরীতে প্রবেশাধিকার ছিল না। ডিক মহাশয়দ্বয় ফরাসী হতে পারেন না। অন্তত ফ্রান্সের নাগরিক নন।

হেনরিয়েটার কুলপরিচয় সম্বন্ধে জীবনীকারদের সর্বাধিক বিভ্রান্ত করেছেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। কেন জানি না, রাসবিহারীর সাক্ষ্যকে সবাই প্রামাণিক ধরেছেন। অথচ রাসবিহারী একেবারে শেষ প্রান্তে মাইকেল ও তাঁর স্ত্রীকে দেখেছেন। যাঁরা প্রথম থেকে দেখছেন, সেই গৌরদাস ও রাজনারায়ণের সাক্ষ্য ভিন্নরূপ।

রাসবিহারী ছিলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয়। মধু ১৮৬৯ সনে প্রথম উত্তরপাড়ায় পদার্পণ করেছেন ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরে। তাঁর পুত্রকন্যা ও স্ত্রী সবে তখন প্যারিস থেকে ফিরছেন। (মে, ১৮৬৯)

এই সময়ে ফরাসী ভাষায় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের সঙ্গে মধু কথাবার্তা বলতেন, ঐ ভাষায় তিনি পুরোপুরি দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। "French which was the vehicle of conversation with his wife and children, he may said to have completely mastered." মধুর স্ত্রী ও পুত্রকন্যা ছয় বৎসর কাল ফ্রান্সে বসবাস করেছেন। ফরাসী জানা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক।[৫]

মধু গ্রীক জানতেন, ল্যাটিন জানতেন, হিব্রু জানতেন, কিন্তু ইংরেজী ব্যতীত কোন আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা জানতেন না। বিশপস্ কলেজ প্রভৃতি শিক্ষালয়ে ধ্রুপদী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাশিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইউরোপ-প্রবাসে মধু জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী ভাষা শিখতে পেরেছিলেন। ফরাসী মেয়েকেই বিয়ে যদি করবেন, তবে ফরাসী ভাষা শিখতে এত বিলম্ব হোল কেন? ১৮৬৫ সনে ২রা জুনের চিঠিতে মধু ইংরেজীতে ডিকটেশন দিচ্ছেন, আর স্ত্রী লিখছেন।

কই, মধুকে তো ফরাসীতে তর্জমা করে দিতে হচ্ছে না? আসলে হেনরিয়েটা ছিলেন ইংরেজ ভদ্রমহিলা। সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য গৌরদাসের। তিনি বলেছেন, তিনি এক ইংরেজ-পত্নী, "She is an English wife."[৬]

দ্বিতীয় সাক্ষ্যও কম মজবুত নয়। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, "তাঁহার ইংরেজ স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন।"[৭] ইংরেজ ও ফরাসীর পার্থক্য তিনি জানতেন। লক্ষ্য করতে হবে, তিনি ইউরোপীয় শব্দটিও ব্যবহার করেন নি। মধুসূদনের নিজের চিঠিতে এ বিষয়ে কোন সংবাদ নেই; শুধু রাজনারায়ণের কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন যে, তাঁর এখন শোক চলছে (আনুষ্ঠানিক অর্থে); কারণ তাঁর স্ত্রীর এক নিকট আত্মীয় লণ্ডনে মারা গেছেন। স্ত্রী ফরাসী হলে যে তাঁর লণ্ডনে কোন আত্মীয় থাকতে পারেন না, তা নয়। তবে ইংরেজ স্ত্রীর আত্মীয়ের লণ্ডনে বসবাস করা অধিকতর সঙ্গত বা স্বাভাবিক।

হেনরিয়েটা ফরাসী নন। তাঁর পিতার নাম পাওয়া যায় নি, তাঁর কুমারী-জীবনের নামও অলব্ধ। তাঁর জন্ম-তারিখটিও কুয়াশাচ্ছন্ন। হেনরিয়েটার মৃত্যু হয় ১৮৭৩ সনে ২৬-এ জুন। লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরখানায় রেজিস্টারে এই তথ্যটি আছে—"26th June, 1873, Emilia Henrietta Sophia Dutt, aged 27 years, wife of Michael; buried by J. Lewis & Co; in a Kutcha grave, 23 fect south of Mrs. L. J. Mc Carthy's headstone, 5th renge of graves, 6th walk South from the 1st gate, the south-east quarter, C. R. B. G." ১৮৭৩ সনে শ্রীযুক্তা দত্তের বয়স ২৭ বৎসর হলে তার জন্ম-সন ধরতে হয় ১৮৪৬ সন; এবং মধু মাদ্রাজ ত্যাগ করেছেন ১৮৫৬ সনে। তখন তাঁর বয়স তা হলে দাঁড়ায় দশ। যে মধু বালিকা-বিবাহের ভয়ে খ্রীস্টান হয়েছিলেন, তিনি যে বিদেশিনী বলেই দশ বৎসরের বালিকার পরিণয়প্রার্থী হবেন, এটা ন্যায়শাস্ত্রের কোন সূত্রের সঙ্গেই মেলে না। দশ বৎসরের বালিকা শারীরিক ভাবেও এক বিবাহিত ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না, মানসিক দিক থেকেও তার সে যোগ্যতা থাকে না।

অধিকন্তু মনে রাখা দরকার যে, মধু এই বালিকাকে সঙ্গে করে আনেন নি। তাঁকে দু' বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল মাদ্রাজে। ১৮৫৮ সনে তিনি কলকাতায় এসেছেন; এবং একাই এসেছেন। সেদিন কলকাতায় মাদ্রাজ

থেকে আসা,-আর আজকের আসা এক নয়। মাদ্রাজ ছিল তখন এতই দূরবর্তী যে এখানে বাস করার জন্য মধু যে জীবিত আছেন, এ খবর অনেকে জানত না। ১৮৫৩ সনে তাঁর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। বারো বৎসরের অনধিক বয়স্কা এক বালিকা সুদূর মাদ্রাজ থেকে তাঁর ঈপ্সিতের আকর্ষণে একাকিনী সমুদ্র পাড়ি দেবেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ নয়। সমাধিলিপিতে যে বয়স উল্লিখিত সেটা কোন ক্রমেই মধুসূদন সরবরাহ করেন নি। মধু তখন সকল ঘটনার বাইরে। হেনরিয়েটার মৃত্যু-সংবাদ তিনি জেনেছেন এক পুরাতন ভৃত্যের মুখ থেকে। সমাধি-পর্ব সমাধা হলে বন্ধুবা মধুব কাছে হাজির হন; এবং শ্রীমতীব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে, এটা তাঁরা জানালেন। মধুর ভূমিকা এখানে কোথায়?

যে-কোন মহিলা (শুধু হেনবিয়েটা কেন?) তের বৎসরে মা হতে পারেন, কিন্তু মধুব প্রেমিকা হতে পারেন না। হতে পারেন না, তাব কাবণ শুধু মধুর ব্যক্তিত্ব নয়, মধুব সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে যে-প্রকার ঘটনার জাল। জনৈক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গবেষক এ বিষয়ে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আলোচনা করে যুক্তি-সম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি লেখেন যে, হেনরিয়েটার জন্ম ১৮৪৬ সনে নয়, ১৮৩৬ সনে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ২৭ বৎসর নয়, ৩৭ বৎসর হয়েছিল।

গবেষকের এই অনুমান মধু-জীবনের অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে প্রতিকূলতা করে না।[৮] এই বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য। হেনরিয়েটার বয়স ১৮৫৬ সনে দাঁড়াচ্ছে উনিশ; মধুর প্রেমিকা হবার যোগ্যতা তখন তিনি অর্জন করেছেন।

মধু নিসঃঙ্গ ও নিঃসম্বল অবস্থাতেই কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। দু'-চার দিন তিনি থাকলেন বিশপস্ কলেজে। কপর্দকশূন্য। বন্ধু গৌরদাস পঞ্চাশটি টাকা পাঠালেন।

কয়েক দিন গৌরদাসের গৃহেও থাকলেন; পরে চলে এলেন কিশোরী-চাঁদের বাগানবাড়ি ১নং দমদম রোডে।

১৮৫৬ সনে জুলাই মাসে পুলিশ কোর্টে তিনি একটি চাকরী পেলেন; বন্ধুবর কিশোরীচাঁদের আনুকূল্যে। মাহিনা খুব কম। তবু দুর্যোগের সমুদ্রে একটি বন্দর বটে।

কিছুকাল পরে মিঃ টুকার (Tucker) বদলী হলে তিনি 'লোভনীয়' পদে উন্নীত হন। মাহিনা তখন দাঁড়াল ১২০ টাকা। এই সময়ের খবরের কাগজে লিখেও হাতে দু'-দশ টাকা পেতেন। কিন্তু মধুর সংবাদপত্র-জগৎ

আর ভালো লাগত না। বিশেষ করে বিদেশী ভাষাকে যখন নমস্কার জানিয়েছেন, তখন আর কেন ?

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে তিনি এই সময়ে যুক্ত হয়ে পড়েন, উদ্দেশ্য 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদ। কিছু বাড়তি অর্থ উপার্জন হোল। তখন মধুসূদন ৬নং চিৎপুর রোডে স্বতন্ত্র বাসা নেন। এখানেই সম্ভবত সর্বপ্রথম হেনরিয়েটাকে দেখা যাবে। কোথা থেকে এলেন, কবে এলেন সব খবরই অন্ধকারে। আর যাই হোক, বিবাহিত অবস্থায় তিনি বন্ধুদের গৃহে একা কালাতিপাত করেন নি। হেনরিয়েটা কলকাতার মেয়ে নন; কারণ সব জীবনীকারই তাঁকে মাদ্রাজের মেয়ে বলেছেন। সম্ভবত এ-খবর লোকমুখে প্রচারিত হলেও সত্যের বিকৃতি নয়।

হেনরিয়েটা পূর্ব-পরিচিতা ছিলেন; কতটা পরিচিতা ছিলেন তা বলা মুশ্‌কিল। তবে যে মেয়ে এক চার-সন্তানের জনককে দু' বৎসর না দেখেও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, তিনি সাধারণ মেয়ে নন। চিৎপুর রোডে হেনরিয়েটা এলেন, এবং মধুর জন্য এক স্বতন্ত্র সংসার গড়ে তুললেন।

১৮৫৯ সনে প্রথমে এলেন কন্যা শর্মিষ্ঠা। ১৮৬১ সনে জুলাই শেষে পুত্র মিলটন এলেন, মধু আবার গৃহী হলেন, কিন্তু সংসারী হলেন কি ?

হেনরিয়েটা তাঁকে গৃহ দিয়েছেন, কিন্তু গৃহী করতে পারেন নি। হেনরিয়েটাকে মধু সহজে পেয়েছেন বলে কি তাঁর সম্বন্ধে তিনি এত মিতবাক্‌ ? চিঠিপত্রে প্রথমা পত্নী সম্বন্ধে যতটুকু খবর আছে, দ্বিতীয়া পত্নী এবং পনেরো বৎসরের সঙ্গিনী হেনরিয়েটা সম্বন্ধে সেই সামান্য পরিমাণ খবরও নেই। প্রথম উল্লেখ পাই ১৮৫৯ সনে ৯ই জানুয়ারি লিখিত পত্রে; তাতে বলছেন, শ্রীমতী দত্ত আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি যেন তাঁর হয়ে তোমাকে তোমার গতকল্যকার পত্রের জন্য ধন্যবাদ দিই এবং এ ধন্যবাদ আমাদের বিষয়ে যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছ, তার জন্যও বটে। রাজনারায়ণের সঙ্গে মধুর পত্রালাপ শুরু হয় ১৮৬০ সনের পরে। বৎসর খানেক একটানা মধুর সঙ্গে জীবন যাপনের পর শ্রীমতী দত্ত কিছু বাংলা শিখে ফেলেছেন। রাজনারায়ণ জানাচ্ছেন যে, তাঁর স্ত্রী 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর প্রথম পাঠিকা। কবি তদুত্তরে লিখলেন, তোমার স্ত্রী 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর প্রথম পাঠিকা নন, লেখকের স্ত্রী দাবি করেছেন যে, তিনি তোমার স্ত্রীর পূর্বে ঐ কাব্য পড়েছেন। হেনরিয়েটা বাংলা জানতেন, বাংলা বলতেন।

তাঁদের প্রথম কন্যার জন্ম-প্রসঙ্গ চিঠিতে স্থান পায় নি; পুত্রের জন্ম-সংবাদ রাজনারায়ণকে দিয়েছেন—আমার একটি ছোট্ট ছেলে জন্মেছে। ঐ একই চিঠিতে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর ভাষা ও ছন্দোরীতির বিশিষ্টতা বন্ধুকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এই পুত্রের ডাকনাম হোল মেঘনাদ।

স্ত্রীর কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হলে শোক পালন করছেন, এ সংবাদ আছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি হলে জলপথে বর্ধমান অবধি পর্যটন করেছেন, সে সংবাদও আছে পত্রে। তবে এ ব্যবস্থা প্রথমা পত্নীর সম্বন্ধেও নিয়েছিলেন। শরীর খারাপ হয়েছে? বেশ, উত্তর-ভারতে হাওয়া বদলাতে যাও।

কিন্তু বালেশ্বরের নাম শুনেই-যে তিনি উদভ্রান্ত হয়ে পড়েন। গৌরদাসকে লিখছেন, আমার যা কিছু আছে, সবই দিতে পারি যদি আমাকে সমুদ্রতীরে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়, বা এমন দেশে যেখানে বসবাস করে আমি ইচ্ছামত দূরগত পাহাড়ের শোভা নিরীক্ষণ করতে পারি। সমুদ্র আর পাহাড়—এই দু'টিই সৃষ্টির মহত্তম নিদর্শন। তুমি যেখানে আছো, সেখান থেকে সমুদ্রের দূরত্ব কেমন? সমুদ্র—উন্মুক্ত সমুদ্র? তুমি কি শুনতে পাও তার প্রচণ্ড গর্জন ও তার অবিশ্রান্ত উথালি-পাথালি! আমার কাছে এ পরিচিত স্বর; ঈশ্বর জানেন কোনদিন আর আমি সেই স্বর শুনতে পাবো কিনা।

একী শুধু প্রকৃতির স্বর? এত বড় মানবতাবাদী কবি প্রকৃতির স্বরে অন্য কোনও স্বরের মিশ্রণ শুনতে পান নি? এ স্বরের যে এত প্রচণ্ডতা, শুধু কি প্রকৃতিসৃষ্ট ও প্রকৃতিপুষ্ট ব'লে?

সব উত্তর স্পষ্ট করা যায় না।

মধু কলকাতায় এসে প্রথম দিকে কেবল পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। ১৮৬০ সনের মধ্যে তার খানিকটা উদ্ধার হোল। জীবন যাপনের নিম্নতম উপায় তিনি তৈরী করতে চাইছিলেন।

চাকরী করছেন দোভাষীর পদে। পছন্দ তাঁর নিজের কতখানি, সে প্রসঙ্গ তুলব না। ১৮৯৩ সনে কিশোরীলাল হালদার মধুর চাকরীর কথা লিখতে গিয়ে লজ্জাভরে বলেছেন, যিনি বাইরন ও স্কটের তুল্য কবিতা লিখতে পারেন, যথেষ্ট যোগ্যতা ও সফলতার সঙ্গে যিনি ইংরেজীতে সংবাদপত্র-সম্পাদনা করতে পারেন, এই রকম একটা খেলো চাকরী তাঁর পক্ষে উপযুক্ত ভাবা হয়েছিল! হালদার মহাশয়ের পরবর্তী বাক্য আরও তীক্ষ্ণ।

"তাঁর দৃষ্টান্ত হোল এমন একটি লোকের দৃষ্টান্ত যার প্রতিভা সন্দেহাতীত, কিন্তু কোন পৃষ্ঠপোষক ছিল না যে, এর মূল্য উপলব্ধি করে। একই সময়ে তাঁর বহু সমসাময়িক, যাঁদের মধ্যে তাঁর প্রতিভা ও কর্মশক্তির এক দশমাংশও দেখা যেত না, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা সাফল্যে ও উন্নতিতে ঝলমল করছিলেন। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যের কোন চিকিৎসা নেই, সরকারী চাকুরীতে এই হোল অভিশাপ ; মুরুব্বীদের জোরে বা আত্মীয়তার সুবাদে এখানে উন্নতি ঘটে।"[৯]

মধুর গুণগ্রাহী সহপাঠী ভোলানাথ চন্দ্র রহস্যভরে বলেছেন—"Madhu's pay was Rs. 120 a month just enough for a dalbhut."[১০]

মধু ছিলেন রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র ; মাদ্রাজে তিনি অনাথ-আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষক, কিন্তু কলকাতায় তিনি রাজনারায়ণের বেটা।

১৮৬২ সন পর্যন্ত এই চাকরী তিনি চালিয়ে গেছেন। উপরওয়ালাদের আনুকূল্য পেয়েছেন ; তাই সাহিত্য-সাধনায় সর্ব সময় নিয়োগ করেছেন। তবু তখনও ভাগ্য-পরিবর্তনের চেষ্টা সমানে করে গেছেন ; বারবার আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

সরকারী চাকরীতে ইস্তাফা দিয়েই তিনি বিলেত যান। পারলে এই সৎ কর্মটি বহু পূর্বেই তিনি করতেন—সম্ভবত 'নীলদর্পণ'-এর ঘটনা একটা সুযোগ উপস্থিত করল।

১৮৫৮-১৮৬২—এই চার বৎসর তাঁর সৃষ্টি-যজ্ঞের কাল—চিৎপুর রোডের ঐ বাড়ি থেকে দুপুরে একবার তিনি অফিসে আসতেন। তারপর আর তিনি গৃহ থেকে বের হতেন না। 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এই পাঁচখানি নাটক রচিত হয়েছে। কোনটিই পূর্ব রচনার অনুকরণ নয়, কোনটিই পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের রচনার মত 'অনুবাদ' নয়। সে-যুগে মৌলিক রচনার গুরুত্ব আজ অনুমান করাও কষ্টকর।

তদুপরি বেরিয়েছে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য,' 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। একটিও আর একটির মত নয়। সবগুলিই নতুন ; সদ্য-ফোটা ফুলের মতন টাটকা ও তাজা। তাদের কথাবস্তু, তাদের ভাষা, তাদের ছন্দ, তাদের ইশারা সম্পূর্ণ তাদের মতই অভিনব। বাংলা

সাহিত্যের শুষ্ক চত্বরে যেন যৌবনের জোয়ার এসে ধাক্কা দিল। *সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গই অভিনব, প্রতি তরঙ্গই উত্তাল!*

অথচ সবই ঘটছে মাত্র চার বৎসরের ভিতর। পূর্বেই বলেছি, এই চার বৎসরের মধ্যে বারবার চেষ্টা করছেন নিজের বৈষয়িক জীবনকে কিভাবে পরিবর্তিত করা যায়। তখনকার ঐশ্বর্য-লিপ্সা তাঁর নিছক 'সাহিত্যিক' স্বপ্ন নয়, তাঁর বস্তু-জীবনের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা। "দশ হাজার টাকা আয় না হলে ভদ্রলোকের মত জীবন যাপন করা যায় না।" এদেশে কৌপীন মাত্র সম্বল ক'রে কাঁচকলা আর আতপ চাল সিদ্ধ খেয়ে জীবন যাপন করাটাকে যাঁরা আদর্শস্থানীয় মনে করেছেন, মধু তাঁদের থেকে পৃথক। খুব খেপে গিয়ে একবার লিখেছিলেন—"There are men whom Nature has given the hearts of bill-collecting Sircars. They would keep their wives and daughters naked (if they could) to save money." [বিদ্যাসাগরকে লিখিত চিঠি; তারিখহীন; সম্ভবত ১৮৬৮ সনের প্রথম ভাগে]।

মধুসূদনের আদর্শ হোল প্রচুর ঐশ্বর্য, এবং অপর্যাপ্ত ভোগোপকরণ অর্জন। "He feared death not because he, of all mortal men, was most unwilling to leave the world which he loved and liked so well."[১০]

শুধু এইটুকু নয়, "অর্থ সঞ্চয় করিয়া রক্ষা করিতে হয়, এ বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। অর্থ থাকুক, বা না থাকুক ব্যয় করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। ধনের কিছু মাত্র মূল্য নাই, ইহাই তিনি জানিতেন।"[১১]

যে-হাতে 'কৃষ্ণকুমারী' লিখেছেন, 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখছেন, সেই হাতেই সদর আইন পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখেছেন! কাব্যের হাত ধরে জীবন এগুতে চায়। "There is to be no Sudder Examination this year, and I am Undecided to what I should do. My friends think that I should keep quiet, till Sharmista is brought out and makes me "Famous". (১৮৫৯, ১৯ মার্চ)। 'শর্মিষ্ঠা' বেরিয়ে গেল; বিখ্যাত আশাতীতভাবে হলেন। কিন্তু সদর আইন পরীক্ষার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল না! বাস্তব জগৎ এমনই বস্তুময়!

১৮৬০ সনে লিখছেন—"I am afraid there will be no Sudder

Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money."

এ চিঠি পড়ে অবাক হতে হয়! অসতর্ক পাঠকেরা কত ব্যথিত হবেন! লিখেছেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'; তবু 'idle verses' লেখার জন্য আপশোস! ইতিমধ্যে পিতৃ-সম্পত্তির কিছুটা উদ্ধার হয়েছে; বার্ষিক আয় আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকার কাছাকাছি বেড়েছে। তবু তো সেই কেরানীর চাকরী করতে হচ্ছে!

"If the world does not care for me, I do not care for it."

এ তো অভিমানের কথা!

রাগ-অভিমান, দুঃখ-কষ্টের ঝড়-তুফানের মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি রচিত। তবু বলব সৃষ্টির মুহূর্ত আনন্দের মুহূর্ত। সে-যন্ত্রণা যে কত আনন্দময়, তা জানেন কেবল জননীরা।

॥ ২ ॥

'রত্নাবলী নাটক' অনুবাদের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছে, কারণ তিনি ভালো ইংরেজি জানেন। যে ভদ্রলোক ১৮৪৯ সনে মাদ্রাজ থেকে লিখেছেন "আমি কি আমার পূর্বপুরুষের ভাষার উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে নিজেকে তৈরি করছি না?" তাঁর উপর দায়িত্ব পড়েছে বাংলা থেকে ভাষান্তরিত করার জন্য! চাকরী হোল দোভাষীর; সাহিত্যে তাঁর দায়িত্ব হবে কি উন্নততর?

অনুবাদের কাজ হাতে নিয়ে এবং নাটকের মহড়া দেখে মধু তাঁর বন্ধুকে বললেন, এমন এক দরিদ্র নাটকের জন্য রাজারা এত অর্থ ব্যয় করবেন, এটা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। আমি যদি আগে জানতাম, আমি তোমাদের নাট্য-শালার উপযুক্ত নাটক লিখে দিতাম।

গৌরদাস বলছেন, তার ঐ কথা শুনে আমি হাসি সংবরণ করতে পারলাম না। ঠাট্টা করে বললাম, তুমি কি চাও বিদ্যাসুন্দরের মত এক জঘন্য নাটক আমরা মঞ্চস্থ করি?

খোঁচাটা তিনি ঠিকই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তবু শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'দেখবে, দেখবে'; এবং সত্যিই তিনি দেখালেন! দুই-এক সপ্তাহের মধ্যেই 'শর্মিষ্ঠা'র প্রথম কয়েকটি দৃশ্য রচিত হয়ে গেল!

এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ক'খানা সংস্কৃত ও বাংলা বই তার আগে এনে পড়েছিলেন, তার সংখ্যা জানবার প্রয়োজন নেই।

এক বৎসর আগে প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে কথাচ্ছলে বলেছিলেন বাঙালী ভাষা মেছুনিদের ভাষা। সংস্কৃত থেকে প্রচুর আমদানি-বাণিজ্য না করলে সে ভাষা ভদ্র ভাষা হবে না।

দেখবেন আমি যে ভাষা সৃষ্টি করব, তাই হবে চিরস্থায়ী।

গৌরদাসের একার ঠোঁটে যতটুকু হাসি ভেসে উঠেছিল, সকলের ঠোঁটে আছড়ে পড়ে তাই অট্টহাসি হয়ে উঠল।

দু' বৎসর আগে 'পৃথিবী' স্থলে 'প্রথিবী' লিখেছিলেন; তবু এবার জোর দিয়ে বললেন—আমি তৎক্ষণাৎ ঠিক করেছি ওঁর সাহায্য বরখাস্ত করব। আমি নিজের পায়ে হয় দাঁড়াব, না হয় পড়ব। আমি চাই না রাম-নারায়ণ আমার বাক্যগুলির ধরন বদলে দেয়—অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে নয়!

শিল্পীর ব্যাকরণ আর পরীক্ষকের ব্যাকরণ পরস্পরে মেলে না। রাম-নারায়ণ যে সামান্য কলম চালিয়েছেন, তার ফলে তাঁর নায়িকাদের ভাষা বড্ড শীতল হয়ে গেছে।

অভিযোগ উঠেছে, সংস্কৃত নাট্য-বিধি মানা হয় নি। 'ভাষা যদি ব্যাকরণ-অসম্মত না হয়, ভাবনাগুলো যদি সঠিক ও উজ্জ্বল হয়, কাহিনীগ্রন্থনা যদি কৌতূহল-জাগানো হয়, চরিত্রগুলি যদি সুসঙ্গত হয়, তাহলে রচনায় বিদেশী হাওয়া বইছে কিনা এ নিয়ে আর কে চিন্তিত হয়!'

এক মুহূর্তে বাংলার প্রাদেশিক (এবং কিছু পরিমাণে গ্রাম্য) সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সদর দরোজায় গিয়ে দাঁড়াল। আজ আর প্রবেশের জন্য অনুমতির অপেক্ষা নয়। 'মুরের কবিতা কি আমরা বাদ দিই, যেহেতু তাতে আছে এশীয় ভাব? বাইরনের কবিতা কি বাদ দিই, যেহেতু তাতে আছে এশীয় আবহাওয়া? কার্লাইলের গদ্যে জার্মান ধাঁচ আছে বলে তাকে কি আমরা নিন্দা করি?'

এসব কথা মধু আগে বলতে পারতেন না, বলেনও নি। আজই বলছেন। মাদ্রাজের বহুপঠন তাঁকে প্রবীণ করেছে—মাদ্রাজেরই বহু ঘটনা তাঁকে প্রাজ্ঞ করেছে।

প্রদেশের গণ্ডি ভেঙে তিনি প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বপ্রাণতা কি করে তিনি অর্জন করলেন?

বাংলাদেশের তখনকার জীবনে আন্তর্জাতিকতা অভিনব প্রত্যয় নয়। রামমোহন রায় ভাঙ্গা পা নিয়ে ফরাসী পতাকাকে অভিবাদন করেছিলেন, দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র একটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করলে তিনি বড় একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ একাধিকবার বিলেতে গেছেন, এটা বড় খবর নয়। কিন্তু তিনি যখন ব্রিটেনের শিল্প-অঞ্চল দেখে স্বদেশে অনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, তখন তা থেকে আন্তর্জাতিকতার নতুন ছবি ফুটে উঠে।

ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের শিক্ষা এবং বেকন, হিউম, টম পেইন, ভলটেয়ার প্রভৃতির রচনা বাংলাদেশে নতুন জীবন-চেতনা এনে দিয়েছিল। সে সবই ছিল মাইকেলের উত্তরাধিকার। উপরন্তু বিদেশিনী বিবাহ কবে বুঝেছিলেন গাত্র-চর্ম মানুষের বহিরাবরণ; মানুষ সর্বদেশে এক এবং অকৃত্রিম। মধুব আন্তর্জাতিকতা যেমন সমষ্টিগত, তেমনি নিতান্ত ব্যক্তিগত।

নানা নিগড ভেঙ্গে তিনি বিশ্বমানবের অঙ্গনে এসে দাঁডালেন। এসে দেখলেন, কবি একা নন, কবিব পাঠকও তৈবি হয়েছে, 'মার্জিত রুচির' পাঠকেব উদ্ভব ঘটে গেছে। প্রাদেশিক সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের ধর্মে ধর্মিত হোল।

'কি লিখছি'-র মতই জরুরী 'কাদেব জন্য লিখছি' এই প্রশ্ন।

'আমি আমার দেশবাসীর সেই অংশের জন্য লিখছি যাঁরা আমার মত ভাবেন, যাঁদের মন মোটামুটি পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তা প্রণালীর দ্বারা প্রভাবিত। আমার উদ্দেশ্য হোল, যা কিছু সংস্কৃত তাব প্রতি যে-দাসসুলভ আনুগত্য আছে তা ছুঁডে ফেলে দেওয়া।'

কবি পাঠককুলের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা দাবি করেছেন। নাটক রচনার ক্ষেত্রে এই সমধর্মিতার যতটুকু আবশ্যকতা, তার থেকে বহুগুণ বেশি আবশ্যক মহাকাব্য রচনার সময়। বরং মহাকাব্য এক যুগের মানুষের সমধর্মিতার শিল্পগত প্রকাশ। এই সমধর্মিতা ব্যতীত মহাকাব্যের মহারথের অগ্রগমনের দ্বিতীয় পথ নেই।

এর পরে এই আহ্বান না জানিয়ে উপায় আছে?

উঠ ত্যজ ঘুম-ঘোর, হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম সৃষ্টি 'শর্মিষ্ঠা'। হেনরিয়েটার সঙ্গে মিলনের পর প্রথম সন্তান শর্মিষ্ঠা।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের নায়িকা তাই দুইজন, শর্মিষ্ঠা আর দেবযানী। উভয়েরই সন্তান-সন্ততি আছে ; এবং বিবাহ কোনটিই শাস্ত্রসম্মত নয়। একটি গান্ধর্ব মতে, অপরটি অসবর্ণ মতে—পাত্র যেহেতু রাজবংশীয়, তাই এখানে অশাস্ত্রীয় শিথিলতায় কোন আপত্তি ওঠেনি।

দেবযানী ব্রাহ্মণী, গুরু-কন্যা। তিনি অহঙ্কারী, স্বাধিকারপ্রমত্তা এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতালোভী। শর্মিষ্ঠা তাব বিপরীত ; রাজকন্যা হলেও তার ভাগ্য মন্দ। রাজকন্যা হয়েও শান্তস্বভাবা। মাদ্রাজ-জীবনের মন্ত্রণা এই নারী-কল্পনার অন্তরে আছে। যন্ত্রণা নেই। কারণ সম্ভবত 'রত্নাবলী'র পরে 'শর্মিষ্ঠা' বলেই শর্মিষ্ঠা যতটা কুলধর্মী, প্রথানুগত, ততটা কবির অনুগত নয়। 'শর্মিষ্ঠা' সৌখীনতার নাটক। 'রত্নাবলী'ব অনুবাদের সময় কবিব মুখ্য ভাবনা ছিল, এ অনুবাদ যেন প্রকৃষ্ট নাট্যীয় ভাষায় সংসাধিত হয়—"I have tried to write in pure Saxon-English, the language of the best dramatists."

শর্মিষ্ঠার সম্মুখে সাহিত্যিক ভাষার কোন আদর্শ ছিল না, ছিল কয়েকজন অনুবাদকদের ভাষা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র ভাষা, বিদ্যাসাগবের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র ভাষা, নন্দকুমার রায়ের 'শকুন্তলা'র ভাষা, সর্বশেষে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'র ভাষা। 'শর্মিষ্ঠা'য় ব্যবহৃত মাইকেল-ভাষার নাট্যীয় উপযোগিতা খুব কম ; এমন কি ভারতচন্দ্র-তুল্য বৈচিত্র্যও নেই।

অথচ 'শর্মিষ্ঠা'র এই সীমিত কৃতিত্ব মধুকে তখন অশেষ প্রশংসা-ভাগী করেছিল।

"The Sharmista has very nearly put me at the head of all Bengali writers."

উন্নত ও শালীন রুচি আর প্রয়োগ-নৈপুণ্য সম্ভবত এই নাটকের এত খ্যাতির কারণ।

সংবাদ-প্রভাকরের সমালোচক তৃতীয় অভিনয়-রাত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখছেন, "আমরা তাহা সন্দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়া যে প্রকার প্রচুরানন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। রঙ্গভূমির শোভা অতি সুন্দর ও মনোহর হইয়াছিল। বিশেষতঃ সভাস্থল বিচিত্র আলোক-

মালায় খচিত হওয়াতে তাহা যকৃত দেবরাজের সভার ন্যায় অনুভূত হইয়াছিল।"[১২] সমালোচনা এই ভাবেই মঞ্চ-সজ্জার প্রশংসা করে এগিয়েছে, শেষ হয়েছে গীত ও বাদ্যের প্রশংসায়; অর্থাৎ নাটকের প্রয়োগ-নৈপুণ্য নাটককে ছাপিয়ে গেছে।

বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদক মহাশয় একই প্রকার সমালোচনা লিখেছিলেন।[১৩]

তবু 'শর্মিষ্ঠা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ নাটক। সে প্রথমত্ব অর্জিত হয়েছে মুখ্যত অনুবাদ-সম্পর্ক শূন্যতার জন্য।

নাটকে পাশ্চাত্য-রীতি মধুসূদন অনুসরণ করেছেন। অঙ্কে-গর্ভাঙ্কে নাট্যবিষয় বিভক্ত হয়েছে।

মহাভারতের গল্প তিনি নিয়েছেন; কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে অনেক আধুনিক ঔচিত্যবোধ স্পন্দিত করেছেন। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—'শর্মিষ্ঠা'কে নাট্যকার মহাভারতীয় অর্থে উপযাচিকা করেন নি। মহাভারতের গল্পের মধ্যে যে বর্বর আদিমতা ছিল, লেখক জানতেন উনিশ শতকের ভিন্ন রুচির পাঠক তা অনুমোদন করবে না। আর তা ছাড়া, সে-যুগে বাংলা-দেশের মেয়েদের উপযাচিকা হবার মত কোন রকম সুযোগ ছিল না। ন'-দশ বৎসর বয়সে পৌঁছাবার পূর্বে তাদের বিয়ে হয়ে যেত। দেবযানী বা শর্মিষ্ঠা চরিত্রে মহাভারতীয় বৈশিষ্ট্য ষোলো আনা বজায় থাকে নি।

মধুসূদন কেন 'শর্মিষ্ঠা'র গল্প নির্বাচন করলেন? আমাদের ধারণা সেই বহুপত্নীক সমাজে এই জাতের গল্প-নির্বাচনে বেলগাছিয়া নাট্যশালার পোষ্টারা অসুখী হন নি। মঞ্চ ছিল মঞ্চকর্তাদের রুচির মঞ্চ। দ্বিতীয় কারণ বোধ হয়, মধুর ব্যক্তি-জীবন। যে-দ্বন্দ্ব অনতিপূর্বে কবির জীবনে অভিনীত হয়ে গেল, সাহিত্যের মঞ্চে তার দোহারকি এড়াতে পারেন নি।

দুই নায়িকা-প্রধান নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র চরিত্রের নির্বাচনে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের প্রভাব আছে। নায়ক-নির্বাচনে অবশ্য সমসাময়িক কালের প্রভাব প্রধান। আত্মসুখপরায়ণ রাজা যে আপন স্বাস্থ্য ও ভোগবাসনা চরিতার্থ করার জন্য আপন পুত্রের আয়ু হরণেও পিছপা হন নি, সে-যুগের বেনিয়ান-মুৎসুদ্দী-সমাজে ভিন্ন ভূষণে এই রকম গল্পের অভাব ছিল না, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। বহু-পত্নীকতা তো সে-যুগের অতি-সাধারণ ঘটনা। বহুপত্নীক সমাজে নারীর কোন স্বতন্ত্র মূল্য দেখা যায় না। মাইকেল সেটা দেখিয়েছেন।

দেবযানী শক্তিময়ী ; তিনি প্রখরা রমণী। আর শর্মিষ্ঠা তার বিপরীত। শর্মিষ্ঠার হাতে নতুন যুগের মশাল নেই।

সে-যুগে অনেকের দুই পত্নী ছিল—স্বয়ং রামমোহনের ছিল। তার জন্য বাড়তি ভর্ৎসনা সইতে হোত না। অথচ মাইকেল জীবনে যা পারেন নি, এই নাটকে তাই করলেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নারী এক ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি-বিনিময় করল একজন পুরুষের সঙ্গে। দেবযানীর মধ্যে নায়িকা হবার যোগ্যতা অধিকতর ছিল, এমন কথা কেউ-কেউ বলেছেন। কথাটা ঠিক। মাইকেলের সাহিত্যে নারীর জননী-পরিচয় প্রধান হয়ে ওঠে না, প্রেমিকা-পরিচয় প্রধান। সাহিত্য সর্বদা জীবনের সহিত নয়, কখনও-কখনও বিপরীত। তবু এ নাটকে শর্মিষ্ঠা নায়িকা হয়েছে, দেবযানী নয়। মাইকেল তখনও আপন মানস-ভূগোলের সবটুকু ভূমি দখল করতে পারেন নি। পরকে জানার মত নিজেকে জানা যত্নসাপেক্ষ।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সাফল্য মধুসূদনকে অনুপ্রাণিত করে। "I have got the taste of blood."

আমি রক্তের স্বাদ পেয়েছি।

'পদ্মাবতী' ১৮৬০ সনে রচিত হোল, কিন্তু মঞ্চস্থ হোল না।

'শর্মিষ্ঠা' মহাভারতের কাহিনী নিয়ে লিখিত। তখনও পুরাণের কাহিনীতে নতুন দ্যোতনা দেবার মত শক্তি তিনি অর্জন করেন নি। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে দেখছি নতুন যুগের রুচিবোধ, কিন্তু নতুন যুগের আখ্যায়িকা নয়।

'পদ্মাবতী'তে এসে পথ বদলালেন। চলে গেলেন গ্রীক পুরাণ-ভূখণ্ডে ; সেই বিদেশী ভূখণ্ড পরিণত হোল ভারতীয় পুরাণের একটি বিশেষ কাহিনীর গোপন বিচরণ-ক্ষেত্রে।

'পদ্মাবতী'র প্রথম অঙ্ক গ্রীক পুরাণের গল্প অবলম্বনে গাঁথা। বাহ্যত 'পদ্মাবতী নাটকে'র সংঘাত কেন্দ্রীভূত হয়েছে শচী-মুরজা-রতির পারস্পরিক কোঁদলে। কিন্তু গূঢ়ত নাটকের কেন্দ্রীয় সংঘাত ঘটেছে ভাগ্যবিপর্যস্তা নারীর সঙ্গে অবিবেচক বাস্তবের দ্বন্দ্বে। জলস্রোত বাধা পেলে ঘূর্ণি তোলে ; কিন্তু এখানে সে ঘূর্ণি নেই, তার কারণ এখানকার জল বোবা জল।

শচী-মুরজা-রতি জীবন্ত চরিত্র নয়, কলহ-পরায়ণতা জীবনের চিহ্ন নয়।

'মায়া-কাননে' এই অপূর্ণতার পরিসমাপ্তি হবে।

পদ্মাবতীর অবয়বে গ্রীক মায়া-হস্তের প্রলেপ আছে, কিন্তু আবরণ ভেদ করে সে প্রলেপ অন্তরে পৌঁছায় নি। সেখানে বিরাজ করছে ভারতীয় পুরাণের এক কোমলতম আখ্যান।

দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে তার সূচনা। পট বেচতে এসেছেন এক চিত্রকরী। তাঁর ঝুলির বহু পটের মধ্যে একটি পট ছিল নিম্নরূপ—

অশোক কাননে সীতা দেবী রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদছেন।

সীতাদেবী মধুসূদনের সাহিত্যে মাদ্রাজ থেকেই বারবার আসছেন—কিন্তু স্ব-বিরোধিতার বিড়ম্বনা নিয়ে।

'ক্যাপটিব লেডি'তে ওঁর প্রসঙ্গে লিখেছেন—ভক্তের চোখে, প্রেমিকের হৃদয়ে।

কিন্তু 'The Anglo-Saxon and the Hindu'-তে লিখছেন বিদ্বিষ্টের বক্রতায়, সমালোচকের সমার্জনী তুলে।

কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা'য় এসে সীতা সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেলেছেন। লঙ্কা কি তখন আদরণীয় ও উল্লেখনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে? লঙ্কার পূর্ণ সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত না হলে মাইকেলের রামায়ণ-ভাবনার পূর্ণ পরিণতি সম্ভব হবে না। এখানেই তাঁর স্বতন্ত্রতা।

'পদ্মাবতী'র রামায়ণ-অনুষঙ্গ তাঁর কাহিনী-নির্বাচন-ভাবনার একটি স্তর তৈরি করেছে—কী করে স্থূলও দৃশ্য ঘটনার অন্তরালে অদৃশ্য ভাবনা সঙ্কলিত করা যায়, সে নৈপুণ্য অচিরে আয়ত্ত করতে হবে।

'ক্যাপটিব লেডি' বা 'এ্যাংলো-স্যাকসন এণ্ড দি হিন্দু'-গ্রন্থে লঙ্কা পরিদৃশ্যমান, 'পদ্মাবতী'তে নয়। তবে কি সীতা-অনুষঙ্গ প্রভুত্ব করায় লঙ্কা আত্মগোপন করেছে?

বৈদেহীর দুঃখে পদ্মাবতীর চোখে জল দেখা দিল। প্রসঙ্গটি তৃতীয় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্ক থেকে বিশদ হতে লাগল।

পারি। হায়, এ মহাপুরুষ কোথায়?

সখী। সুমেরু পর্বত যে কোথায় তা কে বলতে পারে? কনকলঙ্কা কি লোকে আর এখন দেখতে পাবে?

* * *

সখী। তা এ মায়ার হেমমৃগ ধরা তো আমার কর্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে, কোন্ গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে

বলতে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এর প্রতি লোভ করেও অবশেষে সীতা দেবীর মতন কোন ক্লেশে না পড়েন। (৩/১)

*　　*　　*　　*

নেপথ্যে।. তুই বেটা কি সামান্য চোর? তুই যে দ্বিতীয় হনুমান।

ঐ। কেন! হনুমান কেন?

ঐ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস? দেখ দেখি যেমন হনুমান রাবণের মধুবন লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহারাজের অমৃত ফল বনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস। (৩/২)

চতুর্থ অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কে কলি ছদ্মবেশ ধারণ করে পদ্মাবতীকে অপহরণ করে পালাচ্ছে; কিন্তু ভিতরের গল্প হোল সীতাহরণ—যা 'ক্যাপটিব লেডি'তে আভাষিত হয়েছিল।

কলি। রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
　　কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
　　সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে!

নায়িকা পদ্মাবতীর নিজের জীবনীতে ঐ বক্তব্য বিশদতর হোল।

পদ্মা। হে প্রাণেশ্বর, যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনি কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন। ৪/২

বিরহসন্তপ্ত ইন্দ্রনীল এই ভাববস্তুকে ঘনীভূত করলেন।

রাজা। সখে, এ সুবর্ণলতাটি যে আমার হৃদয়ভূমি থেকে কোন্ নিশাচর চুরি করো নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে দিতে পারে না? হে পক্ষিরাজ জটায়ু, তোমার তুল্য পরোপকারী কি বিহঙ্গমকুলে আর কেউ নাই? হায়! (৪/৩)

নাটকের উপসংহারে নারদ এই ছদ্মবেশক কাহিনীর আবরণ উন্মোচন করলেন—

হে মহীপতে, যেমন মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশরথি ভগবতী

বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অদ্য তদ্রূপ মহিষী পদ্মাবতীকে এই স্থলে লাভ কল্যেন। (৫/২)

অশোক-কাননে সীতার বন্দিনীদশা থেকে যাত্রা শুরু করে সীতা-উদ্ধারে নাটকের পরিসমাপ্তি হোল। সবই ঘটেছে রূপকের আড়ালে। এ হোল নাটকের আড়ালে নাটক। সমালোচকেরা বলেছেন, কাহিনীর বাইরের দিকে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও, এর অন্তরের আদর্শ দেশীয়।

কথাটা যথার্থ হলেও বিশিষ্টার্থক নয়। বাইরে গ্রীক পুরাণ, রূপকথা, এমন কি কালিদাসের শকুন্তলার সম্মতি থাকলেও অন্তরে রয়েছে রাম-কথা। শুধু সেই রাম-কথা তখন দ্বিতীয় অর্থে ব্যঞ্জিত হয় নি।

অথচ এই রাম-কথা মাইকেলের হাতে এক বীণাযন্ত্র, সপ্তস্বরা। বারংবার বাজাতে-বাজাতে একদিন অকস্মাৎ তাঁর অন্তরতম বাণী (যুগবাণীও বটে) ঐ যন্ত্রে মুখর হয়ে উঠবে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' একদিনের সাধনায় তো সম্ভব নয়।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' পৌঁছে কবির কল্পনা তার সঙ্গত ও সার্থক পরিণতি খুঁজে পেল। কিন্তু প্রস্ফুটিত পুষ্প বহুদিনের আয়োজনের পরিণতি। রাম-কাহিনীর এ-পর্ব, ঐ-পর্ব, নানা পর্ব তিনি নানাভাবে বাজাবেন, শেষে অকস্মাৎ রাবণ-প্রসঙ্গ অনন্য ইঙ্গিতে দীপ্তিময় হয়ে উঠবে।

এত যত্নে যে নাটক রচিত হোল, তা মঞ্চে অবতারিত হোল না। যতীন্দ্র-মোহন লিখছেন— "নাটকটি শর্মিষ্ঠার নাট্যকারের উপযুক্ত রচনা; কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন, প্রিয় মহাশয়, যদি আমি দৈত্যরাজবালার প্রতি আজও পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করে থাকি।"

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ যে মঞ্চের অবলম্বন, সেখানে পদ্মাবতী অনুগ্রহ পেল না। বহুপত্নীকতা যে সমাজের ব্যসন, সেখানে একপত্নীপ্রেম সমাদর পায় কি করে? পদ্মাবতী নিগৃহীতা নারীত্বের নাটক— সীতা কি কখনও রাজসভায় সমাদর পেয়েছেন? রাম-সভায়?

পদ্মাবতীর বক্তব্যে প্রতিভার সেই পূর্ণ-প্রজ্বলন নেই, যদিও গল্প-গ্রন্থনায় অভিনবত্ব সুপ্রচুর। নাটক শব্দপ্রধান, বাক্যপ্রধান। শব্দ ও বাক্য যখন ওষ্ঠে আশ্রয়লাভ করে, তখন তার মধ্যে সজীবতা প্রয়োজন।

লিখিত বাক্যে রচয়িতার উচ্চারণ-রীতির বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ছাপ থাকে না, কিন্তু কথিত বাক্যে ঐসব দায়ভাগ অঙ্গীকৃত হয়।

নাটকের ভাষা কি হওয়া উচিত এ নিয়ে পদ্মাবতীতে নাট্যকারের সঙ্গে মধুসূদনের তর্ক হয়ে গেল।

"আমার অভিমত আমাদের নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হবে, গদ্যে নয়।"

অথচ তিনি গদ্যেই নাটক লিখছেন, আর অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ-কুশলতা দেখাবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সংলাপ বেছে নিলেন। এমনও নয় যে, বিশেষ আবেগ ফুটাবার জন্য তিনি কয়েকটি স্থলে ঐ বিশেষ ছন্দ বেছে নিয়েছেন। অন্তত তার কোন প্রমাণ আমরা পাই না। নাটকের ভাষা আর নাটকের মেজাজ সৌহার্দ্যে পৌঁছাতে পারে নি। সে কি নাট্যকারের অপরাধে? নাটক জনরুচির কুটুম্ব।

একই পথে কৃষ্ণকুমারী এসেছে; নাটকের রচনারীতি, অন্তত নায়িকা-নির্বাচনের দিক থেকে।

অবশেষে রাজকন্যা পদ্মাবতী মিলিত হতে পেরেছিল তার দয়িতের সঙ্গে, আর কৃষ্ণা আত্মবিসর্জনে বাধ্য হয়েছে। দু' জনেই প্রেমিকা, অসাধারণ মানসিক শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। প্রতিকূল পরিবেশের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে নি; এই বিদ্রোহে নবীন নারী-ভাবনার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। প্রমীলা সহমরণে গিয়েও বিদ্রোহিনী নারী। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ইতিহাস-আশ্রিত নাটক। ইতিহাস আর পুরাণ ভারতীয় সাহিত্যে একই শব্দের দুই অভিধা।

'পদ্মাবতী'তে নিয়তিকে চোখে দেখা যায়। কলি নিয়তির ভূমিকা নিয়েছে; 'কৃষ্ণকুমারী'তে নিয়তি দুর্লক্ষ্য। দুর্লক্ষ্য বলেই স্পষ্ট এবং পূর্ণ। মদনিকা বা ধনদাস তার দূত মাত্র।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' দেবতারা চক্রান্ত জাল কেঁদেছেন, কিন্তু তাঁদের সাধ্য কি যে তাঁরা বাসবত্রাস ইন্দ্রজিৎ-নিধনে সমর্থ হন! অন্য কোন শক্তি রাবণের দুর্গতির হেতু।

এইভাবে ভবিতব্য ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-খুশি থেকে স'রে এক দুর্নিরীক্ষ্য শক্তিতে রূপান্তরিত হোল। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' সময়ের বিচারে শুধু নয়, ভাবের নৈকট্যে সমকালীন। নিয়তি-প্রশ্নে 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে মিল আছে।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' ভাষার সঙ্গে বিষয়ের সামঞ্জস্য ঘটে নি। বিষয়ের বুকে যে ঝড়, অশনি-নির্ঘোষ আছে, ভাষার বুকে তার ঝাপ্‌টা-ঝলক লাগে

নি। চরিত্রের বর্ণিত বিবরণে তাই উত্থান-পতন থাকল, চরিত্রের ব্যক্ত আচরণে বা ভাষণে থাকল না। বিষয়ের মত ভাষা যদি ঐ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় আথলি-পাথালি করতে পারত, যেমন করছে 'ম্যাকবেথে'—

'Or, to take up arms
Against a sea of troubles.'

তাহলে এ-নাটক দ্বিতীয় 'কিং লিয়ার' হোত কিনা জানি না, কিন্তু এ-নাটক সফল নাটক হোত।

ভীমসিংহের আর্তনাদ শুধু আর্তস্বরে নিনাদিত হোল, আত্মস্পৃষ্ট হোল না। রাবণের সার্থকতা ভীমসিংহে নেই, এক যুগে জন্মে একই লেখকের লেখনীপ্রসূত হয়ে ভাষার বিভিন্নতার দরুন দু'য়ের প্রকাশ দ্বিবিধ হোল। বোধের একান্ত গভীরতায় সৃষ্টির রসরূপ সবটা ফোটে না। সাহিত্য এই কারণে কারুকলাও বটে।

॥ ৩ ॥

মধুসূদনের তিনটি গম্ভীর নাটকের নামকরণ ঘটল স্ত্রী-চরিত্রের নামানুসারে। যে-সমাজে স্ত্রীজাতির সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব নেই, সেই সমাজে নাটকের নাম পর্যন্ত তারা দখল করে ফেলেছে। ব্যাপারটির গুরুত্ব আছে। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত যে সামাজিক আন্দোলন, তার আবেদন ছিল সর্বব্যাপী। তার সঙ্গে নারী-সম্বন্ধে ইউরোপীয় সাহিত্যের রোম্যান্টিকতার প্রভাব রয়েছে।

মধু মাদ্রাজ থেকে ফিরেছেন দু'বৎসর মাত্র; মাদ্রাজে বসবাসকালে তিনি চলমান জীবনের পায়ে পায়ে ফিরেছেন; প্রতিটি সাময়িক ঘটনার খুঁটি তিনি চেপে ধরেছেন। সাময়িক পত্রের লেখক ছিলেন মধু। সময়ের বন্দনা না গেয়ে তাঁর অব্যাহতি ছিল না।

মাদ্রাজে বসবাস করে তিনি কলকাতার সংবাদের উপর অবিরাম মন্তব্য করতেন। বাংলাদেশের সামাজিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তিনি সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকতেন। দূরে থাকলেও তিনি ছিলেন ভিতরে, অন্তর্ভুক্ত। এমনই বোধ হোত।

কলকাতার সমাজ-জীবনে তত্ত্ববোধিনী সভা, বেথুন সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি তাঁর অনুপস্থিতি-কালে বেশ জেঁকে বসেছিল।

বেঙ্গল স্পেকটেটারে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে সেই ১৮৪২ সনে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। কিন্তু জোরালো পুস্তিকা 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৫৫ সনে জানুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বহুবিবাহ রহিত করার জন্যও আন্দোলন হোল। ১৮৫৫ সনে ২৭-এ ডিসেম্বর এর পক্ষে এক আবেদন-পত্র রচিত হোল। ১৮৫৭ সনে ১৬ই জুলাই বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হোল; এবং ৭ই ডিসেম্বর বিধবার প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হোল। বহুবিবাহ অবশ্য বিধিবদ্ধভাবে রদ হোল না।

কলকাতার বিষয়-জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। ১৮৫৪ সনে ডাঃ ও' শগ্‌নেসীর প্রচেষ্টায় বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হয়। ঐ বৎসরই ১লা সেপ্টেম্বর পাণ্ডুয়া থেকে হাওড়া পর্যন্ত রেললাইন পাতা হয়ে যায়। কলকাতা শহরে গ্যাসের বাতিও জ্বলতে শুরু করে। মাদ্রাজ থেকে এসে মাইকেল এই পরিবর্তিত কলকাতা নগরীকেই দেখলেন।

কলকাতায় তখন সভা-সমিতি নতুন নতুন গড়ে উঠেছে; মদ্যপান নিরোধের জন্য সভা হয়েছে। আবার মদ্যপান না হলে সভা আদৌ অনুষ্ঠিত হয় না, এমন উদাহরণ সুপ্রচুর।

আধুনিকতা যেমন মধ্যবিত্তের বিকাশে সহায়তা করছে, তেমনি আধুনিকতার বিস্তৃতি তার বিকাশে প্রতিবন্ধকতাও করেছে। ঈশ্বর-বিশ্বাস বা নাস্তিকতা আধুনিক যুগের দুই বিরোধী জীবনবোধ; ঈশ্বর-বিশ্বাসী রামমোহন বা নাস্তিক অক্ষয়কুমার দত্ত জীবনের সুস্থ দিককেই আলোকিত করেছেন। কিন্তু আধুনিকতার অর্থ যখন মদ্যপান ও স্বেচ্ছাচারিতা হয়ে দাঁড়াল, তখন সেটা বিপদসূচক।

মাইকেল নিজে মদ্যপ ছিলেন, কিন্তু মদ্যপায়ীদের অনাচার ফাঁস করে দিতে ইতস্তত করেন নি। মাইকেল নিজে নতুন সভা-সমিতির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু নীতিভ্রষ্ট সভা-সমিতির অনাচার প্রকাশ করে দিলেন।

মাইকেল এক পত্নী ত্যাগ করে আর এক পত্নী গ্রহণ করেছেন; কিন্তু বিবাহিতা পত্নীর জীবন বিড়ম্বিত করে বেশ্যালয়ে রাত্রি যাপন সমর্থন করেন নি। মাইকেল পিতার ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু মাইকেল পিতার অর্থে অনাচারী হওয়া পছন্দ করেন নি। স্বেচ্ছাচার আর অনাচার এক নয়।

'একেই কি বলে সভ্যতা' তাঁর প্রহসন জাতীয় রচনা, কমেডির পর্যায়ে পড়ে। তিনি ল্যাটিন কমেডির আদর্শে এই নাটকটি লিখেছেন। গ্রীক কমেডিতে সমাজ বা ব্যক্তির সমালোচনা প্রধান। শেক্সপীয়র কমেডিতেও সমালোচনা আছে, তবে তা আত্মীয়োচিত। মাইকেল ল্যাটিন আদর্শটি বেছে নিলেন, কারণ গ্রীক লেখকদের মত সেদিন কমেডিকে ট্রাজেডির সমকক্ষ সাহিত্য-শাখা বলে তিনি মনে করেন নি। 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'-দু'টি নাটিকাই তিনি 'afterpieces' হিসাবে তৈরী করেছেন; বড় নাটকের সহযোগী রঙ-তামাসা। উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দর্শক মনোরঞ্জন নয়, তার সঙ্গে নীতিশিক্ষা। সুন্দরের সঙ্গে শিবের মিলন।

যাঁরা সমাজকে অস্বীকার করেন, বিদ্রোহ করেন, তাঁরা মাইকেলের চোখে শত্রু নন; কিন্তু যারা নতুন সমাজের সকল সুবিধা ভোগ করে অথচ তাকে বিকৃত করে, মাইকেলের চোখে তারাই হোল দুশমন—শুধু দেশের নয়, আধুনিকতারও। মাইকেলের আদর্শ, সুন্দরের সঙ্গে শুধু বিত্তার মিলন নয়।

মধুসূদন দিয়েছেন ভবিষ্যতের আদর্শ—কারণ তাঁর নাটকে কোন অনাচার ছিল না, শৈথিল্য ছিল না। তবু বলব মধুসূদন মহৎ নাটক লেখেন নি—কারণ "Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice"—সেই কলম-চালনার সুযোগ তিনি আশানুরূপ পেলেন না।

রাবণের জীবনে যে পূর্ণতার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, ভীম সিংহে কেন তার সমর্থন থাকল না? জীবনের স্বপ্নে স্বপ্নাতুর হয়ে যারা ব্যর্থ, তাদের জন্য তাঁর অন্তরে রয়েছে অপরিসীম বেদনা। আর যারা প্রতি মুহূর্তে সেই স্বপ্নকে বিকৃত করে, তাদের জন্য রয়েছে তাঁর ভর্ৎসনা। কমেডির প্রতিভা আর ট্রাজেডির প্রতিভার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, মধুসূদন এটা জানতেন; যেমন ক'রে এটা জানতেন বিশ্বের বহু বড়-বড় নাট্যকার—শেক্সপীয়র, ইবসেন এবং চেখব। মধুসূদনের নাট্যকৃতি এঁদের পর্যায়ের নয়, কিন্তু তাঁর নাট্যবোধ এঁদের সমগোত্রীয়। আর তাঁর জীবনের মত তাঁর নাট্যবোধও ধাপে ধাপে গড়ে উঠছিল—Perfection can only be attained by long practice —শুধু আঙ্গিক-কুশলতার প্রশ্নে সত্য হয় নি; অন্তত মধুসূদন তা বলেন না। ভক্তপ্রসাদ বা নবকুমার, বাচস্পতিমশাই বা হরকামিনী আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে; তবে তাদের মধ্যে সেই চমৎকারিত্ব নেই, যা মলিয়েরের

নাটকে বা শেক্সপীয়রের কমেডিতে, এমন কি দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বা 'সধবার একাদশী'র কোন কোন অংশে নির্দ্বিধায় আছে।

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র পাণ্ডুলিপি তৈরি হলে তিনি লিখছেন, "মনে রেখো তোমরা প্রহসনের বেলা আমার দু'টি ডানা ভেঙ্গে দিয়েছ। এইবারও যদি তোমরা একই প্রকার কৌশল অবলম্বন করো, তাহলে আমি বাংলা লেখাই ছেড়ে দেব এবং হিব্রু অথবা চীনা ভাষায় বই লিখব।" মধু কি আশা করেছিলেন যে, এতে তাঁব দেশবাসী বিচলিত হবে? মধু তাঁর দেশকে ভালবেসে দেশবাসীকে চিনতে পারেন নি।

"পুবাতন প্রেমাস্পদের কাছ থেকে বর্তমানে আর এক সাহিত্য শাখা আমাব অন্তরকে টানছে।" বন্ধুরা একটা হিতকর কাজ করলেন।

মাইকেল-প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঐ অঙ্গনে ঘটল।

॥ ৪ ॥

১৮৬০ সনে 'পদ্মাবতী নাটক' রচনাকালে তিনি নাকি বাজি বেখে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বেঁধেছিলেন।

বেলগাছিয়া ভিলাব একটি কক্ষ। নীচুতলার কক্ষ। মহামান্য বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই আছেন—প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও আরো অনেকে। তৎসহ পুলিশ কোর্টেব একশত কুড়ি টাকার বেতনের এক কেরানী। সেই কেরানী ব'লে বসলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার না করলে বাংলা নাটকের সত্যিকার কোন উন্নতি হবে না।

যতীন্দ্রমোহন বললেন, বাংলা ভাষায় সম্ভবত অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আমাদের ভাষার প্রকৃতি আলাদা। যুক্তিটাকে টেকসই করার জন্য তিনি বললেন, ফরাসী ভাষা তো খুব উন্নত; কিন্তু ঐ ভাষাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নেই।

মধু বললেন, তোমরা ভুলে যাচ্ছ বাংলা ভাষার জননী হচ্ছে সংস্কৃত।

বলে কি! মাদ্রাজী খ্রীস্টান কালো সাহেব! 'প্রথিবী' লিখেছে যে এক বৎসর পূর্বে!

মধু আরও জানতেন রোম্যান্টিক নাটক একটু শব্দবহুল,—ঝঙ্কারবহুল ভাষায় ভাল মানায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সেই অবকাশ দিতে পারে।

এই তর্কাতর্কির ফল হোল মধুসূদন-কর্তৃক বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর

ছন্দের প্রবর্তন। যতীন্দ্রমোহন তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, এর পরই 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচিত হয়। "এই আলোচনার তিন চার দিন পরেই তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ আমার কাছে পাঠান হোল।" সম্ভবত এই তথ্যে একটু ভুল আছে। কারণ 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র পূর্বে 'পদ্মাবতী নাটকে' মধুসূদন এই ছন্দের প্রথম প্রয়োগ দেখান।

'পদ্মাবতী নাটকে'র চতুর্থ অঙ্কে ১ম ও ২য় গর্ভাঙ্কে মধু অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন।

'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ও তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের আপত্তিতে তিনি বিরত হন।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম দুই সর্গ ১৮৫৯ সনের মাঝামাঝি সময়ে তিনি রচনা করেন। ঐ বৎসর জুলাই-আগস্ট মাসে বিবিধার্থ সংগ্রহে (ষষ্ঠ পর্ব) প্রকাশিত হয়।

'তিলোত্তমাসম্ভব' যেন একটি মধুর স্বপ্ন। এবং এখানে কোন স্বপ্নভঙ্গ নেই—সুন্দ-উপসুন্দের মৃত্যু সত্ত্বেও নেই।

কবি মধুসূদনের জীবনের মধুরতম স্মৃতির উত্তাপে এ-কাব্যের মর্মবস্তু ফুটেছে। 'ক্যাপটিব লেডি'র ভূমিকায় মাদ্রাজের সমুদ্রসৈকতে ভালো-লাগার পক্ষে যে-উচ্চভাষী রমণীয় উক্তি আছে, তার সঙ্গেই কেবল এর সাদৃশ্য। কীট্সের পক্ষী-কূজন অবসানে সেই বিস্ময়-ভরা প্রশ্ন এই কাব্যপাঠ শেষে উচ্চারিত হতে পারে।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র অব্যবহিত পূর্বে লেখা দু'টি উল্লেখযোগ্য কাব্য হোল 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'। কিন্তু মাইকেল বিদ্যাসুন্দরের কবিকেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করেছেন, যেহেতু তিনি মনে করতেন তাঁর কাব্যপ্রয়াস ভারতচন্দ্রের বিকল্প। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগীয় কাব্যের শেষ শিল্পী এবং সফলতম শিল্পী।

ভারতচন্দ্রের সময়েই পুরাতন যুগের অবসান সূচিত হয়েছে—রাজছত্র ভেঙে পড়েছে—সেই সঙ্গে পুরাতন মূল্যবোধ। তিনি জেনেছিলেন 'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়?'

কিন্তু তিনি পারেন নি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রেমিকা-রূপে সৃষ্টি করতে: সে প্রেমাস্পদা হয়েও প্রণয়িনী হতে পারে নি, কারণ বহু বিদ্যায় বিদ্যাবতী

হয়েও সে নিছক রতি-চর্চা ছাড়া আত্মিক সার্থকতার অন্য পথ খুঁজে পেল না।

বৃত্ত সঙ্কুচিত হলে জীবন বিকৃত হয়। তাই অন্নদামঙ্গলে শিব শুধু ভিখারী, উমা নিতান্ত কলহপরায়ণা।

ভারতচন্দ্রের বুকের মধ্যে চাপা আর্তনাদ ছিল, কিন্তু বাইরে প্রকাশ ঘটেছে অবিশ্বাসীর হাসিতে।

কবি রঙ্গলাল পরিবর্তিত যুগের কবি—নতুন রাজনৈতিক পট তখন শুধু নয়, নতুন মানসিক মানচিত্রও উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। রঙ্গলাল পরিবর্তিত জীবনের কবি, পরিবর্তিত রসের কবি।

"হে স্বদেশীয় মহাশয়বর্গ—, আপনারা ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের কবিতায় প্রেম পরিহারপূর্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রীতিরসে প্রবৃত্ত হউন।"[১৪] কবির এই আহ্বান শুষ্ক তথ্যের আহ্বান, বা তত্ত্বের আহ্বান নয়। তিনি কলম ধরে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, নব্য রুচির কবিতা কাকে বলে, কেমন। একথা সত্য যে, রঙ্গলালের পদ্মিনী কামের মন্দির নয়, সৌন্দর্যের দিব্য দেউল। রঙ্গলাল পদ্মিনীকে কেবল গৃহলক্ষ্মী বা সৌন্দর্য-লক্ষ্মী করেন নি, দেশলক্ষ্মীও করেছেন। এইভাবে আদর্শ নারী-কল্পনার সঙ্গে স্বদেশ-কল্পনা মিশে গেল। এই মিশ্রণ 'সিপাহী-বিদ্রোহ' কালে স্বজাতির বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত হেতু নয় তো?

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' বিদেহ সৌন্দর্যের প্রতি মধুসূদনের অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। তার সঙ্গে দেশপ্রাণতার কোন যোগ নেই। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' রোম্যান্টিকতার নিঃসংশয়িত প্রকাশ; যদিও এই যুগ বিশ্বাসপ্রবণতার যুগ। মধ্যবিত্ত বাঙালী তার আত্ম-প্রসারের সম্ভাবনায় আশাবাদী হয়ে উঠেছে।

সমালোচকেরা কেউ-কেউ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন—কি করে একই কালে দু'টি প্রহসন ও 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র ন্যায় একটি কাব্য রচিত হোল।

"It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama."[১৫]

জীবন যখন প্রস্ফুটিত, তখন সবই সহজে আত্মপ্রকাশ করে—ঘৃণা, দ্বেষ, দয়া, করুণা, হাসি ও কান্না। এই কারণে সেই ঐশ্বর্যবান যুগে শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন বৃত্তির অবারিত উপস্থিতি দেখলে বিস্মিত হবার কি থাকতে পারে!

কবি মধুসূদন এক বিস্ময়কর পূর্ণ প্রস্ফুটিত ব্যক্তিত্ব; তাই নানা বৃত্তি তাঁর সৃষ্টিতে স্বচ্ছন্দে বিহার করেছে। এবং এক মেজাজ থেকে অন্য মেজাজে তিনি অবাধে যাতায়াত করেছেন। গভীর আনন্দ-নন্দিত মুহূর্তে তাঁর দুই চক্ষু জলে ভরে ওঠে, আবার বেদনার গাঢ়কৃষ্ণ পরিবেশে অট্টহাসিতে তিনি ফেটে পড়েন। ধৈবত থেকে ঋষভে নামতে তাঁর গলা একটুও কাঁপে না।

নব্য বাংলার এই হঠাৎ-উদ্ভাসিত মুহূর্তে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র সৃষ্টি। তাই 'তিলোত্তমাসম্ভব' নব্য বাংলার প্রথম কাব্য। এই প্রকার রোমান্টিকতা বাংলা কাব্যে পরেও খুব বেশি দেখা দেয় নি, পূর্বে তো ছিলই না। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের সঙ্গেই কেবল তার তুলনা চলে। 'মানসী' কাব্যের কথাও মনে পড়তে পারে। কিন্তু 'মানসী' মনস্তাপের ধূমে আচ্ছন্ন, উল্লাসের রৌদ্রকরোজ্জ্বল্যে ঝলমলিয়ে ওঠে নি।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'কে সে-যুগের সমালোচকেরা সঠিক মূল্যায়িত করেছিলেন। এ-যুগে এ-কাব্য উপেক্ষিত। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র নায়িকা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের নায়িকা-অন্বেষণের আদিতম নিশানা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র রহস্যময়তা ভুঁইফোড় নয়। 'তিলোত্তমা' তার পূর্বে এসে নারীর প্রয়োজনাতীত স্বরূপ ফুটিয়ে দিয়েছে। রোহিণীর বারুণী পুকুরে যাওয়ার বর্ণনায় যে রভসাকুলতার পরিচয় আছে, তার জন্য তিলোত্তমার ঐ শ্রবণ-লোভন পদধ্বনি শোনার প্রয়োজন ছিল। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' অপ্রাপনীয়ের জন্য এক প্রবল উৎকণ্ঠা আছে; তা পরবর্তী সকল বাংলা রোম্যান্টিক কাব্যের উত্তরাধিকার। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, মোহিতলাল, এমনকি বরিশালের যে-কবি নাটোরের বনলতা সেনে'র স্তুতি গেয়েছিলেন, তাঁদের সকলের পথের 'গাইড' হলেন মধুসূদন। বাংলা কাব্যের সকল রোম্যান্টিক কাব্যের শিরোদেশে এই কাব্যের অধিষ্ঠান। একটু ইতস্তত করলে এই সৌভাগ্য থেকে মধু বঞ্চিত হতেন। দুই-এক সর্গ বাড়িয়ে সুন্দ-উপসুন্দ-পর্ব স্ফীত করলে এই কাব্য সুন্দ-উপসুন্দবধ কাব্য হোত, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' নয়। সুন্দ-উপসুন্দ যে নিহত হলেন,

সারা কাব্যে এই খবরটি হয়ে উঠেছে গৌণ; এবং এই গৌণতার জন্য কাব্য স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত।

আর তা ছাড়া সুন্দ-উপসুন্দ ছিল বিগত যুগের বাসিন্দা, মধ্যযুগীয়। দু'টি কারণে—প্রথমত, তারা 'কাম-মদে' মত্ত হয়েছে; দ্বিতীয়ত, তারা ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে রত হয়ে আত্মঘাতী হয়েছে।

রাবণের সঙ্গে দু'টি ক্ষেত্রেই তাদের গরমিল আছে—রাবণ সীতাকে অপহরণ করে এনেছিল ভোগের জন্য নয়; অথচ সীতার প্রসঙ্গ সেখানে যখন উন্মোচিত হয়েছে, তখনই তাঁর সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া হয় নি।

কিন্তু তবু সেখানে কবি কোন পতঙ্গের সন্ধান দেন নি। এমনই নতুন জীবনাদর্শে লঙ্কা ও লঙ্কেশ্বর উদ্দীপিত! অথচ জ্বলন্ত পাবক শিখা দেখে দৈত্য-ভ্রাতৃদ্বয় প্রলুব্ধ হয়েছে।

দৈত্য-ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বিতীয় বিপত্তি রাবণে নেই। রাবণ স্বদেশ ও স্বজাতি-দ্রোহী ব'লে বিভীষণকে বহিষ্কৃত করেছেন, বিভীষণ তখন ভাই নয়, সে নাগরিক বিভীষণ। সুতরাং এখানে ভ্রাতৃবিরোধের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

রাবণ সুন্দর ও সৌন্দর্যকে জীবনের মৌল প্রয়োজনেব সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। বিশ্লিষ্ট করে তাকে বিকৃত করেন নি।

পুরাণে দৈত্য-ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের জন্য অভিশাপ বা দেবতার বরের প্রসঙ্গ আছে, কবি এই প্রসঙ্গটির গুরুত্ব হ্রাস করে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ যে প্রকার ভুল ক'রে বিড়ম্বিত হয়, একই ভুল করে সুন্দ-উপসুন্দ তাদের জীবনে বিড়ম্বনা ডেকে আনল।

এই কাব্যের নায়ক সুন্দ-উপসুন্দ নয়; কাব্যের নামকরণের জন্য আমাদের এই সিদ্ধান্ত নয়। এবং যেহেতু এখানে ভাষা অতীব ঐশ্বর্যময় হয়েছে, এই কারণে যে আমাদের এই উক্তি, তা-ও নয়। সমগ্র কাব্যে তিলোত্তমার অভিসরণ-পর্বই মর্যাদা পেয়েছে। সারা কাব্যে এইটিই প্রধান ঘটনা।

কাব্যের লক্ষ্য হোল সৌন্দর্য-লীলাচাঞ্চল্যের জয়গান করা। সে-সৌন্দর্য যেমন বিদেহ সৌন্দর্য, সে-লীলাভিসারে তেমনি কোন লক্ষ্যমুখীনতা নেই। গোবিন্দদাস কবিরাজ অভিসারের বর্ণনায় সার্থক কবি; কিন্তু শ্রীমতী রাধাও লক্ষ্যহীন অভিসারে যাত্রা করেন নি। "হরি রহ মানস-সুরধুনীপার।"

তিলোত্তমার কোন লক্ষ্য ছিল না।

বাংলা কাব্যে রোম্যাণ্টিকতার এই তো প্রথম উন্মেষক্ষণ; সৌন্দর্যের লক্ষ্যহীন অভিসার এখনই চরমরূপে প্রকাশ পেল।

আমরা বলেছি তিলোত্তমার অভিসার-বর্ণনা অতীব ঐশ্বর্যময়; কিন্তু ঐশ্বর্যের উপর এর অনন্যতা নির্ভর করে নি।

ঐশ্বর্য আর অলঙ্কার অনেক সময় সম-অর্থে গৃহীত হয়। কিন্তু তিলোত্তমার অভিসার-বর্ণনায় কবি ইচ্ছা করেই বোধ হয় অলঙ্কারের ছড়াছড়ি তত পছন্দ করেন নি। প্রথম পদক্ষেপ থেকে অনুসরণ করা যাক—

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
সরমে, ভয়ে কাতরা নবকুলবধূ
লজ্জাশীলা।

এখানে দু'টি মাত্র অলঙ্কার আছে সে হোল কুঞ্জর-গামিনী। প্রথম অলঙ্কার প্রয়োগে নবকুলবধূর যে সরম-রাঙা বর্ণনা ফুটেছে, তাতেই এর সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে।

মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারিদিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিনী; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্মরে;
মলয়-নিশ্বাসে কভু; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে। গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে।

দু'টি উপমা সাদৃশ্যকল্পনার জন্য ব্যবহৃত—দু'টিই গঠিত হয়েছে হরিণী ও কমলিনীকে নিয়ে। আর সব বর্ণনা স্বভাব-সঙ্গত। অথচ এই ভাষার পরতে একটা অ-স্বভাব অর্থাৎ অলৌকিক কমনীয়তা জড়িয়ে আছে, যা বাংলাকাব্যে নবীন এবং দুর্লভ।

সুন্দরী গিয়ে উপনীত হোল এক সরোবরের তীরে, সেখানে নিজেকে নিজে প্রতিবিম্বিত দেখল। এখানে আত্ম-আস্বাদন-স্পৃহা যেমন তন্ময়তার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ব্যতীত বাংলার তার কোন

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। ওবিদের সুষমা সুদূর রোম থেকে বঙ্গদেশে আনীত হয়েছে। একদা বাংলার ভূষা রোমক নারীকে বিভূষিত করত; বোধ হয় তারই প্রতিশোধ নেওয়া হোল।

মদন বলেছিল,

ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে
পুরুষ কুলের দশা!

পুরুষকুলের দশা দেখবার জন্য বাঙ্গালী পাঠকের আগ্রহ থাকতে পারে, কিন্তু কাব্যপাঠকের থাকতে পারে না।

শুধু কি 'পুরুষ কুলের দশা', সমগ্র মানব-কুলের দশা আমাদের শুনতে হবে—এক বিশেষ যুগের এক বিশেষ ভূখণ্ডের মানবকুলের দশা।

কল্পনা-দেবীর কৃপায় কবি অম্বর-প্রদেশে নানা স্থান ভ্রমণ করেছেন—

কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তারে চল, গো জননি!

কল্পনার বরে

দীন আমি দেখিনু, মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা;

কিন্তু মানুষের ক্ষুধা ভিন্ন পরিবেশের জন্য। তাই আজ—

চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' কবির যৌবন-স্বপ্নের শেষ সৃষ্টি। 'ক্যাপটিব লেডি' ও 'রিজিয়া' ও 'অপ্সরী'র প্রমত্ত গুঞ্জন শেষবারের মত স্পষ্টতায় ধ্বনিত হয়ে গেল। পরবাসে যাঁকে দেখে নিবেদিত হয়েছিল এই অর্ঘ্য:

Life hath its dreams to beautify the scene—
And sun-light for its desert;—but there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than Love—than gentle Love; and thou to me
Art that sweet dream, mine own! in glad reality.

স্বদেশে ফিরে এসে তাঁরই উদ্দেশে শেষ অর্ঘ্যটি নিবেদিত হোল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'।

প্রেমের দেবতার নিরঙ্কুশ প্রকাশ এখন থেকে শেষ হয়ে গেল। জীবনের ও যুগের দেবতা অদূরে বসে অপেক্ষা করছেন।

শুধু কাব্য-সৃষ্টিতে নয়, কবির কাব্য-জিজ্ঞাসায় আকস্মিক সমুন্নতি দেখা যায়। সাহিত্য-প্রসঙ্গে মাদ্রাজে যা লিখেছিলেন, এবং কলকাতায় যা লিখছেন, তার মধ্যে কালগত ব্যবধান সামান্য, কিন্তু চরিত্রগত ব্যবধান অসামান্য।

চিঠিপত্রে তাঁর এই নবীন ও পৃথক্‌ধর্মী সাহিত্য-জিজ্ঞাসার অনেক নিদর্শন খুঁজে বের করা কষ্টকর নয়।

তেমনি পুরাণ-চেতনারও পরিবর্তন ঘটেছে—অপ্সরীতে ভারতীয় পুরাণ ব্যবহার করেছেন; কিন্তু সে ছিল পৌরাণিকতার ইংরেজী রূপায়ণ, নব্য রূপায়ণ নয়। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' নবীন কালের রসচেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা দেখা যায়। হিন্দু কলেজের শিক্ষানীতির ফলে শাস্ত্রানুগত্য ও পুরাণানুগত্য বহুপূর্বে পরিত্যক্ত হয়েছিল। উপনয়ন হলে ব্রাহ্মণ বালক গায়ত্রী মন্ত্র না জ'পে 'ইলিয়াদ' থেকে আবৃত্তি করত, এ খবর শুনিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু। মধু পুরাণকে ঘৃণা করতেন না, তার মধ্যে বহু কাব্য আবিষ্কার করেছেন। অর্থাৎ পুরাণের 'সেকুলারাইজেশন' ধর্ম নিরপেক্ষীকরণ সম্পূর্ণ হোল। সমসাময়িক জাতীয় চৈতন্য ও পুরাণের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, মধুর হাতে তার অবসান হোল। জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হোল। বহুপূর্বে বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল; এবার অন্ধ পুরাণ-আনুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। আজ মধ্যযুগীয়তার অবসান।

আর নব্য যুগের বিদ্রোহ মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সে-বিদ্রোহ শুধু প্রচলিত ভাববস্তুর বিরুদ্ধে নয়, বিষয়বস্তুর প্রচলিত পরিবেশন-রীতির বিরুদ্ধেও।

ছন্দের কথাই প্রথমে বলি। পয়ার ছিল বাংলা কাব্যে প্রধান বাহন। কাব্যের বিষয়ে থাকত আদি রসের উচাটন; সেই অপরাধে পয়ারকে বিকৃত হতে হয়েছিল। দীনবন্ধু লিখলেন, 'পয়ার গয়ার সম'। পয়ারের একঘেয়েমি, পয়ারের বাক্য-বহনের সঙ্কীর্ণ শক্তি এবং বক্তব্যের পূর্ব-নির্দিষ্ট বিরতিযোগ নবীন যুগের কাব্য-প্রেমিকদের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর ঠেকেছিল।

মধুসূদন পয়ারের এইসব ত্রুটি জানতেন; তবু তিনি পয়ারকে পরিহার করলেন না, তাকে রূপান্তরিত করলেন। এই রূপান্তরে ছন্দের কলেবরে

এক অভূতপূর্ব বাচনিকতা ফুটল। যার ফলে বহু নতুন শব্দ, নতুন রীতির বাক্যের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব ও সহজ হোল। কখনও দেশীয় সূত্র, কখনও বিদেশীয় সূত্র তিনি ব্যবহার করলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন একটা বড় ঐতিহাসিক ঘটনা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বা বিধবাবিবাহ প্রচলন অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ছন্দের মধ্যে একটা মুক্তির স্বাদ আছে। তার অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে শুধু প্রবহমানতা নয়, একটা অফুরন্ততা আছে। তার ফলে চলিত, দেশী, বিকৃত বা অন্ত্যজ শব্দসমূহ সংস্কৃত বা তৎসম-তদ্ভব শব্দের সঙ্গে অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হয়। মধুসূদন-কর্তৃক এই ছন্দের অবতারণা যেন গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ। পতনের প্রবল তোড়ে কীটপতঙ্গ, লতাপাতা, পুষ্পফুলের সঙ্গে দীর্ঘদেহী ঐরাবত পর্যন্ত ভেসে যায়। তাই গরুত্মন্ত, কুলপতি, তুরাসহ, সুনাসীর, নিনাদ-বাহিনী, ভব-প্রমোদিনী প্রভৃতির পাশে খাটা, চোক্‌চোক্‌, কাটারি, থোয়া, ফাটা, লো, হ্যাদে প্রভৃতি শব্দ বিনা দ্বিধায় চলেছে।

শব্দের মতন বাক্যগুলিও তেমনি ভাবে এসেছে। কত বিচিত্র বাক্য আনাগোনা করেছে। এতদিন প্রচলিত ছন্দ-কাঠামোর মধ্যে যে-জাতীয় বাক্য বা বাক্যাংশ স্থান পেত, অমিত্রাক্ষর ছন্দ তদপেক্ষা বিচিত্রতর ও ভিন্নতর বাক্য-বহনের ক্ষমতা প্রকাশ করল। কয়েকটি উদাহরণ উৎকলিত করা গেল :—

১. ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন ঊর্ধ্বে সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী !

এমন বাক্য বাংলা গদ্যে ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয় নি ; কেবল বিরতিচিহ্নের বহুল প্রয়োগের উপর এইসব বাক্যের অভিনবত্ব নির্ভরশীল নয়। অভিনবত্ব এসেছে বাক্যের সঞ্চরণশীলতার জন্য ; দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন, অচল, অটল প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগের নতুন রীতি লক্ষ্য করার মত। তার সঙ্গে বিরতি চিহ্নের ক্রমবিন্যাস বাক্যের মধ্যে যে-প্রবহমানতা এনেছে, তারও কোন পূর্ব-দৃষ্টান্ত নেই। এগুলি জটিল বাক্য নয়, বা বহুসংখ্যক সরল বাক্যের যোগফল নয়।

২.　　　　অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে,
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
জাগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে
একচক্ররথ, খুলি সুকমল-করে
পূর্বাশার হৈমদ্বার।

জনৈক রমণী ইন্দ্রের চরণে প্রণতি জানাল, প্রণতির সময় একবিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল। এই সাধারণ বক্তব্যটি "অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে, শোভিল"—এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু মধুসূদন শিশির ও উষার প্রসঙ্গ নিয়ে এসে বাক্যের সঙ্কীর্ণ বক্ষখানি উদার করে তুলেছেন। বাংলা কাব্যে বাক্য-যোজনায় এমন ঘটনা এই প্রথম।

বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা'র বাক্য-যোজনা রীতির পূর্বতন রূপ এখানে পাওয়া যাবে। আমরা জানি, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' মধুসূদনের রচনাশক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি; ছন্দ ও ভাষার ক্ষেত্রে মালিন্য খুঁজে বের করা কঠিন নয়। তবে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বহু কৃতিত্বের সূচনা এখানে মিলবে। সেই অর্থে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কবির বাল্যলীলা। সকল বাল্যলীলায় জীবনের অল্পবিস্তর প্রস্তুতি থাকে।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র নানা বর্ণনা পরবর্তী কাব্যে স্থান পাবে। মধুর সাহিত্য-চর্চায় পুনরুচ্চারণ বড় স্থান পেয়েছে। এটি তাঁর বহু ব্যবহৃত কাব্য-কৌশল।

কাব্য-ভাবনায় একই কথা বারংবার বলতে-বলতে যেমন কবি তাঁর সম্পূর্ণ বলায় পৌঁছে যান (যেমন রামকথা), তেমনি একই ধরনের বর্ণনা বারবার বিবৃত করতে-করতে বর্ণনীয়ের প্রকৃত রূপটি ফুটিয়ে তোলেন; এবং তখন তা সম্যক বর্ণনা হয়। মধুসূদনের কাব্য-সৃজনরীতির সঙ্গে স্থাপত্যকলার মিল আছে। স্থপতি বাঁটালি ঘষে-ঘষে এক প্রচলিত বচন থেকে অন্য বচনে পৌঁছে যান, মধুর কৌশলও তেমনি। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র কয়েকটি বর্ণনা আমরা তুলে দিচ্ছি—দৃষ্টিপাতমাত্র উপলব্ধ হবে যে, এগুলি মেঘনাদবধ কাব্যের শিক্ষানবিশী।

১.　　　　কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা,
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিচ্ছটা

শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে)
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে। (১ সর্গ)

২. মৃদু হাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী ;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ,
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে। (ঐ)

৩. কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ-রতন। (ঐ)

৪. যেমতি
(ফণীন্দ্র) অযুথ ফণা ধরেন যতনে। (ঐ)

৫. যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে
ফাটে বুক।—ত্যজি ব্রজ ব্রজ-কুলপতি
অক্রুরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনী দল, যমুনা-পুলিনে,
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী ! (২ সর্গ)

৬. এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময় ; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম, কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন, বিশ্বম্ভর সনাতন
যিনি ? (৩ সর্গ)

৭. কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে। (৪ সর্গ)

৮. সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইয়া রড়ে ; মূর্চ্ছা পেয়ে
খেচর ভূচর সহ, পড়িল ভূতলে। (৫ সর্গ)

এমন কি ক্যাপটিভ্‌ লেডি, ভিশন্‌স্‌ অব দি পাস্ট-এর বহু বর্ণনা পরবর্তী কাব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

মধুসূদন তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতচন্দ্রকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন ;

এবং সেই ইচ্ছা সফল করেছেন। তবু ভারতচন্দ্র কোথাও কোথাও উপস্থিত আছেন।

পৌলোমী সুন্দরীর কুঞ্জবন পরিভ্রমণে ভারতচন্দ্রের কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়েছে (১ম সর্গ)! এবং অতিশয়োক্তি অষ্টাদশ শতকীয় কাব্যের মতই প্রশ্রয়িত হয়েছে। ৩য় সর্গে বিশ্বকর্মা যখন তিলোত্তমাকে রচনা করেছেন, তখনও ভারতচন্দ্রেব সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

"ভূতনাথ সঙ্গে সঙ্গে নাচে ভূতনাথ", "নাশিতে প্রলয় কাল ববম্বম রবে", "যেখানে সুরাঙা পদ অর্পিলা ললনা। কোকনদকুল ফুটি শোভিল সেখানে", "ববম্বম রবে যবে শিঙাধ্বনি" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে ভারতচন্দ্রের কাব্যের কোন কোন ছত্র বিম্বিত হতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল হওয়ায় ভারতচন্দ্রীয় কাব্য-রীতির বিরুদ্ধে মাইকেলের আপত্তিও প্রবল।

'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে কবির যুগ-প্রবর্তকের দাবি আর অস্বীকার করা চলে না। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' মধুসূদন বিদ্যাসাগরের নামে উৎসর্গ করেছিলেন—তাঁর কাছে হাত পাতবার পূর্বে হৃদয় পেতে দিলেন। এ শ্রদ্ধার্ঘ্য—ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন নয়।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিন্দুক ভেবে এক বৎসর পূর্বে বিদ্যাসাগরেব প্রতি নানা অপ্রিয় মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সেদিনও জানতেন যে, বাংলাদেশের স্থবির সম্বন্ধকে এমনভাবে নাড়া কেউ দেন নি; আর নিগৃহীত বাঙ্গালী নারীর এমন অকৃত্রিম বন্ধু আর কে আছেন!

এই দু'টি মধুর চোখে বড কাজ। নারীমুক্তির জন্য, চল্লিশ বৎসর ধরে একটানা সংগ্রাম করে গেছেন যিনি, তাঁকেই মধু বলেছিলেন "First man amongst us." বিদ্যার সাগর বলে নয়, কারণ বিদ্যা তাঁর নিজেরই প্রচুর ছিল (কেউ চাইলে ধার দিতেও পারতেন)। স্থবির সমাজের বিরোধী এক প্রকৃত আধুনিক মানুষরূপে দেখেছেন তাঁকে, তাই এই প্রশস্তি। অ-বিকৃত সুস্থ আধুনিকতা মধুসূদনের চিরবাঞ্ছিত; 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অটলবিহারী ভর্ৎসিত হয়েছিল—নব্যতার জন্য নয়, অসুস্থতার জন্য।

পূর্বতন ও পরবর্তী কাব্যসমূহের বিভিন্ন প্রবণতা 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সংহতি পেয়েছে; তাই 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর কাব্য।

কবি বলেছেন 'Epicling'; মোহিতলাল বলেছেন, নির্দিষ্ট আকারহীন। আমরা বলি 'এপিক'; আমরা বলি, নির্দিষ্ট আকার পেয়েছে।

'মেঘনাদবধ কাব্য' উনিশ শতকের মহাকাব্য। এ কাব্যের হৃদয়পটে যে অতিশয়তা আছে, তা এই শ্রেণীর কাব্যের পক্ষে অনিবার্য। অতিশয়তার ভূখণ্ডে এই জাতের কাব্যের জন্ম ও মৃত্যু। অতিশয়তা বা প্রসার ব্যতীত কোন কাব্য মহাকাব্য হতে পারে না।

মেঘনাদবধ কাব্য : "বলিতে গেলে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্ম সমাজের স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের আবির্ভাব, মধুসূদন দত্তের প্রভাব প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরা দ্বারা বঙ্গসমাজে নব আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা এই কয় বৎসর আপনার কাজ করিয়া আসিতেছিল। এই ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে তাহা আরও ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল।"[১৬] 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে সেইসব আকাঙ্ক্ষা ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করেছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বিশেষ পর্বে ব্যক্তি আর সমাজ পরস্পরের কণ্ঠসংলগ্ন হয়েছিল। এমন মিলন কদাচিৎ দেখা যায়।

রামায়ণের বিশেষ আখ্যান এই কাব্যের উপজীব্য ; পুরাণকে নবীন অর্থে ব্যঞ্জিত করেছেন কবি। সে ব্যঞ্জনার পিছনে কবির ব্যক্তিগত ইচ্ছা যতটা, ততটা সমাজ-ইচ্ছা কার্যকর। কোন কোন যুগে পুরাণের ঘটনাবিশেষ একটা প্রত্যক্ষ তাৎপর্য লাভ করে থাকে। মিলটনের মহাকাব্যে বাইবেলের প্রসঙ্গ-বিশেষ শুধু নির্বাচিত।

এক্ষেত্রে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আখ্যান-নির্বাচনে কবি বিজাতীয় আদর্শের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন, এমন সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। অবিশ্বাসের হাওয়া তখন নব্য যুবকদের মধ্যে সতেজে খেলা করছিল। এ-অবিশ্বাস পুরাতনের প্রতি অবিশ্বাস, নতুনের প্রতি, বা জীবনের প্রতি নয়। এই কারণে রামচন্দ্র শ্রদ্ধেয় কি অশ্রদ্ধেয় এ-প্রশ্ন বড় প্রশ্ন নয়, রাবণ যে বিদ্রোহী, এটাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

মধ্যযুগের সাহিত্যে কোন ব্যক্তির উদ্ভব ঘটলেও তাকে প্রাধান্য দেওয়া হোত না। চাঁদসদাগর লাঞ্ছিত হয়েই টিকে থাকলেন ; আর কালকেতু প্রশ্রয় পেয়েও খর্বিত হয়ে গেলেন।

'ব্যক্তি' শব্দটি এসেছে 'ব্যক্ত' থেকে। অর্থাৎ 'ব্যক্তি'র অর্থই প্রকাশ। রাবণের মধ্যে তাই 'প্রকাশ'। ঘটনার যত সমারোহ সব রাবণকে ঘিরে।

এই পক্ষপাতিত্ব কবির ব্যক্তিগত হয়েও নৈর্ব্যক্তিক। কারণ তা তৎকালিক।

নৈসর্গিকের সঙ্গে অনৈসর্গিকের, অতি-মানবশক্তির সঙ্গে সাধারণ মানব-শক্তির, অলৌকিক পৌরাণিকতার সঙ্গে সমসাময়িক বাস্তব ইতিহাসের বিরোধ তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সমালোচক ও কবির সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, "কবি স্বদেশীয় লোকদিগের মনোরঞ্জনার্থে রাম, লক্ষ্মণ, ও সীতার প্রতি যতদূর সাধ্য মমতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু রাক্ষস-দিগের প্রতি তাঁহাব বাস্তবিক পক্ষপাতও গোপন করিতে পারেন নাই। মিল্টনের ক্রাইষ্ট অপেক্ষা সেটান নায়ক নামের অধিক উপযুক্ত, কিন্তু আমাদিগের কবিতে ও তাঁহাতে প্রভেদ এই যে, মিল্টন অজ্ঞাতসারে এই প্রমাদে পড়িয়াছেন, আমাদিগের কবি জানিয়া শুনিয়া এই প্রমাদে পড়িয়াছেন।"[১৭] পরবর্তী কালে রাজনারায়ণের মতের পরিবর্তন ঘটেছিল, যেহেতু সমাজ-মানসের পরিবর্তন ঘটেছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন, "দত্ত কবিবর রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়াই মেঘনাদবধ কাব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহার নায়কগণ এমনই যথাযোগ্য গুণে বিভূষিত যে, তাহাতে রামায়ণ-প্রচারয়িতা বাল্মীকিকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছে। যদি প্রস্তাব সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত তাহা হইলে বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ কোন গুণেও ইহার নিকট লক্ষিত হইত না।"[১৮]

প্রবন্ধ লেখকের বয়স নিতান্ত বালকের বয়স; সুতরাং মন্তব্যে প্রবীণতা নেই, কিন্তু যুগ-প্রসঙ্গতা আছে। আর এক পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক ভারতীতে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপর "নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ" করেছিলেন; তিনি প্রবীণ বয়সে লিখলেন, "য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে—তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত-মস্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণকথার একটি নতুন বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, একি কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন

চলিয়াছে দুর্বলের অভিমান বশতঃ ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি,—তাই রামায়ণগান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।"[১৯] রামের অসম্মানে কোন সমালোচকের আঁখিদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয় নি।

সাহিত্যরসিক বন্ধু ভোলানাথ চন্দ্র লিখেছেন, "But he has opened also an age of taste and correctness. He has taught us to leave off our native narrow invention, and to restrain our prudient imagination in conception and impression. He has put new blood with the veins of Bengali muse, and galvanised her with spirit. They say he has sinned by his not giving due justice to Rama.........Rama is the great Brahmanical hero, but he did not come up to Madhu's ideal. By conservatism, he would have pleased his countrymen but outraged his own instincts."[২০]

এই প্রবন্ধের রচনার তারিখটি হোল ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ সন। দেশবাসী তখন আর মধুর স্বকালবাসী নেই। তবু ভোলানাথ চন্দ্র মধুকে সমালোচনা করতে পারেন নি; এবং এই না-পারাটাই মধুসূদন-সমসাময়িক মনোভাব।

'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের দশ বৎসর পরেও নবশিক্ষিত সম্প্রদায় বিষয়বস্তুর অ-হিন্দুপ্রকৃতি নিয়ে সোরগোল তোলে নি। 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ জনৈক সমালোচক লিখেছেন—"The subject is taken from the Ramayana, the source of inspiration to so many Indian poets. In the war with Ravana Meghnada, the most heroic of Ravana's sons add warriors, is slain by Lakshman, Ram's brother. This is the subject; and Mr. Datta owes a great deal more to Valmiki than the mere story. But, nevertheless, the poem is his own work from beginning to end. The scenes, character, machinery and episodes, are in many respects of Mr. Datta's own creations. In their conception and development, Mr. Datta has

displayed a high order of art. The character are clearly conceived and capable of winning the reader's sympathy."[২১]

প্রবন্ধকারের নাম হোল বঙ্কিমচন্দ্র।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে খ্রীস্টান পাদরী; তিনি মধুর কাব্যের এক নিন্দাত্মক সমালোচনা লিখলেন তাঁর নিজের পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মারে'। সমালোচনাটি তুচ্ছ; কিন্তু সেই তুচ্ছ সমালোচনার জবাবে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধের শেষাংশে এই ক'টি কথা লেখা হয়—

"If the Reformer has no sympathy with anything that is Hindoo, all that we can do is to bow him out of the room politely! Being neither Greeks nor Romans nor believers in the Mosaic account of creation the Editors of the Vividartha need not blush if a Hindoo legend stirs up their feelings more than the poetry of Homer, Virgil and Milton. We should certainly call them silly, if they did violence to their feelings in order to show the world how very thoroughly they had been 'regenerated'.

সেদিন তো প্রশ্ন ওঠে নি যে, রামচরিত্র বিকৃত হয়েছে, পুরাণ অসম্মানিত হয়েছে। বরং রামকথার এই নব্য ব্যাখ্যা নবীন পাঠকসমাজ সহর্ষ চিত্তে গ্রহণ করেছিল। এই সব প্রশ্ন উঠেছিল পরবর্তী কালে, যে-যুগকে সম্বোধন করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,
কোথা গেল সেই আশা!
আজিকে বন্ধু তোমাদের মুখে
এ কেমনতর ভাষা!

* * *

পুরাণ ব্যতীত এই যুগ-অভীপ্সা প্রকৃতরূপ পেত না। কেউ-কেউ সিংহল-বিজয়-কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য লিখতে বলেছিলেন; কবিও সে-প্রস্তাব প্রায় লুফে নিয়েছিলেন! কিন্তু ইতিহাস বা কিম্বদন্তীর মধ্যে সেই প্রসার ছিল না, যার মধ্যে একটা যুগ কথা ব'লে-ব'লে নিঃশেষিত হতে পারে। শুধু দেশপ্রেমে বা পরজাতিবিদ্বেষে উনিশ শতকের গোটা মানস-মানচিত্র

পরিদৃশ্যমান হয় না। বিশ্বসাহিত্যে পর্তুগীজ মহাকাব্য 'লুসিয়াদাস' হোল একমাত্র ব্যতিক্রম।

সাড়ম্বর ঘোষণা সত্ত্বেও ভিক্টর হুগোর নাটক 'ক্রমঅয়েল' সে সম্মানে ভূষিত নয়।

মানব-জীবনের অনন্ত প্রসার ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে সে যুগের শেক্সপীয়র-পড়া, বেকন-পড়া বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রবল আস্থা ছিল। এটিই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রধান অবলম্বন।

'মেঘনাদবধ কাব্য' দেশপ্রেমপ্রধান কাব্য নয়, যদিও কবির অজ্ঞাতসারে দেশের বেদনা তার মধ্যে বিনা কুণ্ঠায় প্রকাশ পেয়েছে—শুধু কবিরই বা কেন, সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের অজ্ঞাতসারে (এবং হয়তো কারো কাব্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও) সে বেদনা এই কাব্যে প্রবেশ করেছিল।

মধ্যবিত্তের মনোভাব একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। প্রবীণ দেশনায়ক দাদাভাই নৌরজী ব্রিটিশ পীড়ন ও শোষণের ইতিবৃত্ত লিখেছেন, সেখানেও ভাবের ঘরে চুরি—গ্রন্থের নাম 'Poverty and un-British Rule in India.'

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখলেন, "The leaders of the Indian commumity, the social and religious reformers of India, and the distinguished Indian students who were educated in the Hindoo College of Calcutta felt a warm appreciation for English literature and thought a deep-seated faith in the British character and the British rule."[২২]

ঐ গ্রন্থের একটি পাদটীকায় বিষয়টি তিনি আরও বিশদ করেছেন,—"In my younger days I was brought up among those who had been in schools and colleges in 1837, when the Queen ascended the throne, and I do not exaggerate the facts when I state that nothing could exceed the appreciation of English literature, thought and character, nothing could exceed the loyalty to the British rule which men felt and expressed in their everyday conversation. They had recollections of the times of Bentinck, Elphinstone, and

Munro ; they had seen Macaulay, Trevelyan and Metcalfe, and faith in English truth was a part of their beliefs." মধ্যবিত্ত সমাজ যখন ব্রিটিশ সদাশয়তায় প্রবলভাবে আস্থাশীল, সেই মোহগ্রস্ত জগতে বসে মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখেছেন। অথচ মধ্যবিত্তের প্রভু-প্রশস্তির তামসিকতায় ডুবে থাকেন নি।

রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "I have lived since with two succeeding generations of Indians—my comtemporaries who were in school & college in the sixties and the younger men who were educated in the nineties.—and I confess I have marked in them a decadence in faith."[২৩] ত্রিশ বৎসর পূর্বেই মধুসূদন সেই আশাভঙ্গের গান গাইলেন কি করে ?

কবিরা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, এসব ছেঁদো কথায় তাঁকে অলঙ্কৃত করে লাভ নেই ; তবে কি বিশ্বাসের বুকের কন্দরে অবিশ্বাস লুকিয়ে থাকে, আশার পথে নিরাশা, স্বপ্নাতিশয়তার সঙ্গে দুঃস্বপ্ন ? অন্তত মধুসূদনের কাব্যে যেন সেই কথাটা ব্যক্ত হয়েছে। মধুসূদন মানুষের প্রবল শক্তি সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় ছিলেন, সেই শক্তির পরাজয়ও তিনি দেখলেন। মোহের রঙিন কাঁচ দূরে নিক্ষেপ ক'রে শিল্পী মধুসূদন দেখতে পেলেন তাঁর যুগে আশার সঙ্গে ফলের, ইচ্ছার সঙ্গে সুকৃতির অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। রেনেসাঁস-পূর্ব মহাকাব্য ছিল পুরো 'Public Poetry'; রেনেসাঁস-পরবর্তী মহাকাব্য 'Personal poetry'-র ধর্ম অনেকখানি আত্মসাৎ করল। তাই মিল্টনের আদল কতখানি 'সেটান' পেয়েছে, এ-প্রশ্ন আলোচনায় কেউ কি আপত্তি করেছেন ? রাবণ কতখানি ব্যক্তি-মধুসূদনকে প্রতিফলিত করেছে, এ-অন্বেষণেও কেউ প্রতিবাদ করেন নি।

মোহিতলাল রেনেসাঁস-উত্তর মহাকাব্যের এই বিশেষ চরিত্রটি বুঝতে চান নি ; 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কবির ব্যক্তি-মানসের ছায়া বেশি দেখে তিনি তাকে মহাকাব্যের অভিধায় অভিহিত করেন নি ; গুরুত্ব দিয়েছেন তার গীতিময়তার প্রসঙ্গে।

বাইরনের মত, স্কটের তুল্য যিনি কবিতা লিখতে পারতেন, যিনি নিপুণতার সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন, তাঁকে এক তুচ্ছ কেরানীর চাকরী সম্বল করে কালাতিপাত করতে হয়েছে। মাদ্রাজে

কত অবমাননা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। সে ছিল না হয় বিভুঁই। কিন্তু এ তো তাঁর নিজের দেশ। কলকাতার অবমাননা তাঁকে অধিক কাঁদাবে। এ-বিষয়ে বন্ধু-বান্ধবের সমক্ষে কি বলতেন, কিছু জানি না। কিন্তু এটা জানি যে, বার বার সদর আইন পরীক্ষার জন্য কোমর বাঁধছেন! এ-থেকে বোঝা যায় যে, তিনি অর্থকৃচ্ছ্রতার জীবন থেকে মুক্তির জন্য ছটফট করছেন।

জীবনে, যে-সব কথা অনুচ্চারিত বা অর্ধোচ্চারিত, সাহিত্যে তার জন্য আসন পাতা থাকল। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' এইসব বেদনামলিন অভিজ্ঞতার কথা বলা হয় নি, সে আসরে গেয়েছেন শুধু আনন্দের গান, উল্লাসের কলহাস্য। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' আনন্দের সঙ্গে বেদনার যুগপৎ অবস্থান থাকল। ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টিজীবনের বৈপরীত্য দুই খাতে বইছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এসে রাবণ, ইন্দ্রজিত, মন্দোদরী ও প্রমীলা সকল জটিলতা অকাতরে একসঙ্গে ধারণ করে আছে। এরা যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি নৈর্ব্যক্তিক। যেমন মানুষের দুর্মদ আশার প্রতীক, তেমনি, আশাভঙ্গেরও। রাবণ যেমন মধুসূদন, তেমনি মধুসূদন নন। রাবণ সে যুগের যেন কোন স্পর্ধাধর যুবক। তিনি দেবদ্বেষী, ভোগাকাঙ্ক্ষী, এবং আত্মশক্তিতে প্রচণ্ড আস্থাবান, অথচ পরাজিত।

মধুর নায়ক সর্ববিধ সুস্থতার প্রতীক—সে দক্ষ সেনানী, প্রেমময় স্বামী, স্নেহকাতর পিতা, জনপ্রিয় শাসক, এবং সুতনু নর। আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীসমাজে যা কিছু অভিপ্রেত, সে সকল সদ্‌গুণের সংস্থিতি ঘটেছে তার ব্যক্তিত্বে।

একমাত্র 'ঈনিড' মহাকাব্যের নায়ক মহামতি ঈনিসের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। ঈনিসে দেখতে পাই সর্বঘটে সাফল্য; রাবণেও তাই। তবে রাবণের সাফল্য কাব্য শুরু হবার আগে ঘটে গেছে—আজ শুরু হচ্ছে নতুন খেলা। ঈনিড যেখানে এসে শেষ হয়েছে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সেখান থেকে সূচনা। বাঙ্গালীর সূক্ষ্ম ভাব-জীবনে অন্য মানসিকতার স্পন্দন শোনা গেছে যে!

রাবণের এই মূর্তি কি বহু বৎসর ধরে কবির হৃদয়পটে আঁকা হচ্ছিল? কিন্তু রেখা তো পট নয়। পৃথ্বীরাজ নয়, যযাতি নয়, ইন্দ্রনীল নয়, সুন্দ-উপসুন্দ নয়। নানা কূল থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েই যেন তিনি যথার্থ কূলে (সমুদ্র উপকূল?) এসে পৌঁছেছেন!

সত্য, রেখা তো পট নয়। রাবণও তেমনি অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছে—কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনাবিশেষ রাবণকে তৈরি করে নি। রাবণ শক্তিশালী পুরুষ। তার প্রতাপে স্বর্গ-মর্ত্য কম্পমান, কিন্তু রাজ্যচ্যুত বনচর সামান্য দুই যুবক আর তাদের তদধিক অকিঞ্চিৎকর বানর-বাহিনী রাবণের সুরক্ষিত পুরী ও সুসজ্জিত সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করে দিচ্ছে। তবে কি শক্তি শক্তিমত্তার পরিচায়ক নয়, বীর্য নয় বীর্যশালিতার ভিত্তি? বিদ্যাসাগর কেন, বহু প্রতিভাধর বিকাশব্যগ্র আত্মসচেতন বাঙ্গালীর জীবনে এই অভিজ্ঞতার প্রথম পাঠ ও দ্বিতীয় পাঠ শেষ হয়ে গেছে।

রাবণ একা নয়, তার আত্মীয়-পরিজন সকলের মধ্যে রেনেসাঁসীয় উল্লাস সহস্র অক্ষরে অভিব্যক্ত; লঙ্কা সেই উল্লাসের সৌধপুরী। এবং সে লঙ্কা বাস্তবে কোনদিন ছিল না—ছিল স্বপ্নে-কল্পনায়। একবার বাল্মীকি তাকে দেখেছিলেন কল্পনার নেত্রে, আজ মাইকেল আর একবার দেখছেন। তবে তপোবন আর নগর বাল্মীকি একই চোখে দেখেছিলেন। বরং চিত্রকূট বা দণ্ডকারণ্য বাল্মীকির চোখে অধিকতর মনোরম প্রতিভাত হয়েছিল। অন্যপক্ষে মধুসূদন লঙ্কা ব্যতীত অন্যত্র সৌন্দর্যের সন্ধান পান নি; চতুর্থ সর্গে সীতার জবানীতে তপোবনের বর্ণনা আছে, সেটা প্রক্ষিপ্ত অংশের মত, কাব্যের সমগ্র দেহের সঙ্গে বেমানান। ভাল না বাসলে প্রতি অঙ্গ এমনভাবে খুঁটিয়ে কেউ দেখে না! রামচন্দ্র ধিক্কৃত, কারণ তিনি অরণ্যচর। 'কালচার'-এর প্রতিশব্দ নাগরিকতা। রাবণ নগরী-লঙ্কার নাগরিক এবং তার জনক।

> উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
> কনক-উদয়াচলে দিনমনি যেন
> অংশুমালী।

রাবণ আর লঙ্কা!—কে অধিকতর আকর্ষণীয়, কবি মনস্থির করতে পারেন নি। কিন্তু কবি জানেন লঙ্কা পূর্ণ উদ্ভাসিত না হলে রাবণ উদ্ভাসিত হবে না।

> চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
> সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!—
> হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
> কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ-ছটা;
> তরুরাজী; ফুলকুল চক্ষু-বিনোদন,
> যুবতীযৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ

দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে, চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগৎ-বাসনা, তুই, সুখের সদন। (১ সর্গ)

কে কাকে প্রকটিত করছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

১২০ টাকাব চাকুরী-জীবনে এই স্বপ্নপুবী নির্মিত হোল। টাকা তিনি কোনদিন গুণে খরচ কবতেন না।

"অর্থ থাকুক বা না থাকুক ব্যয় করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। ধনের কিছুমাত্র মূল্য নাই, ইহাই তিনি জানিতেন।"

লঙ্কার এই মোহন রূপ কোথা থেকে পেলেন? কেবল পুরাতন গ্রন্থ পাঠে এই চিত্র আঁকবার সামর্থ্য ও শক্তি তিনি পেয়েছেন, এমন মনে হয় না।

১৮৩৬ সনে জেমস প্রিন্সেপ অশোক শিলালিপি পড়েছিলেন ; তারপর থেকে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের অনুশীলনে নতুন একটি পর্যায় আরম্ভ হোল। অজন্তা-ইলোরা গুহাগুলি আবিষ্কৃত হোল ১৮৫৪ সনে ; ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির এক গৌবব-উজ্জ্বল নিদর্শন সবার জ্ঞানগোচর হোল। দক্ষিণ দেশে মহাবলীপুরম ও কার্লে আবিষ্কৃত হোল। আবিষ্কার করলেন প্রখ্যাত ফার্গুসন সাহেব। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে মধুসূদন মাদ্রাজে গিয়ে পৌঁছুলেন।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা আর তক্ষশীলা, কোশাম্বী, শ্রাবস্তী, নালন্দা, বোধগয়া, রাজগীর, সারনাথ ও বৈশালী আবিষ্কার সমসাময়িক ঘটনা।

মধুসূদন উত্তর ভারতের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনগুলি দেখেছেন কিনা জানি না। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি কাঞ্চীপুরম দেখেছেন। তাঁর মাদ্রাজ-আবাসস্থলের নিকটে ছিল বিখ্যাত পাচাইয়াপ্পা বিদ্যালয়। ১৮৫২ সনে ঐ বিদ্যালয়ের একটি শাখা কাঞ্চীপুরমে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ থেকে বহু গুণী ব্যক্তি, বিশেষ করে শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত এমন ব্যক্তি এই শাখা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদানের জন্য এসেছিলেন। মধুসূদন তাঁদের সহযাত্রী ছিলেন কিনা তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই।[২৪] কিন্তু অনুমান করা যায় শিক্ষক বা সাংবাদিক যে-কোন একটি

যোগ্যতার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সাময়িক পত্রে এই উৎসবের অনেকগুলি রিপোর্ট বের হয়েছিল, তাঁর মধ্যে অন্তত একটি তাঁর রচনা।

কাঞ্চীপুরমের অতিকায় মন্দিরগুলি মানব-সৃষ্ট বলে মনে হয় না। বৃহতের সঙ্গে সুন্দরের এমন মিলন কদাচিৎ ঘটে। সাধে কি আর পুরাতাত্ত্বিক ফার্গুসন এগুলিকে দানবের সৃষ্ট, এই মন্তব্য করেছিলেন।

কাঞ্চীপুরমের মত বিস্ময়কর হোল মহাবলীপুরম, মহাবলীপুরমের রথ-মন্দির।

সব মন্দির সমুদ্র উপকূলে। মন্দিরের শীর্ষে আরোহণ করলে সফেন সমুদ্র সতত দৃশ্যমান। "উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে"। দক্ষিণের এইসব রমণীয় স্মৃতি লঙ্কার দৃশ্যপট বর্ণনায় তাঁকে সাহায্য করেছে, হয়তো বা প্ররোচিত করেছে। সমুদ্র ঘিরে রেখেছে রাবণের লঙ্কাকে, রামায়ণের অনুরোধে নয়।

"আমার যা-কিছু আছে, সবই দিতে পারি আমি, যদি আমাকে সমুদ্রতীরে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয় বা এমন এক দেশে বসবাসের সুযোগ পাই—যেখানে বসবাস করে দূরস্থিত পাহাড়ের শোভা দু'চোখ ভরে দেখতে পাই। সমুদ্র আর পাহাড় এই দুটিই সৃষ্টির মহত্তম নিদর্শন।" মধুর সমুদ্র-প্রীতি লঙ্কাকে সমুদ্র-বেষ্টিত করেছে।

মাদ্রাজ-জীবনই তাঁকে সমুদ্রকে ভালবাসতে শিখিয়েছে ; আবার রাবণকে ভালবাসতেও শিখিয়েছে। ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতা বা আর্য-সভ্যতার বিরুদ্ধে দ্রবিড়ী-সভ্যতার আছে ঘৃণা। কবি ঘৃণা থেকে প্রেম সংগ্রহ করেন নি ; প্রেম থেকে প্রেমে এসেছেন। মাদ্রাজে মধুসূদন দু' বৎসর বসবাসের মধ্যে তেলেগু ও তামিল শিখতে শুরু করেন। ১৮৪৮-৪৯ সনে শিক্ষা-পর্ব চলতে থাকে। ১৯৫২-৫৩ সনের মধ্যে ঐ দু'টি ভাষায় তাঁর সহনশীল পটুত্ব এসে গেল। তামিলী পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জবাবে সাময়িক পত্রে টিপ্পনী কাটার মত অধিকার তিনি অর্জন করে ফেললেন।

মধুসূদন বাল্মীকি পড়েছেন, কৃত্তিবাস তাঁর আবাল্য সহচর, এবার কাম্বার রামায়ণ পড়ছেন, পড়লেন ভাস্কর-রামায়ণ। কিন্তু সম্ভবত তাঁকে বিমুগ্ধ করল কাম্বা। ভক্তিবাদের জন্য নয়, তার মনুষ্যত্বের নির্বিচার স্বীকৃতির জন্য। তাই তামিল-কাম্বা তেলেগু-ভাস্কর থেকে বেশি টানল তাঁকে।

কাম্বা-রামায়ণে রাবণ সচ্চরিত্র নৃপতি নন ; তাঁর অতি নারী-আসক্তি-দোষ এই কাব্যেও প্রকট। তবে বাল্মীকির রাবণ কাম্বার হাতে আরও

সুসঙ্গত বা স্ববিরোধিতামুক্ত চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। জনৈক গবেষকের মতে বাল্মীকি-রামায়ণে লক্ষ্মণ-কর্তৃক অপমানিত হয়ে শূর্পণখা যখন দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরল, তখন রাজসভায় আসীন রাবণকে সে যে ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে তাতে লঙ্কেশ্বর রাবণের রাজোচিত মহিমার হানি ঘটেছে।[২৫]

"রাবণ! তুমি স্বেচ্ছাচারী ও কামোন্মত্ত, এক্ষণে যে-ঘোরতর ভয় উপস্থিত তাহা বুঝিতে হয়, কিন্তু বুঝিতেছ না। যে রাজা লুব্ধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, প্রজারা শ্মশানাগ্নিবৎ কদাচ তাহার সমাদর করে না। যে-রাজা উচিৎ সময়ে স্বয়ং কর্ম সাধন না করে, সে রাজ্য ও কার্যের সহিত প্রজাদিগকে দর্শন দেয় না, এবং একান্তই অ-স্বাধীন, নদীগর্ভস্থ হস্তী পবিহার করে, তদ্রূপ লোকে তাহাকে দূর হইতে ত্যাগ করিয়া থাকে। যে-রাজা মন্ত্রিহস্তগত রাজ্যের তত্ত্বাবধান না করে, সমুদ্রমগ্ন পর্বতের ন্যায় তাহার আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না।"[২৬] এই হোল বাল্মীকির ভাষ্য।

উক্ত গবেষকের মতে এক সামান্যা-নারীর কাছ থেকে এইপ্রকার তীব্র ভর্ৎসনা বীরর্ষভ রাবণ সর্বসমক্ষে কি করে সহ্য করল? তেলেগু-রামায়ণে—ভাস্কর-রামায়ণে বিষয়টি বাল্মীকি-বর্ণিত পথে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু কাম্বা কিছু ভিন্ন পথে বর্ণনা করলেন। তিনি কোন ভর্ৎসনা প্রয়োগ করেন নি; তিনি দৃশ্যটিকে এইভাবে সাজিয়েছেন—অপমানিতা শূর্পণখা রাজপুরীতে প্রবেশ করছে, তার বেশভূষা ও চলাফেরার ভঙ্গি দেখে সবাই নীরব হয়ে গেল, রাজপুরীর সবাই নিস্তব্ধ, সভাস্থলে সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। শূর্পণখা দু'টি হস্ত মস্তকে বিন্যস্ত করে রাবণ সমীপে উপস্থিত হোল, লঙ্কেশ্বরের চরণে মস্তক স্থাপন করে উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠল। কোন ভর্ৎসনা নেই, অভিযোগ নেই, আছে অপমানিতের মর্মভেদী ক্রন্দন।

শুধু এই একটি দৃশ্য নয়, বহুস্থলে লঙ্কেশ্বর মহিমাময় সম্মানের অধিকারী। একটি ভাই নিহত হয়েছে, সেই মৃত ভাইয়ের দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ বলছে—

> **Alas 'tis not my brother lying dead—**
> **It is my father's glory faded lies upon the ground**

কেবল অপরের মুখে মহিমা ব্যঞ্জিত হয় নি। রাবণের নিজের আচরণ একই পর্দায় বাঁধা।

We live today,
Tomorow finds us not ; but glory, doth ;
It ever die ?
Die I may
But can I stoop to shame and littleness ?[২৭]

রাবণ-চরিত্রে শক্তিজনিত অহঙ্কার অতীব প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু অহঙ্কারী এই ব্যক্তিটি আত্মীয়-পরিজনদের বিয়োগে শিশুর মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। অথচ ইচ্ছা করলে তিনি নিরুপদ্রুত জীবন ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু সে তো মনুষ্যোচিত হোত না, রাবণোচিত হোত না।

শত্রুর অভ্যুদয়ে তাই তিনি বিমর্ষ নন, উল্লসিত।

My sway is undisputed o'er the worlds !
If new foes arise what can delight my heart
Better ? [২৮]

এই বিশেষ রাবণের চারপাশে মধুসূদন ঘুরেছেন, দেখেছেন, এবং প্রয়োজন-অনুসারে তার চরিত্রের কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি ! (১ সর্গ)

কাম্বা-রামায়ণে রাবণ কুৎসিৎ বা অত্যাচারী শাসক নয়। রাবণ কামমোহিত, কিন্তু সে সুন্দর। দ্রবিড়ী শিল্প-সৃষ্টির এই দৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্য অন্যত্রও লক্ষিত হয়। মহিষাসুর বাংলাদেশে সর্বদাই আসুরিক। কিন্তু দ্রবিড়ী ভাস্কর্যে মহিষাসুর ভয়ঙ্কর ও আসুরিক পুরুষ নয়, সুন্দর পুরুষ। মহাবলীপুরমে তার দিব্য মূর্তিটি দেবীমূর্তি থেকে কম স্নিগ্ধ ও মমতা-মাখানো নয়। মধুসূদন বৃহত্তর ভারতের শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে মিলিয়ে তার প্রাদেশিক মূঢ়তা ভেঙ্গে দিয়েছেন। অবসান ঘটালেন বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের দৃষ্টি-সঙ্কীর্ণতার।

বহু কালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি ;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম ? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্তিবৃক্ষ রোপিণু জগতে
বৃথা ! (৭ সর্গ)

যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব।
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া
বিরলে বসিয়া দোহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। (৭ সর্গ)

কাম্বা-অনুসরণ অন্ধ অনুসরণ হয় নি—তার একটি মাত্র উদাহরণ আমরা উল্লেখ করছি। কাম্বা-রামায়ণে বিভীষণ রামভক্ত রূপে চিত্রিত। কাম্বা-রামায়ণ ভক্তি-আন্দোলনের যুগে রচিত। মধুসূদন কাম্বা-রামায়ণের বিভীষণকে মিত্রভাবে সম্বোধন করেন নি।

লেখনী নিয়ন্ত্রণ করেছে—নব্য যুগের নব্য জীবনাদর্শ। বিভীষণ প্রসঙ্গ যখনই উচ্চারিত, তখনই সে ধিক্‌ৃত। তার ধর্মপ্রাণতা তার দেশদ্রোহিতার পাপ ঢাকতে পারে নি।

লঙ্কার প্রেক্ষাপটে বিভীষণ ও ইন্দ্রজিতের সংলাপে নব্যবাংলা কলরব করে উঠেছে।

শুধু ইয়ং-বেঙ্গলী কালাপাহাড়ী মনোভাব রাবণচরিত্র অঙ্কনে সক্রিয়, একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। মধুসূদনের হাতে আর্য ও দ্রবিড়ী সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে ; ফলে উনিশ শতকের বাঙ্গালীর ভারত-দর্শন অনেকখানি এগিয়েছে।

দ্রবিড়ী প্রসঙ্গ আরও একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র লঙ্কায় যে সভ্যতার জয়গান করা হয়েছে, সে হোল নগর-সভ্যতা। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এই নগর-সভ্যতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। বর্ণনায় অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে নগরের বিবিধ উপকরণ—প্রাসাদ, রাজপথ, প্রমোদকানন, প্রাকার, মন্দির। আর আছে নাগরিকদের দেহসৌষ্ঠব, তাদের অলঙ্কার, বিলাস-উপকরণাদির বর্ণনা। দেবতার প্রসঙ্গ, কৈলাসপুরী বা স্বর্গ কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় নয়।

আর্যসভ্যতা আর দ্রবিড়ী সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য মূলত আরণ্যক ও নগর-জীবন-চর্যায়, এটা প্রচলিত ঐতিহাসিক মত। আর্য রাম তপোবন-আশ্রয়ী, দক্ষিণী রাবণ নগরবাসী।

লঙ্কার রাজসভায় কাব্যের যবনিকা উঠল, তারপর রাজপুরীর বর্ণনা!

রাজপুরীর বর্ণনা শেষ হতে না হতেই আরম্ভ হোল নাগরিকদের বর্ণনা। নাগরিকেরা তখন শোভাযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে। লঙ্কার সেই দারুণ সঙ্কটের দিনে সকল নাগরিকই সৈনিক—কিবা নারী কিবা পুরুষ। দীর্ঘ-দীর্ঘ শোভাযাত্রার বর্ণনায় কবির ক্লান্তি নেই। দীর্ঘ-দীর্ঘ শোভাযাত্রাগুলি সমুদ্রের তরঙ্গের মত আছড়ে পড়ছে নগরীর প্রাকারের উপর প্রবল কলোচ্ছ্বাসে।

সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্বূরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্বার) বারণযূথ; মন্দিরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের দীর্ঘ-দীর্ঘ বাক্যের মতই দীর্ঘ-দীর্ঘ শোভাযাত্রা। এই ছন্দের প্রাণে যে-অফুরন্ততা ও অপরিমেয়তা আছে, লঙ্কার শোভাযাত্রার বর্ণনায় মধুসূদন তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। সমুদ্র ও শোভাযাত্রা উভয়ের ধর্ম এক। গতি ব্যতীত উভয়ের অস্তিত্বই নেই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ যেন এদের জন্যই।

সমুদ্রের গতিভঙ্গী দেখে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের চলন-রীতি কল্পনা করেছিলেন। সমুদ্রের বিরামবিহীন কলধ্বনি শুনে কি তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনি-ব্যাকরণ তৈরি করেছিলেন? সমুদ্র তার অতলান্ততা, তার তরঙ্গের গাম্ভীর্য, প্রচণ্ডতা বা শব্দমুখরতা নিয়ে মধুসূদনের কাব্যে শংসিত হয়েছে। সমুদ্রবক্ষের দূরের সমাহিতি ও নিকটের চাঞ্চল্য—দুই-ই এই ছন্দের প্রতিটি স্পন্দনে স্থিতিলাভ করেছে।

সব ছান্দসিকই বলেছেন, এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য যতিস্থাপনের স্বাধীনতা। কবি এই স্বাধীনতা পুঁজি করে তাঁর বিষয়ের অবয়ব গড়ে তুলতে ছন্দোবন্ধন ইচ্ছামত সাজিয়েছেন। নিসর্গের সরব ভাষণের সঙ্গে তার নীরবতাও এই অঙ্গসজ্জার মধ্যে বিম্বিত হয়ে আছে।

"যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে!" এই বর্ণনা একটি উপমা মাত্র নয়, এ হোল অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতিষ্ঠা-ভূমির বর্ণনা।

সমুদ্রের তরঙ্গের সাময়িক বিরতি তার ধ্বনিপ্রবাহকে ব্যাহত করে না,

প্রসারিত করে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' থেকে এখানে সাফল্য আরও বিপুল

এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে;
সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে! (১ সর্গ)

যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জিল জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা? (৩ সর্গ)

চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে!
পশিল কাননে দাস; আইল গর্জিয়া
সিংহ; বিমুখিনু তাহে; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড়; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী; কতক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে। (৬ সর্গ)

ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী

ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে—
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা;
গর্জিলা উথলি সিন্ধু! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে! (৬ সর্গ)

খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজীরাজী সহ গজ; রথীবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ কণে! (৯ সর্গ)

কবি প্রত্যেকটি উদ্ধৃত অংশে কত প্রকার বিচিত্র বিরতি উপহার দিয়েছেন। প্রথম উদ্ধৃত অংশটিতে ঘন ঘন বিরতিচিহ্ন প্রয়োগ। ক্ষুদ্র পদক্ষেপে দ্রুততা আসে গমনকালে। দ্বিতীয় অংশে দীর্ঘতা লক্ষণীয়। আর সমস্ত পদগুলিতে স্বরবর্ণের ঝঙ্কার-লালিত্যে এই বিরতির দৈর্ঘ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অংশে বিরতির নানা মূর্তি কখনও দীর্ঘ, কখনও ক্ষুদ্র; ঝড়ের ঝাপটার মত অনুমানসাপেক্ষ নয়।

চতুর্থটিতে দেখতে পাই যুদ্ধের আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের মত বিরতিচিহ্ন সমভাবে যুধ্যমান। অধিকাংশ বিরতি চরণের মধ্যভাগে এসেছে—অগ্রসরের পথ প্রতিহত হয়েছে।

পঞ্চম উদ্ধৃতিটি শোভাযাত্রার বর্ণনা—সবই দীর্ঘ। বাক্য দীর্ঘ, বাক্যের বিরতিরও দীর্ঘসূত্রতা। শুধু একবার চরণের মধ্যস্থলে একটি বিরতি আছে। ঐ বাক্যটি অর্ধপথে যাত্রা শুরু করছে, কিন্তু তাকে শেষ হতে হয়েছে অপর একটি পূর্ণ চরণের শেষে।

এত বিচিত্র বিরতি প্রয়োগে ছন্দের গতি ব্যাহত হয় নি, বরং ভাবের সঙ্গে অপূর্ব সাদৃশ্য পেয়েছে। এ-অপেক্ষা ছন্দের আর কী-ই বা সার্থকতা!

বৈয়াকরণিকেরা এবং ছান্দসিকেরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ভাব-অনুসারী যতি বসবে। মধুসূদন নিজেও একবার যতির কানুন ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিলেন। সে প্রয়াস আমাদের কাছে খুব মজার ব্যাপার মনে হয়েছে। ব্যতিক্রমবহুল নিয়ম নিয়মের প্রাতিশয়। মধুর ব্যাখ্যায় নিয়ম অপেক্ষা ব্যতিক্রমের খতিয়ান ছিল বিপুল। মধুসূদন ব্যাকরণ জানতেন, কিন্তু নিয়মিত হন নি, নিয়ন্ত্রিত হন নি। এটা বাংলা কাব্যের কম সৌভাগ্য নয় যে, ছন্দোশাস্ত্র পড়ে শাস্ত্রজ্ঞ তিনি হন নি। মিলটনের কাব্যছন্দ সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. He is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest." সমগ্র মিলটন-সমালোচনা-সাহিত্যে এমন পঙ্‌ক্তি, এমন মূল্যায়ন নেই।

মধুসূদন অনুভবে এবং সৃষ্টিতে মৌলিক।

এককথায়, মধুসূদন নিসর্গের মহিমা থেকে ছন্দোশাস্ত্র বা ছন্দোজ্ঞান শিখেছেন।

তাই তো কলকাতার বিক্ষুব্ধ জীবনের উপর মাদ্রাজের সদা-আলোড়িত নিসর্গ-জগৎ সবার অলক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পঠিত জ্ঞান আর জীবনের অভিজ্ঞতা পরস্পরের মিত্র ও সহযোগী।

মধুসূদন 'সাহিত্যিক' মহাকাব্যের লেখক ; কিন্তু শুধু পঠিত জ্ঞান কবিকে কবি করে না। মধুসূদন বিষয় পেয়েছেন বিষয়ের হাত থেকে ; ছন্দ পেয়েছেন ছন্দের হাত থেকে, অলঙ্কার পেয়েছেন অলঙ্কৃতের হাত থেকে। অর্থাৎ মহাকাল তাঁর বিষয় দিয়েছে, নৈসর্গিক শক্তির ধ্বনি-বৈচিত্র্য তাঁকে ছন্দ দিয়েছে, আর তিনি অলঙ্কারও নিয়েছেন এই সালংকারা বিশ্বভুবনের নানা মহল থেকে।

অলঙ্কারের কথা বলি। কখনও কখনও একটি গোটা দৃশ্য তিনি প্রকৃতির ভুবন থেকে তুলে এনেছেন। দুই-একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১. শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব ! (১ সর্গ)

২.	মেঘবর্ণ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।	(১ সর্গ)

৩.	মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে।
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন !
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ।	(২ সর্গ)

৪.	শরদিন্দু পুত্র ; বধূ শারদকৌমুদী,
তারা কিরীটিনী-নিশি সদৃশী আপনি
রাক্ষস কুলঈশ্বরী ! অশ্রুবারি ধারা
শিশির, কপোলপর্ণে পড়িয়া শোভিল।	(৭ সর্গ)

প্রথমটি ঝড়, মেঘ, প্রবল বাত্যা, বারিধারা, মেঘগর্জন চিত্রাঙ্গদার শোকাহত রূপের নানা খুঁটিনাটি বর্ণনায় ব্যবহৃত, কিন্তু দৃশ্য একটি। এটি রূপক, কি লুপ্তোপমা এ তর্ক বৃথা।

তৃতীয় উদ্ধৃতিতে কৃষ্ণের দিব্য রূপের নানা প্রসঙ্গ আমন্ত্রিত হয়েছে একটি পর্বতবিশেষের রূপ-নির্মিতির জন্য। এখানেও বাচ্যোৎপ্রেক্ষার প্রশ্ন উৎক্ষিপ্ত-প্রশ্ন, উদ্‌গত প্রশ্ন নয়।

দ্বিতীয় ও চতুর্থটিতেও বাংলার নিসর্গের এক অখণ্ড পটের উপর তুলি বুলান হয়েছে। বিশেষ ক'রে চতুর্থটিতে বাংলার নৈশ শারদ গগন মন্দোদরীর সংসারচিত্রের সঙ্গে খাপে খাপে মিল খেয়েছে। রূপকের কি এত রূপ থাকে ?

এগুলিকে কি প্রচলিত অর্থে অলঙ্কার বলা যায় ? এগুলি অবিচলিত নিসর্গের বিচলিত বা স্খলিত অধ্যায়। কবি-প্রয়োজন-অনুসারে কুড়িয়ে নিয়ে স্থাপন করেছেন মাত্র।

তক্ষণশিল্পী বিরাট-খিরাট পাথরের চাঁই এনে ছেনি দিয়ে কেটে তাতে নানা মূর্তি খুদে তোলেন। এই পদ্ধতিতেই মহাবলীপুরমের রথ মন্দিরগুলি তৈরি হয়েছিল পাহাড় কেটে কেটে।

মধুসূদনও তাই করেছেন, শুধু উপাদান পৃথক।

তাঁর কাব্যে যেখানে প্রকৃতি এমন নিখাদভাবে নেই, সেখানেও প্রকৃতি আছে তার সর্ববিধ রূপমাধুরী নিয়ে; সেখানে প্রকৃতি "যদ তত্তৎ সদৃশম্ ইতি" এই নীতির কি সার্থকতা দেখিয়েছে? প্রকৃত সাদৃশ্যের জন্য অবিকৃতভাবে নয়, মিশ্রণ-ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসেছে।

আমাদের সম্মুখে দৃশ্যমান এই বিশ্বচরাচর। আকাশ মাটি আর জল জুড়ে প্রকৃতির কত বিচিত্র রূপ প্রকাশ পেয়েছে! বাতাস-আলো, গ্রহ-উপগ্রহ, দিন-রাত্রি, অরণ্য-পর্বত-প্রান্তর, নদী-সমুদ্র, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ—সব কিছু মধুসূদনের কাব্যে এসেছে। বিষয়ের প্রয়োজনে এসেছে, বিষয়ের মেজাজের মর্জিতে এসেছে।

আনন্দের মুহূর্তে, দুঃখের মুহূর্তে, মিলনের পরম মুহূর্তে, সংঘর্ষের মুহূর্তে সময় নির্ধারণে প্রতীকতা আছে। রাত্রি সর্বত্রই ষড়যন্ত্রের কাল; প্রভাত সর্বত্রই প্রসন্নতার প্রহর। দিন ও রাত্রির ঘূর্ণাবর্তনে মানুষের মনের গতি পরিমাপিত হয়েছে। আবার বিষয়ের চরিত্রের প্রার্থনায় পশু-পাখি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, আকাশ-আলো, লতা-পাতার বিভিন্ন প্রয়োগ নানাভাবে ঘটেছে। শক্তির প্রকাশ যেখানে সমধিক প্রকটিত, সেখানে অনুরূপ নৈসর্গিক উপাদান ব্যবহৃত। ঝড়-ঝঞ্ঝা, অশনিপাত ও বজ্রের গর্জন, সমুদ্র-অরণ্য, কুম্ভীর-সিংহ, এমন কি কেউটিয়া সাপ পর্যন্ত আমন্ত্রিত হয়েছে বিষয়ের, ঘটনার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলার জন্য।

অলঙ্কার হোল কৃত্রিম, কিন্তু মাইকেলের হাতে অলঙ্কার স্বভাব-উদ্ভূত।

মেঘনাদবধ কাব্য থেকে বীরাঙ্গনা কাব্য

মধুসূদনের অধিকাংশ কাব্যের শিরোভূষণ হয়েছে নারী। তিলোত্তমা, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা আর ইংরেজীতে অপ্সরী, ক্যাপটিব লেডি ও রিজিয়া—সব ক'খানি নারী-নামাঙ্কিত। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তিনটি নারীচরিত্র হোল প্রধান। তারা কাব্যের প্রধান স্তম্ভ নয়; হলে সেটা সুসঙ্গত হোত না। কারণ 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাঙ্গালীজীবনের সার্থকতার আলেখ্য না হলেও একটা বিশেষ কালখণ্ডের সামগ্রিক আলেখ্য। আর বাংলাদেশের তখনকার সামাজিক পরিবেশে নারীর স্থান অত্যন্ত গৌণ ছিল। নারী-চরিত্রকে সম্বল

করে বাঙ্গালীজীবনের সমগ্রতার চিত্র-উদ্‌ঘাটন করা যেত না। এই কাব্যের লক্ষ্য হোল আলাদা, সার্থকতাও তাই পৃথক্।

মন্দোদরী, প্রমীলা ও সীতা এ-কাব্যের প্রধান তিনটি নারী। মন্দোদরী জননী চরিত্র, প্রমীলা প্রেমিকা। সীতা জননী রূপে দেখা দেন নি। কিন্তু সীতা প্রেমিকা রূপেও কি দেখা দিয়েছেন? সীতা নিগৃহীতা নারীত্বের প্রতীক। পুরুষপ্রধান ভারতীয় সমাজে সীতা অভাগিনী নারী-জাতির প্রতিনিধি। তাঁর সাধ্য কি যে প্রেমিকা হন? প্রমীলা সীতাচরিত্রের প্রতিবাদ। এই কারণে তার স্নায়ুতে যে-রক্ত কণিকাগুলি দাপাদাপি করেছে, সেগুলির উৎস বাল্মীকি নয়, উনিশ শতকের ইয়ংবেঙ্গল। ভাষান্তরে সে মাইকেলের বহু বাসনার কাব্যরূপ।

মধুসূদনের সাহিত্যে নারীর জননীরূপ অপেক্ষা প্রেমিকারূপ অধিকতর ফুটেছে। অথচ আমরা দেখেছি কবির জীবনে আত্মস্বাতন্ত্র্যে উদ্‌বুদ্ধা এক নারী পরাজিত হয়েছেন। জয়ী হয়েছেন আত্মনিবেদনেচ্ছু নারী। জীবনে যিনি পরাজিতা, কাব্যে তিনি সমাদৃতা বা বিজয়িনী।

মধু মঙ্গলকাব্য লিখতে বসেন নি—নারীচরিত্রের ভক্তিময়ী রূপ না দেখিয়ে প্রেমময়ী রূপই তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু এই প্রেমময়ী নারী পদাবলীর রাধিকা নন, ইনি শ্রীযুক্তা গডউইনের মন্ত্রশিষ্যা—আত্মমর্যাদায় উদ্‌বুদ্ধা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী; তাই আধুনিকা।

প্রমীলার আশেপাশে সীতা, চিত্রাঙ্গদা, মন্দোদরী, নৃমুণ্ডমালিনী, সরমা—কত বিবিধ জনার আনাগোনা! কিন্তু মঞ্চের দখল দেওয়া হয়েছে প্রমীলাকে।

প্রমীলা তিলোত্তমা বটে, তিলোত্তমা না-ও বটে। সে যেমন ধরা, তেমন অ-ধরা। তিলোত্তমার অন্তরে যে-আগুন তাতে গৃহদাহ হয়, গৃহের প্রদীপ জ্বলে না।

প্রমীলা দুই কূলের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে—সখিগণ সমভিব্যাহারে অশ্বারূঢ়া হয়ে দৃপ্তবেশে লঙ্কায় সে প্রবেশ করেছে ঠিকই। কিন্তু প্রমোদ-উদ্যানে বা শয্যা-গৃহে সে মেঘনাদরূপ মাতঙ্গের চরণে ব্রততী মাত্র। যেমন নারীত্বের নবীন পতাকা হাতে করে সে ভবিষ্যৎমুখীন, তেমনি সহমরণে গিয়ে বাস্তবের বর্তমানত্বকে অটুট রেখেছে। নবীন ধর্ম তার চরিত্রে শুধু অস্বীকৃতি দিয়ে প্রকাশ পায় নি, বাধ্যতা দিয়েও প্রকাশ পেয়েছে। উনিশ শতকের

মধ্যবিত্ত জীবনে এই সামান্য স্ববিরোধিতটুকু ছিল জীবন-অনুগত। অমন যে স্বাধীনতাকামী ব্রাহ্মিকাগণ, তাঁরাও তো চিকের আড়াল থেকেই উপাসনার অংশ গ্রহণ করবেন! কাদম্বিনী দেবীরা তখনও ভবিতব্যের কোল আলো করে আছেন; সমকালের নয়। বিদ্রোহিনীদের সাক্ষাৎ মিলবে অনেক পরে—কেশবচন্দ্র সেনের পরবর্তী যুগে।

বাস্তবে বিঘ্ন যতই থাক, স্বপ্ন দেখতে বাধা কোথায়। কেউ-কেউ স্বপ্ন দেখেন বলে এই পৃথিবী এত সুন্দর।

মধুসূদন বাস্তব নারীকে তাঁর কাব্যে একাধিপত্য দেন নি। এঁরা অনেকেই প্রত্যাশার নারী, অথচ এঁদের মিথ্যার মূর্তি বলে খারিজ করা যায় না। তাঁরা হওয়া-চরিত্র নন, তাঁরা হতে-পারেন চরিত্র। সব দেশের কাব্যের সীমানায় এইরূপ বাস্তবতার একটা স্থান আছে।

সংযুক্তা (ক্যাপটিব লেডি), রিজিয়া, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, তিলোত্তমা, বীরাঙ্গনার বহুজনা বাস্তবের বাঙালিনীর প্রতিকৃতি নন। তাঁরা সব আসন্ন বাস্তবের প্রতিকৃতি।

'বীরাঙ্গনা কাব্য' এক আখ্যায়িকাবিশিষ্ট কাব্য নয়। তার নানা আখ্যানে নানা নারীর প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু কার্যত একটি নারীর প্রসঙ্গই প্রশ্রয়িত। সে নারী হোল প্রেমিকা, জননী নয়। তারা নানা দেশের লোক, নানা সময়ের লোক, নানা বয়সের লোক, কিন্তু তাদের ধর্ম হোল একটি।

গান্ধর্ব মতে বিবাহিতা যে নারী, সে তার স্বামীর কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছে, তাতে কি লিখেছে? লিখেছে, সে প্রেমিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা চায়।

> এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি
> প্রাণপতি?

বহুবিবাহ-অধ্যুষিত সমাজে এই প্রশ্নটি বিবাহিতা কুলকামিনীরা গোপনে গোপনে পোষণ করেছেন, কিন্তু প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে সাহস পান নি। সোমদেব গুরুপত্নীর প্রণয়লোভী ছিলেন কিনা, সে অনুসন্ধান উহ্য থাক। কিন্তু বিবাহিতা নারী অন্য পুরুষে আসক্তা হতে পারে কিনা, এ-প্রশ্ন বারান্তরের জন্য মুলতুবী রাখেন নি মধুসূদন। নারী-জাগৃতির আসন্ন অনেক দাবিদাওয়ার সঙ্গে নতুন একটি যুক্ত হোল।

> "আশীর্বাদ-স্থলে মনে নমিতাম আমি!"

রুক্মিনী তো বরং পতিনির্বাচন করে পত্র প্রেরণ করেছে—

কালরূপী শিশুপাল আসিছে সত্বরে।
আইস তাহার অগ্রে ; প্রবেশি এ দেশে
হর মোরে।

ইচ্ছানুযায়ী পতিনির্বাচন তখন নয়, এখনও বড কৌতুকের ব্যাপার—সহজ ব্যাপার নয়।

কৈকেয়ী দ্রৌপদী ভানুমতী দুঃশলা জাহ্নবী—সবাই বিবাহিতা স্ত্রী। কেউ কেউ মাতৃত্বে অভিষিক্ত। অথচ সবাই স্বামীর প্রতি তাদের বিশেষ কয়েকটি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পত্র মারফৎ ব্যগ্রতা দেখিয়েছেন। এদেশে তৎকালে বাঙ্গালী বধূর বুকের সুধা যতই আনন্দ দান করুক, মুখের মুখরতা বরদাস্ত করা হোত না। আলোচিত কাব্যের জনা চরিত্রটি মধুর এক অভিনব সৃষ্টি। যে ক্রুদ্ধ নারীমূর্তি তিনি এঁকেছেন—গ্রীক ট্রাজেডিতে তার জুডি খুঁজে পাওয়া যায় ; ব্যাসের মহাভারতে কৃষ্ণা বা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষিত মূর্তির সঙ্গেও তার কিছু সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ এই চরিত্রে আছে এক বর্বর জৈব-শক্তির প্রকাশ। আমাদের অনুমান করতে ইচ্ছা হয় যে, এই চরিত্রের অনুধাবনে কবির ব্যক্তি-জীবনের পরকলা আছে। চার-চারটি সন্তানকে এক মন্দভাগিনী নারীর কাঁধে ফেলে রেখে তিনি কলকাতায় নতুন সংসার পেতেছেন। মাদ্রাজে পরিত্যক্ত সন্তানদের কারো-কারো মৃত্যুর সংবাদ তাঁর কানে কোনদিন কি পৌঁছায় নি? বন্ধু মিঃ নেলর তো মাঝে মাঝে আসতেন। চিঠি কি রেবেকাও দুই-একবার লেখেন নি? তাঁর রোগশয্যায় সেবা করবার অধিকার চেয়ে তিনি ত চিঠি লিখেছিলেন! কনিষ্ঠ পুত্রটির মৃত্যুসংবাদ তিনি কিভাবে পেয়েছিলেন? চিঠিতে, না নেলর-মারফৎ? সূত্র যাই হোক, রেবেকার আহত চক্ষুদ্বয় থেকে যে-অগ্নিকণা স্ফুরিত হয়েছিল, সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করেও মধুসূদনের পক্ষে তা অনুমান করা কষ্টকর ছিল না। মধুসূদন কবি। তাঁর কবিতার জগৎ প্রত্যক্ষ জগতের মেঘ-ছায়ার আছন্ন, বজ্রবিদ্যুতে ও ধারাবরিষণে আর্দ্র ও কম্পমান হয়ে উঠেছিল কিনা, কে বলবে?

১৮৫৫ সনে রেভরেণ্ড জন লঙ্ যখন তাঁর "A Descriptive Catalogue of Bengali Works" প্রকাশ করেন, তখন তিনি কবিতার প্রসঙ্গে পুরাতন বা মধ্যযুগের কথা শুধু বল্লেন। মধ্যযুগের কাব্যের বিষয় ছিল সীমিত প্রেম এবং ধর্ম। বিষয়বস্তুর দীনতা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। বর্তমান যুগের কাব্য সম্বন্ধে তিনি লিখলেন, "At the present few

পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের পাণ্ডুলিপি পড়ে বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামীয় তাঁর এক প্রিয় ব্যক্তি আনন্দ প্রকাশ করলে তিনি ঐ গ্রন্থের স্বত্ব তাঁকে দান করেন। অর্থের প্রতি তাঁর কি প্রকার ক্ষমতা ছিল, এর থেকে বুঝা যাবে। এই সময় তিনি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি বেড়িয়ে এলেন—দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে দু'পক্ষের সাক্ষাৎ হোল—সেই কবতক্ষ, সেই বটবৃক্ষ, সেই ভাঙ্গা শিব মন্দির, সেই দত্তদের বৃহৎ অট্টালিকা, চণ্ডীমণ্ডপ। আর সকল চিত্র, সকল ছবিব পিছনে আছে আর একজনের উপস্থিতি—তিনি হলেন জননী জাহ্নবী দেবী। মাতুল বংশীধর ঘোষের আহ্বানে তিনি মাতুলালয় কাটিপাড়াও ভ্রমণ করে এলেন। বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি স্ব-ধর্মত্যাগী; সাগর-দাঁড়ি তার সন্তানকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল? জীবনীকারেরা বলেছেন, যে-কয় দিন ছিলেন, সে কয় দিন অজস্র লোক, ভদ্র-ভদ্রেতর সমস্ত শ্রেণীব লোক, তাঁকে দেখতে আসতেন। সাগরদাঁড়ির ছেলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখেছেন! কাব্য তাঁরা পড়েন নি, হয়ত নাম শুনেছেন মাত্র। তাতেই তাঁরা উত্তেজিত!

কলকাতায় ফিরে এসে একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত নিলেন। এবার আর সদর আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া নয়! বাংলা কাব্যেব সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কি আর এদেশে কোন পরীক্ষায় বসতে পাবেন? তা কি আদৌ শোভা পায়। অথচ ব্যবহারজীবী হতে হবে।

"It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money."

এই **'idle verses'**, হোল মেঘনাদবধ কাব্যের শ্লোকসমূহ! অর্থের কি প্রতাপ সেই 'ইউটেলিটেরিয়ান' সমাজে?

যে-সাহিত্য রচনার জন্য কদাচিৎ তিনি ঘর থেকে বেরুতেন, সংবাদপত্র পর্যন্ত পড়তেন না, সে সাহিত্য সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি!

পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু তবু তিনি লিখছেন, **"But I wish for some independent position so that I might devote my-self, wholly and solely, to my favourite studies."**

ঐ সামান্য চাকরী আর তিনি করতে চাইছেন না! স্ত্রীর অসুখের জন্য খুব উদ্বিগ্ন থাকলেন কিছু দিন। হেনরিয়েটাকে নিয়ে কয়েকটা দিন নৌকা-বাস করলেন। বর্ধমান পর্যন্ত ঘুরে এলেন।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-'বীরাঙ্গনা কাব্য' লেখা শেষ হয়ে গেছে। জীবনের একটা পর্ব শেষ হোল। মধুসূদন স্থির করলেন তিনি বিলাত যাবেন ঃ ব্যারিস্টারী পড়বার জন্য। বালক বয়সে লিখতেন, বিলেত না গেলে কবি হওয়া যায় না। সে মত যে ভ্রান্ত তা নিজে প্রমাণিত করেছেন। আজ ভাবছেন বিলেত না গেলে বৈষয়িক উন্নতি হবে না। সে মত যে আরো ভ্রান্ত তা বড় নিষ্ঠুরভাবে প্রমাণিত হবে।

"আমার কবি-জীবন আজ সমাপ্তির মুখে। ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য আমি বিলেত যাওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি হচ্ছি। কাব্য-ভারতীকে অবশ্যই বিদায় সম্ভাষণ জানাব। জেনে খুসি হবে যে মহান বিদ্যাসাগর আমার প্রস্তাবিত বিলাতযাত্রার ব্যাপারে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখাচ্ছেন, এবং আমার এই মতামতগুলি সক্রিয়ভাবে সমর্থন করছেন। আমার ভূ-সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে তিনি আমার বিলেত যাওয়ার টাকা জোগাড় করছেন। এ ব্যাপারে আমার বিশ হাজার টাকা খরচ পড়বে, আমি তা খরচ করতে পারি।"

"No more Madhu the কবি, Old fellow, but Michael M.S. Dutt, Esquire of the Inner Temple, Barrister at Law! Ha! Ha! Isn't that grand? But I hope I shouldn't be disappointed."

যে কথা সেই কাজ।

১ পিতার আমলের কর্মচারী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সমস্ত সম্পত্তি পত্তনি দেওয়া হোল। রাজা দিগম্বর মিত্র ও বৈদ্যনাথ মিত্র এই চুক্তি কার্যকর যাতে হয় তার জন্য প্রতিভূ থাকলেন। চুক্তির ফলে অগ্রিম কিছু টাকা পেলেন; আর মাসে দেড়শত টাকা তাঁর স্ত্রীর হাতে দিতে হবে।

২ পৈত্রিক গৃহ বেচলেন বাল্যবন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এই প্রাসাদোপম গৃহ মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রয় হোল। তা-ও সবটাকা নগদে নয়। কিছু টাকা পাওনা থাকল।

মামলা-মোকদ্দমার খুঁটিনাটি প্রশ্নগুলি মীমাংসিত হতে-হতে সময় লাগল। যাত্রার চার দিন আগে বন্ধু রাজনারায়ণকে এক চিঠি লিখলেন—"ঈশ্বর জানেন আমাদের পরস্পরের মধ্যে আবার সাক্ষাৎকার হবে কিনা! কিন্তু তুমি তোমার বন্ধুকে ভুলো না।

বন্ধু! এ-এক দীর্ঘ বিচ্ছেদ—চার বৎসরের বিচ্ছেদ! কিন্তু কি আর করা যাবে! তুমি তোমার বন্ধুকে মনে রেখো, তার খ্যাতি যাতে রক্ষা পায় তার জন্য যত্নশীল থেকো!

আমি যদিও এক তুচ্ছ কবি, তবু যাওয়ার সময় দু'ছত্র না লিখে যেতে পারছি না। আমি সেই লেখা এর সঙ্গে পাঠাচ্ছি—আমার মনে হয় লেখাটা খুব ভালো না হলেও সম্মানজনক।"

লেখাটি তাঁর অবিস্মরণীয় কবিতা "জন্মভূমির প্রতি।" এই কবিতায় জন্মভূমিকে 'শ্যামা জন্মদে' বলে সম্বোধন করেছেন। এমন সার্থক সম্ভাষণ ইতিপূর্বে আর হয় নি। মধুর সমগ্র সাধনা এই শ্যামা জন্মভূমিরই স্তুতি—কী নাটকে, কী কাব্যে, কী সমকালের কথায়, কী পুরাকালের কথায়!

বন্ধুকে শেষ প্রার্থনা জানালেন—

'মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে!"

কথাটা বলেছেন তাঁর প্রিয় রাজকে, কিন্তু কথাটা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উদ্দেশে।

পুত্রকন্যা-স্ত্রীকে দেশবাসীর কাছে রেখে বাঙালী জাতির প্রথম আধুনিক কবি ৫ই জুন কলকাতা ত্যাগ করলেন। জাহাজের চাকা জল কেটে অকূলে পাড়ি দিল—পিছনে হয়ত প্রতিধ্বনি তুলছিল সেই আনন্দময় পুরুষের অকপট উচ্চহাসি—

"Michel M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple, Barrister at Law !! Ha !! Ha !!"

পাদটীকা

১. মধু-স্মৃতি -লালবিহারী বসাকের স্মৃতিচারণা, পরিশিষ্ট।

২. জীবন-চরিত—গৌরদাস বসাকের স্মৃতিচারণা, পরিশিষ্ট। পৃঃ ৬৫৪-৬৫৫।

৩. Fort St. George Gazette, 1856.

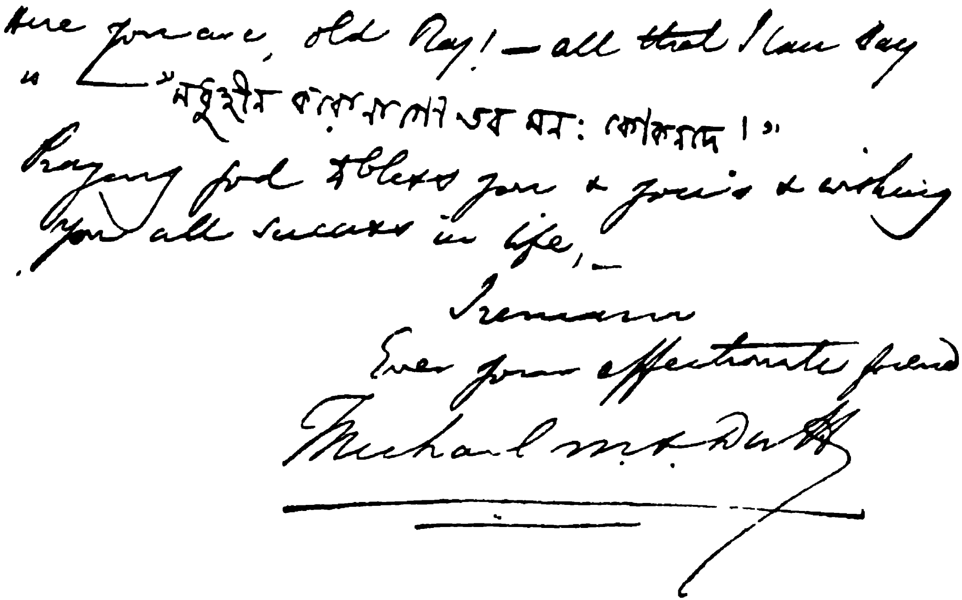
৪. Bengal Past and Present, 1923, Vol. 26; page-191; foot note.

৫. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট।

৬. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট। পৃঃ ৬৫৬।

৭. ঐ; ৬৬৩।

৮. Bengal Past and Present—Michael Modhusudan Dutt and his Anglo Indian Wives—W. H. B. Morens. 1923, July-December Vol. 26. Page-191.


Here you are, old Ray! — all that I can say
is "মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।"
Praying God to bless you & yours & wishing
you all success in life, —
I remain
Ever your affectionate friend
Michael M. S. Dutt

[illegible] মধুসূদনের পত্রের একাংশ

৯. The National Magazine, May, 1893.

১০. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট।

১১. ঐ, পৃঃ ৬৭৩।

১২. সংবাদ প্রভাকর, ৮ আশ্বিন, ১৭৮১ সাল।

১৩. বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৮৩ শকাব্দ, আষাঢ়।

১৪. পদ্মিনী উপাখ্যান—ভূমিকা।

১৫. জীবন-চরিত—পৃঃ ১৪৬।

১৬. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

১৭. বিবিধ প্রবন্ধ রাজনারায়ণ বসু। ১ম খণ্ড, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।

১৮. বিবিধার্থ সংগ্রহ—৭ পর্ব, ৭৫ খণ্ড।

১৯. রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮ খণ্ড। (শতবার্ষিকী সং)।

২০. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট।

২১. Calcutta Review—1871, April, Vol. 52, No. 132.

২২. The Economic History of India, Vol. I—Romesh Dutt. 1970, Reprint, page 298.

২৩. ঐ, page 299.

২৪. Fort St. George Gazette—April, 1852.

২৫. The Ramayan—C. Rajagopalachari, Chapter XXXII. Bharatiya Vidyabhavan, Bombay.

২৫ক. বাল্মীকি রামায়ণ—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত। অরণ্যকাণ্ড—৩৩ সর্গ।

২৬. Kamba Ramayanam—A Study, V. V. S. Aiyar. Bharatiya Vidyabhavan, 1965. Page 213.

২৭. ঐ, page 266.

২৮. Kamba Ramayanam—Page 222.

২৯. মধু-স্মৃতি।

৩০. হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম খণ্ড—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল। পৃঃ ১৮৫।

৩১. জীবন-চরিত—পরিশিষ্ট।

বিলেত যাত্রার পূর্বাহ্ণে রাজনারায়ণকে লেখা এক চিঠি ; ভবিষ্যতের স্বপ্নে-ভরা সে চিঠি। 'মাইকেল এম. এস. ডাট, এস্‌কোয়ার অফ দি ইনার টেম্পল। ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল। হাঃ হাঃ হাঃ!' এমন অট্টহাসি তাঁর মুখেই মানায়। এ হাসি যেমন তাঁর, তেমনি তাঁকে যিনি রচনা করে চলেছেন তাঁরও হাসি।

রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে ব্যবহারজীবী হবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। বহু পূর্বে ঐ জীবিকা গ্রহণ করলে স্বাভাবিক ঘটনা বলে আমরা মেনে নিতাম। শিক্ষকতা তাঁর পেশা নয়, কেরাণীগিরিও তাঁর যোগ্য নয়। তাঁর পারিবারিক, তথা পৈত্রিক পেশা ওকালতি। অর্থ-ব্যয় করতে হলে পর্যাপ্ত অর্থ আয় করতে হয়। বাঁধা মাইনের চাকরীতে অর্থও তো বাঁধা।

'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার সময় তিনি সদর আইন পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। 'গোরা' উপন্যাস রচনার সময় রবীন্দ্রনাথকে যে ব্যারিস্টারী পরীক্ষার জন্য পড়া তৈরি করতে হয় নি, তার জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ। স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মধুসূদনকে ব্যারিস্টার হতে হবে ; আজ আর বিলেত-দর্শনের জন্য নয়। মধুর এই প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় সমর্থন জানিয়েছেন।

মধুর এতদিনকার জীবনে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে একটা সঙ্গতি ছিল। এবার সেই সঙ্গতি ছিন্ন হোল। আয়ের স্বল্পতার জন্য মধুর মনে ক্ষোভ ছিল। "কুড়ের মত আমি কি কেবল পদ্য লিখে যাবো, আর অর্থ রোজগার করবে অন্য লোকে?"

রাজনারায়ণ দত্তের পুত্রের রক্তের মধ্যে অর্থের প্রতি আসক্তি ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তো ছিলেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান! তিনি কেন এই অগ্নিতে ইন্ধন জোগালেন? এই ছিল সে যুগের নির্দেশ। নিছক পরিবারগত ব্যাপার নয়।

'ভালভাবে থাকবো' এই ইচ্ছা তখনকার সাধারণ ইচ্ছা। সচ্ছলভাবে থাকবো, স্বাধীন ভাবে থাকবো, এই ইচ্ছা মধ্যবিত্তের কৌলিক ইচ্ছা। দেশের বহু পণ্ডিত এই ইচ্ছার বশে স্কুল-পাঠ্য বই লিখেছেন, ছাপাখানাও গড়েছেন। সে যুগের সাধারণ ইচ্ছায় তাঁরা সবাই পীড়িত। দু'হাতে আয় আর দু'হাতে ব্যয় তবে তো জীবন। দান করাও একরকম ব্যয়।

মধুর মধ্যে এই ইচ্ছাটা অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়ে দেখা দেয়; এবং তাঁর জীবনের ছন্দই নষ্ট করে দেয়, ভারসাম্য বিপর্যস্ত করে দেয়।

॥ ১ ॥

১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে ৯ই জুন কাণ্ডিয়া জাহাজে চ'ড়ে তিনি বিলেত যাত্রা করলেন; মাদ্রাজ হ'য়ে সে জাহাজ সিংহলে গিয়ে নোঙ্গর ফেলল। মাদ্রাজে মুহূর্তের জন্য জাহাজ থামে নি।

সিংহলে পৌঁছে পুরাণের কোন অভাগিনী নারীর জন্য অশ্রু মোচন করলেন। মাদ্রাজে যিনি পরিত্যক্তা, তাঁর কথা কি মনে পড়েছিল?

বিলেত যাওয়ার পূর্বে একবার মাতৃভূমি দেখে এসেছেন, স্বগ্রাম দেখে এলেন, কবতক্ষ নদে স্নান করে এলেন, এমন কি মামার বাড়ি কাটিপাড়া ঘুরে এলেন। অতীতের সব বাঁধন নেড়ে-চেড়ে দেখলেন। কিন্তু চারিটি সন্তান এবং যৌবনেব লীলা-সঙ্গিনীর কোন খোঁজ নিলেন না কেন?

মধুসূদনের বাহ্য আচরণে এঁর কোন জবাব নেই। সিংহলে হঠাৎ সীতার দুঃখে ডুকরে-ওঠার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থ আবিষ্কার করার প্রয়োজন নেই। জাহাজ এগিয়ে চলেছে আর কবি ভাবছেন, 'আমি ক্রমশই ইংলণ্ডের সমীপবর্তী হচ্ছি'।

"আমার বাল্যকাল থেকে যে-দেশের জন্য এত ভেবেছি প্রতিটি মিনিট আমি তার কাছে এগিয়ে চলেছি একথা আমি ভাবতেও পারি না!"

অবশেষে ইংলণ্ডে এসে পৌঁছুলেন।

সব নবাগতরাই যেমন করে থাকে, মধুও তাই করলেন। দর্শনীয় স্থান দেখে-দেখে বেড়াতে লাগলেন। আলাপ হোল দুটি উজ্জ্বল তরুণের সঙ্গে। একজন পিতৃবন্ধুর ছেলে আর একজন ঠাকুর পরিবারের ছেলে। —মনোমোহন ঘোষ আর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনোমোহন ও সত্যেন্দ্র দু'জনেই আবার পারিবারিক সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ। মনোমোহনের পিতা রামলোচন ঘোষ দ্বারকানাথের সহকর্মী ও দেবেন্দ্রনাথেরও বন্ধু। এই দুই যুবক একযোগে বিলেতে এসেছিলেন।

মধুসূদন এঁদের লেখাপড়ার প্রবল উৎসাহদাতা; চিঠিতে লিখলেন, তোমাদের প্রতি সমগ্র জাত তাকিয়ে আছে।

মনোমোহনের বাবা মধুসূদনের পিতৃবন্ধু। তাই মনোমোহনকে লিখেছেন, তোমার বাবাকে লিখে জানিও যে, আমি এমন কিছু করব না যার ফলে সেই

ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি অমর্যাদা করা হয়, যাঁকে তিনি একদা ভালবাসতেন, ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন। মনোমোহন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে এসেছে ; ঐ পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে ইংরেজী সাহিত্যের একটা বড় জায়গা আছে। মধু লিখলেন, তোমার শেক্সপীয়র পাঠে আমি সহায়তা করব।

॥ ২ ॥

মধুর সঙ্কল্প ছিল ইনার টেম্পলে ভর্তি হওয়া। কিন্তু ভর্তি হলেন গ্রেজ ইনে। আর্থিক বা অন্য কারণ কিনা বলা দুষ্কর। ১৮৬২ সনে ১৯-এ আগস্ট তিনি ভর্তি হলেন।

মধুর গ্রেজ ইনের ছাত্র জীবনের বিবরণ-সংগ্রহ করা কষ্টকর। কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে যে-জবাব পেয়েছি, তার প্রতিলিপি পাদটীকায় দিলাম। পরে আমরা এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য কিছু সংগ্রহ করেছি।[১]

মধুর নাম Admission Register-এ লেখা রয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ডাট নয়। ঠিকানা রয়েছে কলকাতা। লণ্ডনের কোন গৃহের ঠিকানা তিনি দেন নি।

বিলেতে যাওয়ার পূর্বে রাজনারায়ণকে লেখা চিঠিতে Michael M. S. Dutt, Esquire of the Inner Temple, Bar-at-law বলে ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছেন, কিন্তু সে ছবি কল্পনার। লণ্ডনে তিনি নিছক দত্ত। এটা মধুচরিত্রের একটি বিশেষ দিক।

১৮৬২ সনের পাঁচটি মাস ভালভাবে কাটল ; কলকাতা থেকে নিয়মিত টাকা আসছে।

মহাদেব চাটুজ্যে পিতার আমলের কর্মচারী ; তাঁকে মধুসূদন পত্তনী দিয়ে এসেছেন। এই মহাদেব লোকটি কেমন ? পিতার মৃত্যুর পর জ্ঞাতিরা যখন তাঁর সম্পত্তি জবরদখল করার চক্রান্ত করছিলেন, তখন মহাদেব চাটুজ্যে শিবতুল্য ব্যবহার করেন নি। চাটুজ্যে মধুর সম্পত্তির জবরদখলীর কোন প্রতিবন্ধকতা করেন নি। তবু সম্পত্তি যখন উদ্ধারপ্রাপ্ত হোল, মধু তাঁকেই পত্তনীদার নিযুক্ত করে বিলেত যাত্রা করলেন।

কয়েক মাস চুক্তি অনুসারে টাকা বিলেতে এল, কলকাতায়ও এল। পরে অজ্ঞাত কারণে টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। চিঠি লিখে অনুরোধ-উপরোধ জানিয়ে কোন ফল হোল না। দিগম্বর মিত্র ও বৈদ্যনাথ মিত্র

মধুসূদনের প্রতিভূ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নীরব দর্শক ছিলেন, কি সরব প্রশ্রয়দাতা ছিলেন, তা বলা খুব সহজ নয়। শ্রীমতী হেনরিয়েটা কোন উপায়ান্তর না দেখে স্বামীর কাছে চলে গেলেন।

মধু লণ্ডন ছেড়ে ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে এসে বসবাস শুরু করলেন; খরচপত্র কম, কিন্তু তাতে তাঁর সঙ্কট কমল না, বরং বাড়ল। মধু বারবার তাগাদা দিচ্ছেন। কিন্তু এ হোল ভারতবর্ষ, এবং বাংলাদেশ। পরের সম্পত্তি (এবং সে পর যদি বিদেশগত হয়) বিনা খরচায় যদি ভোগ করা যায়, তবে সে সুযোগ অবহেলা করা ধর্মসঙ্গত নয়। ফলে কলেজে ধার হোল, বেচারী মনুর কাছেও ধার হোল। মনুর বড় কষ্ট হচ্ছে!

কি করা যায়! কাকে লেখা যায়!

সেই যে কলকাতায় একবার লিখেছিলেন—'first man amongst Bengalee.'

সমসাময়িক বাঙ্গালীদের মধ্যে যিনি শীর্ষস্থানীয়, তাঁর কথা মনে পড়ল। গৌরদাস নয়, রাজনারায়ণ নয়, যতীন্দ্রমোহন নয়, রাজেন্দ্রলাল নয়। সবাই প্রিয় বন্ধু, কিন্তু অগতির গতি কে? অনাথের আশ্রয় কে? বিপন্নের উদ্ধার-কর্তা কে হতে পারেন? তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ছাত্রাবস্থায় সমসাময়িক, কিন্তু পরিচয় ছিল না। সুদূর মাদ্রাজে ব'সে তাঁর কথা শুনেছেন; তাঁর সাহসিকতা, তাঁর পরদুঃখকাতরতা, এক কথায় তাঁর হৃদয়বত্তার খবর তিনি পেয়েছিলেন। কলকাতায় এসে পরিচয় হোল। হরিশ মুখুজ্যের মৃত্যুর পরে যোগাযোগ হোল হিন্দু প্যাট্রিয়ট পরিচালনা নিয়ে। প্যারীচরণ সরকারের মত প্রথমে তিনিও অমিত্রাক্ষর ছন্দের মহিমা অনুভব করতে পারেন নি। অনেকের মত মাইকেলও মনে করেছেন, এটা আর কিছু নয়, ঈর্ষা।

'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের পর ঐ ব্যক্তির বিরূপতা মুছে গেল। সে কি শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঐশ্বর্য দেখে? না, রাবণকে দেখে? নিজের এবং আরও অনেকের প্রতিবিম্ব খুঁজে পেয়ে? প্রমীলাকে দেখে বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষতাকারী কি আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন? প্রমীলা ভবিষ্যতের চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী; তাঁরই মানস-সন্তান। বিদ্যাসাগর যাকে বীজমন্ত্র করে সমাজ-সংস্কারে মেতেছিলেন, মধুসূদন সেই মন্ত্রের জয়ধ্বনি দিয়ে মহাকাব্য, গীতিকাব্য লিখে ফেললেন।

এক যুগে একই বক্তব্য ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রূপকার খুঁজে পায়।

বেকনই সেক্সপীয়ার, এ তর্ক অনাবশ্যক। কিন্তু বেকন আর সেক্সপীয়ার একই সোপানে দাঁড়িয়ে আছেন—জীবনবোধের, জগৎ-অনুভবের। বিদ্যাসাগরকে চিঠি লেখাই বিধেয় মনে করলেন,—অন্তরের তাগিদে, বাহ্য সম্পর্কে নয়।

চিঠি তিনি নিজে লেখেন নি, তিনি বলে গেছেন, স্ত্রী হেনরিয়েটা লিখেছেন।

'তুমি যদি একজন সাধারণ লোক হতে তাহলে আমি চিঠি শুরু করতাম গুছিয়ে-সাজিয়ে ক্ষমা চেয়ে। কারণ এত দিন কেন চিঠি লিখি নি? কিন্তু তুমি ত জানো বিপদের দিনে আমরা কখনই সে লোকের কাছে যাই না, যাকে আমরা আমাদের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে খাঁটি এবং সবচেয়ে আন্তরিক লোক বলে মনে না করি।'

বিদ্যাসাগরকে নিজের দুঃখের কথা জানালেন, পনের হাজার টাকা জোগাড় করতে বললেন—ধার করে—সম্পত্তি বন্ধক রেখে।

দিগম্বর মিত্রকে চিঠি দিয়েছেন, উত্তর নেই। প্রাণকৃষ্ণ ঘোষকে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু সে বেচারার কিছু করবার সামর্থ্য নেই। দিগম্বর মিত্রকে তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' উৎসর্গ করেছিলেন।

॥ ৩ ॥

মধুসূদনের দুঃখের দিন শুরু হোল। মাদ্রাজে প্রতি মাসে অভাবের তাড়না অনুভব করতেন। তবু কর্মোদ্যম অটুট ছিল। প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন—ইংরেজী ভাষায় সাহিত্যসাধনা করতে গিয়ে, ভাল চাকরীর সন্ধান করতে গিয়ে। তবু সম্মুখে আশার সমুদ্র কাঁপছিল, কল্লোলিত হচ্ছিল।

'আমি কি আমার পিতৃপুরুষের ভাষা সমৃদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ আয়োজন করছি না!' এ হোল তখনকার বক্তব্য!

আজ বলছেন কি?

"I am making the very best use of my unfortunate exile, and I think I may without vanity say, I know more languages than any Bengalee now living. But learning is not money." (৩ জানুয়ারী, ১৮৬৫)

তবু কি মাতৃভাষা সেবার ইচ্ছা মরে ?

দেশে ফিরলে দেশবাসীকে এই ভাষা তিনটির মধুময় অমর সাহিত্যের স্বাদ দেব।

ইউরোপীয় জ্ঞান-চর্চার তিনি খুব প্রশস্তি করেছেন। 'কিন্তু আমরা যখন দুনিয়াব কাছে কথা বলব, তখন আমাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলতে হবে।'

"I should scorn the pretensions of that man to be called 'educated' who is not the master of his own Language."

তারপর কি লিখছেন, তা বার বার পড়লেও তৃপ্তি হয় না।

'হে প্রিয় সখা, বিশ্বাস করো, বাংলা বড মিষ্টি ভাষা, শুধু প্রতিভাবান লেখকের প্রয়োজন একে ঘসে-মেজে সুন্দর করে তুলতে। আমরা যারা ভুল শিক্ষার জন্য একে বিশেষভাবে জানি না, এবং অবজ্ঞা করতে শিখেছি, তারা যথার্থই দুর্ভাগা, তারা বিভ্রান্ত। বাংলাভাষা একটি মহান ভাষা, বা বলা যায় বাংলাভাষার মধ্যে মহান ভাষার সব বৈশিষ্ট্য আছে।

'আমার সাধ যায় এর সেবায় সর্বস্ব সমর্পণ করি। কিন্তু তুমি ত জানো আমার এমন কোন সঙ্গতি নেই, যাকে পুঁজি করে সাহিত্য-জীবন যাপন করতে পারি, বিকল্প কিছু না করেও।

আমি দারুণ গরীব। তবু এমন অহংকারী যে, চিরকাল দরিদ্রের মত থাকতে চাই না।'

"It I have not done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done."

কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কন, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র—সবাই ভূ-স্বামীর আশ্রিত কবি। অন্য কোন জীবিকায় তাঁদের মেধা ও উৎসাহ ক্ষয়িত হোত না। সাহিত-চর্চা একটা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন জীবিকা হিসাবে এদেশে দেখা দেয় নি।

মধুসূদন বর্ধমানের মহারাজার সভাকবি হতে চেয়েছিলেন, কৃষ্ণনগরের মহারাজার কাছেও রসিকতাচ্ছলে ঐ রকম একটা প্রস্তাব তুলেছিলেন। কেবল লেখক-বৃত্তি ধারণ করে বাঁচতে চেয়েছিলেন মধুসূদন। স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ

না লিখে এই প্রকার স্বাধীন লেখক-বৃত্তির জন্য ব্যগ্রতা, সে যুগের পক্ষে একটা অপরাধ।

জীবনীকারেরা বলেছেন, মধুর দুর্দশা একান্তভাবে তাঁর স্বকৃত; তিনি অমিতব্যয়ী। কেউ কেউ অমিতব্যয়িতা আর উচ্ছৃঙ্খলতাকে পংক্তি-ভোজনে ভীষণ বসিয়ে থাকেন।

॥ ৪ ॥

অমিতব্যয়িতা সংসারী মানুষের পক্ষে একটা অপরাধ, যেমন মিতব্যয়িতাও গুণ নয়। উচ্ছৃঙ্খলতার অর্থ কি? সংজ্ঞা কি?

এদেশে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে লোকে উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করে।

মধুর নৈতিক জীবন কেমন ছিল? ১৮৬২ সনের আগস্ট মাস থেকে ১৮৬৩ সনের মে মাস পর্যন্ত মধু বিলেতে একা ছিলেন, অর্থাৎ স্ত্রীবিহীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর নীতি-বিগর্হিত আচরণ বিষয়ে গুজব রটেছে ১৮৬৫ সনে।

পরনারী 'সংসর্গের' উদাহরণ একটিও যে নেই, তা নয়। স্ত্রীর আগমনের পূর্বে নয়, পরে একটি ঘটনা দেখতে পারে। জনৈকা বিদেশিনী মহিলার সঙ্গে মধুর ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়েছিল। চরম দুঃখের দিনে তাঁর মমতাভরা দান কবি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন। স্বভাব কলুষতাময় মানুষ এর সৌন্দর্য অনুধাবন করতে না পারলে তাঁর জন্য কি মধুসূদনই দায়ী হবেন?

'তুমি শুনলে খুসি হবে আমি ফরাসী জেলবাসের অপমান পরিহার করতে পেরেছি জনৈকা তরুণী ফরাসী ভদ্রমহিলার কৃপায়। তিনি সুন্দরী ও দয়ার্দ্রা। তাঁর সঙ্গে আমার ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়েছিল। তারপর থেকে তিনি আমাদের সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহল প্রকাশ করেন। আমাদের দুঃখের দিনে সান্ত্বনা দেন, অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন—আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িওয়ালার কাছে যান, তাঁকে তিনি অনুনয়-বিনয় করলেন, যা শুধু একজন ফরাসী ভদ্রমহিলার পক্ষেই সম্ভব।'

মধু আরও কিছু লিখেছেন। সব বক্তব্যে আছে কৃতজ্ঞ ব্যক্তির অকপট কৃতজ্ঞতা। বাংলাকাব্যে আরও দুই একজন কবির জীবনে বিদেশিনী সংসর্গ ঘটেছে। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতা মধুর অপেক্ষা গভীরতর বা স্নিগ্ধতর নয়।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে তিনটি সনেট আছে—সমালোচকেরা অনুমান করেছেন ঐ সনেটগুলির উদ্দিষ্টা নারী হলেন ঐ ফরাসী তরুণী। 'পরিচয়' শীর্ষক দুইটি সনেট—(সংখ্যা ১৩, ১৪) 'কুসুমে কীট' (২৬) ও নামবিহীন দুইটি সনেটে (৫৮, ১০০) নারী প্রসঙ্গ আছে। এর মধ্যে ১০০ সংখ্যক সনেট স্পষ্টত হেনরিয়েটার উদ্দেশ্যে লেখা—কারণ প্রেমিকা নন, জীবন-সঙ্গিনীই এই কবিতার উদ্দিষ্টা। 'পরিচয়' সনেট দু'টির বিষয়বস্তু পৃথক ; সনেট দু'টি যে পূর্ব-পরিচিতা কারও উদ্দেশে লেখা নয়, এটা বোঝাব জন্য কষ্ট করতে হয় না। কারণ পূর্ব-পরিচিতাব কাছে নতুন করে কেউ আত্মপরিচয় দেয় না। ৫৮ সংখ্যক কবিতায় যে উচ্ছ্বাসেব তীব্রতা আছে, তাও বহুদিনের পরিণীতা স্ত্রীর প্রতি বর্ষিত হতে পারে না। স্ত্রীর প্রতি যে প্রেম, তা নির্ভরতায় ভরা, অতএব প্রশান্তিময়। কারণ তিনি যে

প্রেমের প্রতিমা তুমি আলোকে আঁধারে।
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার মাঝারে।

৫৮ সংখ্যক সনেটের নারী এই স্তুতির অধিকারিণী হতে পারেন না। এমন যোগ্যতা একদিনে অর্জিত হয় না।

নহি আমি চারু-নেত্রা, সৌমিত্রি-কেশরী,
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে ?
চন্দ্র-চূড-রথী তুমি, বড ভয়ঙ্করী-
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।
গিরির আডালে থেকে, বাঁধ লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি ; দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধরে ;
মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি—
এ বড় অদ্ভুত রণ ! তব শঙ্খ-ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণ।
এতে দিগম্বরী-রূপ, যদি, সুবদনি,
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্ত কে লো পরাস্ত না মানে ?

সম্ভোগ-কৌতুকের নানা অভিজ্ঞতা যেন হুড়াহুড়ি করে প্রবেশ করেছে।

১০০ সংখ্যক সনেটে যে স্থৈর্য প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। কেউ কেউ বলেছেন, তবে কি রেবেকা এইসব কবিতার উদ্দিষ্টা? এ অনুমান তথ্য-অনুমোদিত নয়। কারণ ৫৮ সংখ্যক সনেটে যে-উতরোল, তার সূচনা হয়েছে 'পরিচয়' শীর্ষক সনেটে—(১৩ ও ১৪ সংখ্যা)। ১৩-১৪ সংখ্যার থেকে ৫৮ সংখ্যক সনেট পরপর সাজালে কবির অন্তর-ইতিবৃত্তে একটি ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। সর্বশেষ কবিতাটিতে এসে ঘটনা তুঙ্গ স্পর্শ করেছে এবং পরে এ-বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করা চলে না। কবির জীবনে নারী-সংসর্গ আজ আর কৈশোরের মত নৈষ্ঠিকতার দ্বারা আক্রান্ত নয়। তমলুকের অভিজ্ঞতার মাত্রা আমরা জানি না, কিন্তু মধুসূদন তাতেই নিজেকে দুর্নীতিপরায়ণ বলেছিলেন (moral wreck)। আজ অভিজ্ঞতা তাঁকে ব্যক্তি-নীতিবোধ (personal morality) বিষয়ে উদার হতে শিক্ষা দিয়েছে। এগুলি 'স্খলন' বলে উপহাস করে লাভ নেই।

রেবেকা-অভিজ্ঞতা এই কবিতার উপজীব্য হতে পারে না—কারণ অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে রোমন্থন করা যায়, কিন্তু তাতে প্রত্যক্ষতার উত্তাপ থাকে না।

উদ্দিষ্টা যিনিই হোন, মধুসূদনের জীবনের এইটুকু নিয়ম-বিরুদ্ধতা কাব্য-সংসারে বরদাস্ত করতে হয়। চণ্ডীদাস থেকে পেত্রার্কা তারই ত নজির!

অথচ কলকাতা শহরের মাতব্বর ব্যক্তিরা মধুসূদনের ইউরোপ-জীবনের গোপন সংবাদের জন্য দারুণ কৌতূহলবোধ করেছেন। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিকে এই নিন্দালোভীদের প্রশ্নের উত্তরও দিতে হয়।

"আমি লণ্ডনে এমন কিছু করি নি, যার জন্য আমার সর্বোত্তম সুনীতি-পরায়ণ বন্ধুকে লজ্জাবোধ করতে হবে।"

লণ্ডন ছেড়ে কেন তিনি মার্সাই-এ আছেন, এ-ও একটা প্রশ্ন। বিনাসুদে পাঁচটি টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন নি বলে পাঁচটা প্রশ্ন করবেন না, এই বা কেমন কথা! কর্মহীন জাতির অনাবশ্যক কৌতূহল থাকে।

লণ্ডনে পৌঁছে মধু দু'জন ভারতীয়কে অতিশয় কাছে পেয়েছিলেন—মনু আর ইন্দ্র—মনোমোহন ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাঝে মাঝেই এঁরা দু'জন মধুর কাছে এসে কয়েকদিন থাকতেন। মধু এঁদের সঙ্গে অনেকটা

অভিভাবকের মত আচরণ করতেন। এঁদের দু'জনকে তিনি কেমন ভালবাসতেন, তা একবার জরিপ করা দরকার।

এই ভালবাসাগুলি প্রমাণ করে যে, এ-মানুষ রিক্ত নয়; আর উচ্ছৃঙ্খলতা যে চিরকাল রিক্ততার আত্মীয়!

লণ্ডনে পৌঁছেছেন; মাস দেড়েক পরে লেখা চিঠিতে এই উষ্ণতা লক্ষ্য করা যায়।

'I feel very dull and sad, and have been so since my specially removal, but I must accustom myself to this state of things, as both of you are going to leave town, in so short a time, I need scarcely say that I miss both of you very much.'

লণ্ডনের আশেপাশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখে বেড়াতেন। এই সুন্দর পর্যটনকালে মনে পড়ছে ঐ দুটি কিশোরকে—I thought of you and our dear Satyendra.

তারপরে তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর সদ্যদেখা স্থানগুলি। অবশেষে লিখেছেন, 'I am very dull and melancholy and long to see you both.' বিদেশে তাঁরা এসেছেন বিদ্যা আহরণ করতে।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকে দেবযানীর প্রসঙ্গ ছিল; কিন্তু কচের সাধনার কথা ছিল না। এখন লিখলে সে গল্প পরিবর্তিত হয়ে যেত। এখন নাটকের নায়ক তেমন বিলাসপরায়ণ হোত না, লোভাতুর যযাতি তো নয়ই।

কিশোর দু'টিকে লিখেছেন—'কাজ করে চলো, বালকগণ, সর্ব প্রকার সম্মান অর্জন করো। * * * আমার বলতে দ্বিধা নেই, দেশবাসীর প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু হলাম আমরা।'

মনুকে লেখা আর একটি চিঠিতে ঠিক একই প্রকার উষ্ণতা—'তুমি এবং ছোট্ট ইন্দ্র কুশলে আছো তো! খোকারা, মনে রেখ' আমাদের জাতির সব কয়টি চক্ষু তোমাদের উপর ন্যস্ত।'

ঐ চিঠিতে মনোমোহনকে বলেছেন সে যেন তার বাবাকে তাঁর হয়ে শ্রদ্ধা জানায়। 'দেশে যদি ফিরতে পারি, তাহলে আমার পিতার স্মৃতির অমর্যাদা করব না আমি।' মনুকে সেক্সপীয়ার-চর্চায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। নিজের দুঃখ-কষ্টের তো শেষ নেই। তবু সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যের সংবাদ

সর্বপ্রথম তিনিই বিদ্যাসাগরকে জানালেন। আর মনু অনুত্তীর্ণ বলে তাঁর দুঃখই যেন সর্বাধিক।

"আমার ধারণা ছিল, উভয়ের মধ্যে মনু চালাক বেশি; এখন দেখছি তা নয়।"

সত্যেন্দ্র পাশ করলে তাকে ইতালীয় ভাষায় এক চিঠি দিলেন; কিন্তু সত্যেন্দ্র তার জবাব দিলেন ইংরেজীতে। "আমি অবাক হচ্ছি! আমি ত জানতাম, গতবৎসর ও একটু ইতালীয় শিখেছিল।"

মনু দ্বিতীয়বার অকৃতকার্য হলে তাঁর কী দুঃখ! তখন বেচারীর ব্যারিস্টারী পড়া ছাড়া উপায় নেই।

"মনোমোহনকে লিখেছি আমাদের কাছে এসে থাকতে। এখানে থেকে কিছু ফরাসী ও ইতালীয় শিখে নিক্।"

১৮৬৪ সনে ১৮ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে কলকাতার বিত্তবানদের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য আছে; সংকলক সে-সব অংশ 'সেন্সার' করে ছাপিয়েছেন। বিত্তবান হলে এদেশে মহৎ হওয়া যায়। তবে সত্যেন্দ্রনাথের খবর আছে। "তুমি এই চিঠি পাবার দুই-একদিনের মধ্যে সত্যেন্দ্রকে দেখতে পাবে। মনোমোহন ক'টা দিন আমাদের সঙ্গে কাটাচ্ছে, আগামী মাসে সে লণ্ডনে ফিরে লেখাপড়া শুরু করবে। আমি আশা করছি আগামী বৎসর ও সাফল্য লাভ করবে।" পরের চিঠিতে জানাচ্ছেন, 'সত্যেন্দ্র সাফল্য লাভ করায় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষাটাকে পূর্বের থেকে অধিকতর শ্রমসাপেক্ষ করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে। মনোমোহন আর একটি সুযোগ নিক। সে খুব ভালো ছেলে—এবং আমি তার সাফল্য কামনা করি—কামনা করি তার বুড়ো বাবার জন্য, এবং তার জন্যও বটে।'

গৌরদাসের চিঠিতে জানতে পারলেন যে, সত্যেন্দ্র দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর কথা বলেছে। কী খুসি!

'তাকে বোলো আমার কথা মনে রেখেছে বলে আমি তাকে বহু ধন্যবাদ দিচ্ছি। তাকে বোলো আমি আমার নির্বাসন হিতকর বলে মনে করছি।'

মনোমোহনের বাবা মারা গেছেন। তার জন্য কত বেদনাবোধ! সে যাতে তাড়াতাড়ি ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরতে পারে, তার জন্য উদ্বেগ বোধ করেছেন।

কলকাতার হাইকোর্টের স্যার এড্ওয়ার্ড রিয়ানের মধ্যস্থতায় তাঁকে সব কয়টি 'টার্ম' পূরণ করার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোল।

'মনোমোহন আইন খুব বেশি শেখে নি, তবে সে বুদ্ধিমান ছেলে ; পরে শিখে নেবে।

তার বাবার মৃত্যু হয়েছে ; সে বড় ছেলে ; তার শীঘ্র বাড়ি ফেরা উচিত।'

১৮৬৪ সনে ১৮ ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লেখা এক চিঠির মাঝখানে একটি অনুচ্ছেদ বাংলায় লিখে হাঁপিয়ে উঠেছেন—"আমি যদি তোমার মত বাংলা লিখতে পারতাম, আমি তাহলে বাংলাতেই চালিয়ে যেতাম, কিন্তু অনভ্যাসের দরুন সে কাজ থেকে বিরত থাকলাম।"

এই ব্যক্তিই কিন্তু মনুর মাকে তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে গোটা একখানা চিঠি বাংলায় লিখে ফেললেন !

তার ভাষা খুব নিন্দনীয় নয় !

"জ্যেঠামহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি সংবাদে যে কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। ভাবিয়াছিলাম যে, কৃতকার্য হইয়া দুই ভাই একত্রে দেশে ফিরিয়া যাইব এবং আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত নির্বাণস্নেহাগ্নি পুনর্বার পদসেবা করিয়া প্রজ্বলিত করিব। কিন্তু এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল।"

এ ভাষার আন্তরিকতা অগ্রাহ্য করবার মত নয়। তবু বিদ্যাসাগরের গদ্যের অধিকতর যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি মুক্তকণ্ঠ, তাতে যদি আত্মধিক্কার হয়, তবু বলবেন।

মনোমোহন শোকাভিভূত ; স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে এলেন নিজেদের কাছে। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন সতত।

১৮৬২ সন থেকে ১৮৬৬ সন পর্যন্ত মধুসূদনের সঙ্গে মনোমোহনের সম্বন্ধ নিত্য দিনের। মধুসূদনের জীবনের এমন কোন পরিচ্ছেদ থাকতে পারে না, যা মনোমোহনের অজানা।

হৃদ্যতা তো সেখানে, যেখানে হৃদয় উন্মুক্ত !

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সময় কলকাতা থেকে যান। তিনিও মধুসূদনের স্নেহলাভ করেন। মধু সম্বন্ধে তাঁর লণ্ডন-স্মৃতি অবজ্ঞামিশ্রিত নয় ; বরং কৃতজ্ঞতা-মিশ্রিত। মনোমোহন মধুর সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বলেছিলেন, "আমি দত্তজ মহাশয়ের সহিত তাঁহার জীবনের শেষ এগার বৎসর য়ুরোপে ও ভারতবর্ষে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ ছিলাম।'

এ কথার মধ্যে ইতিহাসের বিকৃতি নেই। মধুসদনের সাহচর্য তাঁর কাছে কখনও অপবিত্র বা অশালীন মনে হয় নি।

মধুসূদনের স্ত্রী হেনরিয়েটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তিনি এবং উমেশচন্দ্র (W. C. Banerjee) উদ্যোগী হয়ে সম্পন্ন করেন। মধুসূদনের মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানাদির দেখাশুনার ভার মনোমোহন গ্রহণ করেছিলেন, শুধু বাধ্য হয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন নি।

আর সত্যেন্দ্রনাথ (তাঁর আদরের ইন্দ্র) কলকাতার নীতিবাদী ঠাকুর পরিবারের সন্তান। মধুসূদনের স্নেহ তিনি চিরকাল ধ'রে পেয়েছেন। মধুসূদনকে তিনিও চিরকাল শ্রদ্ধা করেছেন; 'নীতিশূন্য' হলে কি করতেন তা বলা যায় না।

সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
অর্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে
ফিরিলা কানন বাসে ; তুমি হে তেমতি,
যাও সুখে ফিরে এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী।

কবিতাটি শেষ হয়েছে—যাও, কবি আশীর্বাদ করে।

অন্য পরিচয় বড নয়, কবি পরিচয়ই বড়। কলকাতায় ফিরেও সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয় নি। একবার ওঁদের পার্ক স্ট্রীটের বাসায় মধুসূদনকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লেখা 'সনেট্ রিটন্ অন সনেটস্' কবিতাটি আবৃত্তি করতে দেখেছিলেন রাজনারায়ণ বসু। এঁদের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক শেষ দিন পর্যন্ত মনোরম ছিল। যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন মনোমোহন, সত্যেন্দ্র ও উমেশচন্দ্র তিনজনই ছিলেন বালক। তখন তাঁদের ছিল তাজা মন। তাজা ফুলেই মধুর বাস।

॥ ৫ ॥

অর্থের অভাবে মান-সম্মান সব নষ্ট হচ্ছে। আহার জুটছে না, শিশু সন্তানগুলি অভুক্ত থাকছে। বইপত্তর জামাকাপড় পর্যন্ত বিক্রী করতে হচ্ছে। পাদ্রীরা সাহায্য করছেন। অযাচিতভাবে জনৈকা ফরাসী যুবতী কবিকে সাহায্য করে ফেললেন। তবু সে দুরবস্থার কথা সবাইকে বলা যায় না। ভারতবর্ষে তো তাঁর কত সুহৃদ আছেন—গৌরদাস, কিশোরীচাঁদ, শ্যাম, ভূদেব, বন্ধু, রাজেন্দ্রলাল, রাজনারায়ণ। এঁরা চাকুরীজীবী, এঁদের সঙ্গতির সীমা

আছে। কবি বুঝতে পেরেছিলেন এমন দুর্ভাগ্যের কথা শুধু একজনকে জানান যায়-তিনি অভাগাদের জন্য অনেক কেঁদেছেন, আরও কাঁদবেন।

কারে কব লো যে জ্বালা আমাব।
কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার॥

সে লোকটি মহা-পণ্ডিত বলে নয়। তিনি অসাধারণ, মনুষ্যোত্তম।

'তুমি যদি সাধারণ লোক হতে তবে তোমাকে চিঠি লিখতাম—কত কৈফিয়ৎ দিয়ে।'

'মধু-স্মৃতি'র লেখক অত্যন্ত সঙ্গত উক্তিই করেছেন—"বঙ্গদেশে তাঁহার পরিচিত অনেক ধনকুবের রাজা-মহারাজারও অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু মহাপ্রাণ মধুসূদন, মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই একমাত্র "শরণাগত দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণ" জানিয়াই সকলকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।"[২]

১৮৬৪ সনে ২রা জুন তিনি বিদ্যাসাগরকে তাঁর অবস্থা জানিয়ে প্রথম চিঠি লেখেন; তাবপব থেকে লণ্ডনে ও কলকাতায় তাঁব সঙ্গে বিদ্যাসাগবেব বহুবার পত্রালাপ চলেছে। সবই টাকা-পয়সাব হেতু; কিন্তু টাকা-পয়সার প্রসঙ্গে সব চিঠি ভরা নয়। বালজ্যাকেব চিঠিপত্র অর্থপ্রসঙ্গে পূর্ণ থাকত বলে ফ্লবেয়ার একবার বলেছিলেন, 'ও কি একজন শিল্পী? মধুব চিঠি তেমন নয়।' তাঁর জীবনের বহু স্বপ্ন সেখানে হাজিরা দিয়েছে, বহু স্বপ্ন সেখানে নিমজ্জিত হয়েছে নৈবাশ্যে ও ব্যর্থতায়। মোট ৩৯ খানি পত্র তাঁর লেখা; এই পত্রগুলি বাঙ্গালী জাতির পরিচয়জ্ঞাপক এক বিশেষ দলিল। এত শক্তি এত ইচ্ছা শুধু ভিন্ন পরিবেশে বিপর্যয়ের শিকার হোল। মুদ্রা-শাসিত সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ-সীমা পূর্ব-নির্দিষ্ট।

নিজের দুর্দশার কথা বলেছেন, কলকাতার 'শুভানুধ্যায়ী'দের আচরণেব কথা বলেছেন; বিদেশ বিভুঁই-এ যেটুকু সাহায্য ও সমবেদনা পেয়েছেন, তার খবরও জানিয়েছেন; জানিয়েছেন সেই দয়ার্দ্র বিদেশিনী ভদ্রমহিলার কথা, যিনি যুবতী, সুন্দরী ও দয়াবতী। প্রথম দুটি বিশেষণ প'ড়ে বিদ্যাসাগর হয়তো মুচকি হেসেছিলেন। তবে বিদেশিনীর পরিচয়ের তরী শেষ পর্যন্ত এসে ভিড়েছে দয়াবতীতে। অতএব আশ্বস্ত হওয়া যায়। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' তো বিনা কারণে বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করা হয় নি! তবু কলকাতায় কুৎসা প্রচার অবাধে চলে।

ও সব কথায় তুমি কান দিও না!

'তুমি কাজে নেমে পড়ো, সেই চমৎকার উৎসাহ নিয়ে, যা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, যা তোমার বীর্যবত্তার পক্ষে সঙ্গত।'

কুৎসা-রটনাকারীদের রসনা প্রশস্তি-প্রচারকদের রসনা থেকে হাজার গুণ তৎপর। তাই মধুসূদন স্পষ্ট করে লিখলেন, 'দেখ, তোমার মত লোক সব রকম নোংরা কাজের উর্ধ্বে।'

নোংরা কাজ (dirty action)! কথাটা বেশ মজার শোনায়। মাদ্রাজে যখন তিনি ছিলেন, তখন গোঁড়া ও খয়ের খাঁ-দের সঙ্গে তাঁর মসী-যুদ্ধ হোত। একবার এক কাদা-খোঁচা সাংবাদিক তাঁর কৌলিক উপাধি 'Dutt' নিয়ে রসিকতা করে লেখেন—'Mr. Dirt.' তার জবাব অবশ্য মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকেরা দিয়েছিলেন। মধুকে দিতে হয় নি। মাদ্রাজ স্বভূমি নয়। মধুসূদনের অবস্থা সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি লিখলেন—

"সঙ্গে আমার শিশুসন্তানগুলি না থাকত, স্ত্রী না থাকতেন, তাহলে আমি আত্মহত্যা করে বসতাম।

* * *

যদি তুমিও আমাকে হতাশ করো, তাহলে আমি যা-হোক ক'রে দেশে ফিরে যাবো, দুই-একটি লোককে হত্যা করব, এবং করব সজ্ঞানে, তারপর ফাঁসি কাঠে ঝুলব।"

যাঁরা কবির সঙ্গে ঐ প্রকার প্রতারণা করেছেন, তাঁরা বহু-বিবাহবিরোধী আবেদন পত্রে সহি দিয়ে মানবহিতৈষিতা দেখিয়েছেন। ভারতীয় সমাজ-জীবনে বিত্তবানদের এই দুমুখো জীবনযাত্রার সব ইতিহাস আজও প্রকাশিত হয় নি। বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুর দিগম্বর ও মহাদেব-সমালোচনা পছন্দ করলেন না। দয়া আর ক্ষমা পাত্র-অপাত্র বিচার করছে না।

তবে মধুসূদনের ক্রোধই কি বেশিক্ষণ থাকল? কলকাতায় ফিরে এসে দিগম্বরের কাছে যেতে ইতস্তত করেন নি। গৌরদাস লিখছেন, "যে রূঢ় ব্যবহার দিগম্বর মিত্র (রাজা) মধুর প্রতি করেছিলেন, অন্য কারও প্রতি এ-রকম ঘটলে বন্ধুত্বে ছেদ পড়ত, আজীবন মুখ দেখাদেখি বন্ধ হোত। কিন্তু মধু ক্ষমা করল এবং ভুলে গেল; যেন কিছুই ঘটে নি এমন ভাব তার।"

মহাদেবও ক্ষমা পেল! জ্ঞানেন্দ্রমোহনও পেয়েছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন যখন পিতৃসম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করেন, তখন তাঁর অন্যতম

কৌঁশুলি ছিলেন মধুসূদন। ১৮৬৮ সনে ৩১-এ আগস্ট এই মামলা দায়ের হয়—বাদী জ্ঞানেন্দ্রমোহন বিবাদী লাডলীমোহন,. উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পক্ষে এ্যাটর্নি ছিলেন ধর এবং মিত্র (Dhur and Mitter)।[৩]

সবাই ক্ষমা পেয়েছে। শুধু তিনি পান নি—মৃত্যুর একশত বৎসর পরেও তাঁর স্বদেশবাসী এবং কাব্যপ্রেমিকরা তাঁর বৈষয়িক ঋণ আর মদ্য-আসক্তির লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে গবেষকের পবিত্র ধর্ম পালন করেন।

যাঁর মাথা গুজবার মত বাসস্থান নেই, পরিধানের মত ঐ দারুণ শীতে প্রয়োজনীয় বস্ত্র নেই, যাঁর একটি শিশু-সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার ছয় দিন পরে মারা গেছে, তবু তাঁরই তো মনে আছে মহাকবি দান্তের ত্রিশত জন্মবার্ষিকী কবে। একটি সনেট লিখলেন এবং লিখলেন একটি চিঠি। বাঙ্গালী কবি ব'লে আত্মপরিচয় দিয়ে ইতালীর রাজার কাছে সেই চিঠি পাঠালেন। এই প্রথম বাংলাদেশের এক কবি অন্য দেশের কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন মধুসূদনের পথ ধ'রে।

মধুসূদনের শ্রদ্ধা নিছক পৌত্তলিক নয়। তিনি শ্রদ্ধা আর শ্রম এক ক'রে নিয়েছেন। "আমি ফরাসী ভাষা প্রায় আয়ত্ত করে ফেলেছি। এ-ভাষায় এখন আমি ভালই কথা বলতে পারি, লিখতেও পারি। আমি ইতালীয় ভাষা শিখতে শুরু করেছি; পরে জার্মানি ভাষা শেখার ইচ্ছা আছে। যদি সম্ভব হয়, ইউরোপ ছাড়বার আগে স্পানিশ ও পর্তুগীজ ভাষা দুইটি শিখে নেব।"

১১ই জুলাই এক মনোরম চিঠি লিখছেন—তাতে কষ্টের কালিমার বিন্দু-মাত্র রেখাপাত নেই। গৌরদাসকে লিখছেন—"আমি ইউরোপ ছাড়বার পূর্বে ইউরোপীয় ভাষায় একজন সুপণ্ডিত হয়ে উঠব বলে মনে হচ্ছে। ফরাসী ও ইতালীয় অধ্যয়ন ভালই চলছে, শীঘ্রই জার্মান শুরু করব। ল্যাটিন, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষার পর স্পানিস ও পর্তুগীজ শেখা খুব কঠিন ঠেকবে না। ল্যাটিনে যে কি সুন্দর সুন্দর কাব্য আছে, তা তুমি ভাবতে পারবে না। ট্যাসো সত্যি পাশ্চাত্যের কালিদাস।

* * * *

বন্ধু হে, তুমি ভেবো না—এখানে আমি কুড়েমি ক'রে কালহরণ করছি। আমি ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় প্রায় ওস্তাদ হয়ে উঠেছি, জার্মান শিক্ষাও

বেশ এগুচ্ছে। এ-ব্যাপারে আমি পেশাদার কোন শিক্ষকের সাহায্য নিই নি।

*　　*　　*　　*

তুমি ভেবো না আমি গড়িমসি ক'রে দিন কাটাচ্ছি। আমার এই দুর্ভাগ্য-জনক নির্বাসনের সুবিধা আমি পুরো চুইয়ে নিচ্ছি। কোন রকম অহমিকা প্রকাশ না করেই বলতে পারি, এখন জীবিত বাঙ্গালীদের মধ্যে আমি সব চেয়ে বেশি সংখ্যক ভাষা জানি, কিন্তু বাপধন, লেখাপড়ার কানা কড়ি দাম নেই।

*　　*　　*　　*

আমি যেন এক নোঙর-ফেলা জাহাজ—ফ্রান্সের বেলাভূমিতে উপায়শূন্য হয়ে প'ড়ে আছি। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার মনের সেই শক্তি ছিল, সেই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যার বলে আমি আমার দুর্ভাগ্যকেও সর্বোত্তম উপায়ে সদ্ব্যবহার করছি। বিশ্বের তিনটি সেরা ভাষা আমি শিখে ফেলেছি—ফরাসী, ইতালীয় ও জার্মান। প্রত্যেকটি ভাষা আপন আপন সাহিত্য রত্নরাজির জন্য অবশ্য শিক্ষণীয়।

গৌর, ইউরোপের যে-কোন একটি বড় ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অর্থ এক বিপুল ও সুকর্ষিত ভূমির অধিকারী হওয়া। অবশ্য এ-ভূমি হোল বৈদগ্ধ্যের ভূমি। এ-জীবনে যদি স্বদেশে ফিরতে পারি তাহলে আমার মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে আমার স্বদেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে ঐ সব ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।"

আর অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। এই সব বক্তব্যের পাশে-পাশে হাটলে মন দেশপ্রেমে এবং কর্তব্যনিষ্ঠায় ভরে ওঠে।

প্রবল বিক্ষোভের মধ্যেও তিনি এইসব চিরায়ত জিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত থেকেছেন। এমনই এক মহাসত্ত্ব ব্যক্তি ছিলেন তিনি। বাইরের এত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও নিরুদ্বেগে স্বজাতি ও স্বভাষার কল্যাণ কামনায় নিজেকে প্রস্তুত করে চলেছেন তিনি। আত্মসুখ ও আত্মশ্লাঘা অনুভবের জন্য তাঁর বিদ্যানুশীলন নয়।

এই চিঠিগুলি পড়লে মনে হয় ব্যারিস্টারী পড়াটাই যেন তাঁর অছিলা। তিনি যেন এর নিমিত্ত বিলেতে আসেন নি। মাদ্রাজে ব'সে যেমন তাঁর নিয়ত বিদ্যাচর্চা চলেছিল, এখানেও তাই। সে-বার পরিশ্রমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে

বলেছিলেন, 'আমি কি আমার পূর্বপুরুষের ভাষার সমৃদ্ধির মহৎ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হচ্ছি না ?'

আর আজ লিখছেন—"আমার মাতৃভাষার মাধ্যমে এইসব ভাষার রত্নরাজির সঙ্গে আমার শিক্ষিত বন্ধুদের পরিচয় সাধন করিয়ে দেবার আশা রাখি।"

॥ ৬ ॥

শুধু ভাষা নয়, আরও কিছু আয়ত্ত করলেন। কোন কোনটির চর্চা স্বদেশবাসকালেই শুরু হয়েছিল।

কৈশোরে বহু সনেট ইংরেজিতে লিখেছিলেন ; বিদেশ যাত্রার পূর্বে মাতৃভাষায় মাত্র একটি সনেট লিখেছিলেন।

বিদেশের মাটিতে প্রায় ৫০টি সনেট লিখলেন।

সনেট চৌদ্দ চরণের কবিতা নয়। সনেট এক বিশিষ্ট কাব্যরীতি। ইতালীয় ও শেক্সপীয়রীয় রীতির কোনটিই তিনি অনুসরণ করেন নি। তাঁর আদর্শ ছিলেন মিলটন আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ। বিষয়টি অনেকের চোখ এড়িয়ে গেছে। এর জন্য অনেকে তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন। অথচ তাঁরা ভুলে যান যে, শেক্সপীয়র যখন সনেট লিখলেন, তখন তিনি পেত্রার্কার আঙুল ধ'রে হাটেন নি ?

মধু সনেট তৈরি করতে গিয়ে পয়াব ছন্দকেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করলেন ; ১৪ মাত্রার সাবেকী পয়ার, উপরন্তু তারও ৮+৬ পর্ববিভাগ। শেক্সপীয়র, মিল্‌টন, 'ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সনেটও এক বিশেষ ছন্দে বাঁধা—আয়াম্বিক পেন্টামিটার। মধুসূদন বুঝেছিলেন সনেটের হাল্‌কা চাঁছা-ছোলা অথচ নিটোল শরীর কেবল এমন একটা বহু-ব্যবহৃত ছন্দ-বলয়ের মধ্যেই স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারে, অন্যত্র নয়। পয়ার বাংলার অগণিত পথিকের পায়ে-হাঁটা পথ। এ-পথে চলতে যেমন হুঁচোট খেতে হয় না, তেমনি সঙ্গীসাথীরও অভাব নেই। মধু সেই যে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গিয়ে পয়ারের 'অর্ধযতি ও পূর্ণযতি' স্থাপনের প্রচলিত বিধান লঙ্ঘন ক'রে ভাব-প্রকাশের প্রয়োজন মত যদৃচ্ছাক্রমে অর্ধযতি ও পূর্ণযতি স্থাপনেব স্বাধীনতা অবলম্বন করেছিলেন, এবং মিলের বাধ্যবাধকতাটি তুলে দিয়েছিলেন, সেই রীতি এখানে অংশত রক্ষা করলেন। শুধু মিলটা উঠিয়ে দিলেন না।

তবে মিলটা দ্বিপাদিক মিল হোল না ; তার বুনন চলল নানান ছাঁদে।

একবার যখন আধার তৈরি হয়ে গেল, তখন আর মধুর বিষয়ের জন্য ভাবনা নেই। এতকাল মধু আত্ম-ভাবনাকে আর দশজনের ভাবনার ছায়া-তলে রাখতেন। সর্বদা তারা পুরাণের বর্ম এঁটে চলত। এবার একেবারে সোজাসুজি নিজের কথা বলতে লাগলেন। পুরাণ বা ইতিহাসের সহায়তা পরিত্যক্ত হোল। বাংলাদেশ আর বাঙ্গালী-সমাজ নানাভাবে দেখা দিল ; তার আকাশ-বাতাস, মাঠ-ঘাট, তার পূজা-পার্বণ, তার পুরাণ, তার মনীষী-বৃন্দ—সবই সমাদরের সঙ্গে গীতিসুধাসিক্ত হোল।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থভুক্ত সনেট ছাড়া মধুসূদন পরে আরও কয়েকটি সনেট লিখেছেন। সেগুলিও বাংলাদেশের ভূ-সীমান্ত ত্যাগ করে নি—পুরুলিয়া, পঞ্চকোট এবং ঢাকা।

আকারে ক্ষুদ্র বলেই কি সনেট আত্মকথার দাবীদার হয়? পর-ভাবনাতেই কি বাগ্‌বিস্তার কেবল? সেই ঋক্‌বেদ থেকে আত্মউচ্ছ্বাস সংকীর্ণ অবয়বে প্রকট। আর পর-ভাবনার জন্য দরকার উদার মানচিত্র। মহাকাব্য পর-ভাবনা-ভিত্তিক। নিজের ভাবনা নিয়ে কেউ মহাকাব্য লেখার সাহস করেন নি। ব্যতিক্রম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। তাঁর 'দ্য প্রেলিউড'-কে কেউ-কেউ মহাকাব্যের মর্যাদা দিয়েছেন।

সনেট যেমন সীমিত, তেমনি তির্যক। মধুসূদনের সনেট শুধু কবির মনের দর্পণ নয়, বাঙ্গালী জীবনেরও দর্পণ।

এমন করে তুচ্ছ গ্রাম্য-নদীকে কে আর ভজনা করবে? পুরাণ-বহির্ভূত শহরকে আর কি কেউ প্রিয়নামে ডাকবে? কে আর বাংলার প্রান্তরের চিরচেনা পাখির রূপগুণের এমন পরিচয় দেবে?

সনেট জন্মকালে ছিল একান্তই প্রেমের কবিতা ; শেক্সপীয়রও ঐ পরিচয়ে বিঘ্ন ঘটান নি। মধুসূদনের সনেট তা নয়। এর নজির মধুসূদন পেয়েছিলেন মিল্‌টনে আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে। সনেটের ঝোঁকের এই বিভিন্নতা মোহিতলাল ভেবে দেখেন নি ব'লে মধুসূদনের সনেটের বিশেষ ধর্ম ব্যাখ্যা করতে অসুবিধা ভোগ করেছেন।[৪] মধুর সনেট স্বগত-উক্তি হয়েও আত্মগত উক্তি নয়। বিষয় যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে সর্বজনীন, তাই সনেটের এই স্ব-ভাব বিরোধিতা।

প্রকৃতি আর মানুষের কীর্তি—দুই-ই তাঁর কাছে সমান আদর পেয়েছে। বুড়ো বটগাছ আর আর দ্বাদশ শিবের মন্দির একই সারিতে বসেছে।

দৃশ্য যেমন বর্তমান বাঙ্গলার, পুরাণও তেমন বাঙ্গলার একান্ত। কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, ঈশ্বরী পাটনী, শ্রীমন্তের টোপর—সব বাঙ্গালীর নিজস্ব পুরাণের অন্তর্ভুক্ত। কবিদের মধ্যে বাঙ্গালী কবিই অধিক সংখ্যায় হাজির হয়েছেন—জয়দেব, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বাঙ্গালী মনীষীদের মধ্যে আছেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সব কবিতা পড়লে বুঝা যাবে যে, এদের একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা আছে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' দেখেছিলাম, দেবভূমি স্বর্গে চালিতাগাছ, ফিঙা পাখি গিয়ে হাজির। পাঠকের বুঝতে কষ্ট হয় না, এ স্বর্গ কোথায় অবস্থিত!

তাই বলে মধুসূদন অ-ভারতীয় নন, এবং আন্তর্জাতিকতাবিরোধী নন। আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষায় তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী নন। তাই শ্রীপঞ্চমী, দেবদোল, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, বিজয়াদশমীর পাশাপাশি চলেছে সর্ব-ভারতীয় বিষয়। বাল্মীকি, রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, মেঘদূত, কিরাতার্জ্জুনীয়ম্, সুভদ্রা, সীতা, শিশুপাল, উর্বশী, হিড়িম্বা, দুঃশাসন, পুরূরবা নিমন্ত্রিত হয়েছে।

বৃহত্তর ভারতের পাশে বিশ্বেরও স্থান আছে। ভিক্টর হুগো, দান্তে, টেনিসন, গোল্ডস্টুকার দাঁড়িয়ে আছেন। বোধে ও প্রজ্ঞায় আঁকা মধুসূদনের মানচিত্র একখানাই।

দান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ইতালীয় সম্রাটকে চিঠি লিখতে নাম স্বাক্ষর করেছেন 'দত্ত' বলে।

যে-সৈনিকের স্বদেশ আছে, সে-ই হয় বিশ্ব-বিজয়ী।

মধুসূদন একটি ভাষা-সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করলেন। সারা ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যে এই হোল বিশ্বজনীনতার প্রথম অঙ্গীকার।

বাঙ্গালীয়ানার কথা অনেকে বলেছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, এ বাঙ্গালীয়ানা ঈশ্বর গুপ্তীয় বাঙ্গালীয়ানা নয়। স্বদেশের কুকুর তাঁর কাছে শ্রদ্ধা পায় নি। যা পূজা পাবার যোগ্য, তাই পূজিত হয়েছে। এ হোল ব্যাধিশূন্য বাঙ্গালীয়ানা; সুস্থ স্বদেশ-অনুভূতি।

নিছক কবিতা হিসাবেও এগুলির মূল্য সামান্য নয়। শব্দ ও অর্থের এমন মিলন, স্বভাব ও আকারের এমন সুস্নিগ্ধ আত্মীয়তা কদাচিৎ মেলে।

'সায়ংকাল' কবিতাটি উল্লেখ করছি। বর্ণনা যে এমন সচল হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার পূর্বে বাঙ্গালী-পাঠক (দর্শকও বটে) তা জানতেন না। কবিতাটি যেন এক 'রীলে'র একটি 'ফিচার ফিল্ম'।

চেয়ে দেখ, চলিছেন মুদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবার সুনীল আঁচলে।

দৃশ্যটি কি এখানে শেষ? না। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি কী অনুপম মায়াজাল সৃষ্টি করল, কবি তা মণিকারের মত (শুধু চিত্রকরের মত নয়) কুঁদেকুঁদে তুললেন। ছোট্ট কর্ণাভরণে যেমন কাজ তোলে স্যাকড়া, তেমনি সূক্ষ্ম।

কে না জানে অলংকারে অঙ্গনা বিলাসী?
অতি ত্বরা গতি ধনী দৈব মায়া-বলে
বহুবিধ অলংকার পরিবে লো হাসি,
কনক-অঙ্কন হাতে, স্বর্ণমালা গলে।
সাজাইবে গজরাজী; পর্বতের শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে; বহাবে অন্তরে
নদস্রোতঃ; উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে।
সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে। এ বাজী কবিরে
শুভক্ষণে দিনকর কর দান করে!

শব্দের স্থির অবয়বে এই অ-স্থির চিত্র। শুধু রূপ নয়, রূপের সঙ্গে সমানে যুঝেছে কথা বা ভাব।

'কবি' সনেটটিতে তিনি স্পষ্ট জানালেন সেই ব্যক্তি কবি নন,

ঘটকালি করি
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন।

মধুসূদনের মতে তবে প্রকৃত কবি কে?

কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।

কবি মধুসূদনের কাব্য-জিজ্ঞাসায়, কাব্য-সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষবাদ বা রীতি-সর্বস্বতা প্রধান নয়।

তাই মধুসূদনের সনেট বাচ্যার্থের ভিড়ে ডোমকানা হয় নি।

নতুন 'রূপক' কবিতা মাইকেল-সৃষ্ট ; উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে সব কবিতা রূপক নামে অভিহিত হোত। তখন সম্ভবত ঐ বিশেষ অর্থবহ অলংকারটির এমনই দাপট ছিল যার ফলে পাঠক কবিতা আর রূপকের মধ্যকার পার্থক্য টের পেতেন না। তখনকার রূপকে কোন গল্প থাকত না। 'এ্যালিগরী'র অর্থে রূপক সৃষ্টি করেছেন মধুসূদন। তাঁর আদর্শ হচ্ছেন ফরাসী কবি লা ফঁতেন। কৃষ্ণমিশ্র নন। মধুর চরিত্রে সারল্য বেশি, বক্রতা নেই। উচ্চ হাসি আছে, চাপা হাসি নেই। ইংরেজিতে যাকে বলে hilarity, তাই হোল মধুর স্বভাবসঙ্গত। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বক্রতার বাহাদুরি নেই। ফরাসী প্রাশর্য মধুসুদনের কাছে প্রলোভনের কারণ ; কিন্তু অনুকরণসাপেক্ষ নয়।

তাঁর অধীত সাহিত্যের মধ্যে জার্মান সাহিত্যের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে বেশি। জার্মান সাহিত্য থেকে 'হেক্টর বধে' পড়েছে রীতির ছাপ, আর 'মায়াকাননে' পড়েছে ভাবের ছাপ। তাই নীতিমূলক কবিতায় তিনি নীতিবাদী হলেন, কিন্তু সমকালীন জীবনের অম্ল-মধুর সমালোচনা করতে পারলেন না।

এ-যুগে অসমাপ্ত 'দ্রৌপদী স্বয়ম্বর' ও 'সুভদ্রা হরণ' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা। 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' প্রথমে লিখলেন মিলহীন প্রবহমান পয়ারে অর্থাৎ অমিত্রাক্ষরে ; পুনর্লিখনের সময় সমিল প্রবহমান পয়ারে তাকে পরিবর্তিত করলেন। সনেটে যা চৌদ্দপঙ্‌ক্তির মধ্যে ছিল নিবদ্ধ, এখন তা দীর্ঘতর শরীরে দৃশ্যমান হোল। বাংলা ছন্দের ইতিহাসে সমিল প্রবহমান পয়ার রবীন্দ্র-সৃষ্ট বলে একটা সংস্কার আছে। এটা সংশোধিত হওয়া উচিত।[৫]

রবীন্দ্রনাথের হাতে যে এই ছন্দের ঐশ্বর্য শতগুণ বেড়েছে, একথা অস্বীকার করবে কে ? তবু তিনি তার আদি শূর নন।

এত এত কাজ করলেন বিদেশে ব'সে। আর কলকাতাবাসীরা স্বগৃহে ব'সে তাঁর নামে নিত্য নতুন কিস্‌সা বানিয়ে চলল। কলকাতার 'রেনেসাঁসে'র ধুরন্দরেরা কেউ বিনা সুদে পাঁচটি পয়সা দিয়ে তাঁর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করেন নি। মধুসূদন ইচ্ছা করলে বিলেতে বসে জ্ঞান-চর্চা না ক'রে বিত্ত-চর্চা

করতে পারতেন—সে-যুগেও তার পথ রুদ্ধ ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যাধি ভিন্ন —এ যে "অকথন ব্যাধি কহন ন যায়।" বন্ধু গৌরদাস তাঁর অপমানের ইতিহাস শুনতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। কিছু তিনি বললেন না; শুধু বলেন, ও নোংরা বিষয় ঘাটতে ভাল লাগে না। 'বিদ'কে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও। বেদনার ঝাঁপির মুখ এঁটে নিজের কাছে রাখলেন একান্তে; আনন্দ যেটুকু, তার অধিকার দেশবাসীর।

দুঃখের আঁধারে মজি গাইস বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে।
কে জানে যাতনা কত তোর ভবতলে?
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে।

মধুসূদন বাংলা কাব্যকাননের শ্যামাপক্ষী। সব কবিই তাই। তবে এক্ষেত্রে মধুসূদনের একটি বিশেষ দাবি আছে। কারণ মধুসূদন ছিলেন কৃষ্ণকায়।

পাদ

১. গ্রে'জ ইনের চিঠির নকল।

PB/EJ

Gray's Inn Library,
South Square,
Gray's Inn,
London, WCIR 5EU

Dear Sir,

In reply to your letter of the 21st. requesting information about MICHAIL MADHUSUDAN DUTTA. I regret to inform you that I can find no trace of him in our records.

If he obtained the degree of Barrister-at-law then he must have been a member of either Lincoln's Inn, Inner Temple or Middle Temple.

I am sorry I cannot be more helpful.

Yours faithfully
Sd./ P. C. Bedinghum,
Librarian.

আমরা অবশ্য আমাদের এক ব্যারিস্টার ছাত্রের সহায়তায় প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করেছি। তার সঙ্গে অধ্যাপক ডাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত সংগৃহীত তথ্য মিলিযে নিয়েছি।

২. মধু স্মৃতি—পৃঃ ৩৬৪।

৩. Calcutta High Court Record Room, Appellate Section, Document No. 6313.

৪. বাংলা কবিতাব ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদাব। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয। ২য সংস্করণ ১৩৫৫। পৃঃ ১৮৫।

৫. পূর্বাশা—আষাঢ়, ১৩৭১। পয়ার পরিচয় —প্রবোধচন্দ্র সেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় — চাক ভাঙ্গার কাল

॥ ১ ॥

'গ্রে'জ-ইনে'র হাজিরা খাতা থেকে মধুসূদনের নাম কোনদিন কর্তিত হয় নি। নিয়ম ছিল ব্যারিস্টার হতে গেলে শিক্ষার্থীকে বারোটি 'টার্ম' কলেজ করতে হবে এবং বাহাত্তরটি ভোজ খেতে হবে। মধুসূদন বারোটি টার্মের স্থলে দশটি টার্মে উপস্থিত ছিলেন। ভোজ খেয়েছিলেন মোট ষাটটি। তাতেই তাঁকে ব্যাবিস্টার বলে সনদ দেওয়া হয়। তখন বিলেতে ছিলেন কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচাপতি স্যার এর্ডওয়ার্ড রিয়ান; তাঁর আনুকূল্যে ভারতীয় ছাত্ররা এই ধরনের সুযোগ পেত। মনু অর্থাৎ মনোমোহন ঘোষের সনদপ্রাপ্তি হোল তার অন্যতম উদাহবণ। মধুসূদনকে পরীক্ষায় বসতে হয় নি; ব্যারিস্টারীতে তখন পরীক্ষা দেওয়া শিক্ষার্থীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না।[১]

এইভাবে তিনি ব্যারিস্টার হলেন। দুঃখকর দীর্ঘ প্রবাসজীবনের পরিসমাপ্তি হতে চলেছে। ব্যয়ের বহর এখানেও আহরণের আধারকে উপহাস করতে পারে নি। এখন কলকাতার জন্য মন কেমন করছে।

"সাধিতে মনের সাধ" বহু 'পরমাদ' ঘটে গেছে; কিন্তু জীবন তাতে বিপর্যস্ত হয় নি, বিপর্যস্ত হয়েছে ভবিষ্যৎ। যে-ভবিষ্যতের জন্য মধুসূদন এত সাধনা করেছেন, সে ভবিষ্যৎ মধুসূদনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিষয়-জীবনের স্থূল ভবিষ্যত। রক্ষা এই যে, প্রবাসে দৈবের বশে (অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের দয়ায়) জীবনতারা দেহ-আকাশ হতে খসে পড়ে নি, রাজকারাবাস করতে হয় নি।

'শ্যামা জন্মদে' তাঁর স্নেহ-কাঙাল পুত্রকে ডাকছেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের রেখে মধুসূদন একা স্বদেশযাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মধুসূদনের স্বভাবের মধ্যে ছিল অনিশ্চয়তার প্রতি আসক্তি; অজানিতের দহে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার প্রবণতা। শুভানুধ্যায়ী বিদ্যাসাগরের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি একাকী এসে উঠলেন কলকাতায় স্পেনসেস হোটেলে। অথচ এদিকে

তাঁর প্রিয় 'বিদ' আলাদা বাসা ঠিক করে আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছেন। এবং সে বাসা নির্বাচিত হয়েছিল সম্পূর্ণ হিন্দু পাড়ায়। কিন্তু এমন প্রস্তাবে সম্মত হচ্ছেন কে? তাঁর মনে একটা নতুন (উৎকটও বটে) বোধ জন্মেছে—তিনি ব্যারিস্টার, অতএব তাঁকে 'তাঁর মর্যাদা অনুসারে' চলতে হবে। পিতার পেশার সুবাদে বালক বয়স থেকে ইংরেজ ব্যারিস্টার-মহারথীদের দু'চারজনকে দেখেছেন—পুলিশ কোর্টে নিজের চাকরীর কালেও আরো কয়েকজনকে দেখেছেন। তাঁদের জীবন-যাপনের ছাঁদ আলাদা। তদুপরি ফ্রান্সের আকর্ষণীয় জীবন মধুসূদনকে বাঁচবার নতুন শ্রী বুঝিয়ে দিয়েছে।

"বর্ধমানের রাজা কদাচ যা পান না, আমি মাত্র কয়েকটি ফ্রাঙ্ক খরচ করলে তার থেকে ভাল সান্ধ্য ভোজ পেতে পারি। বর্ধমানের মহারাজাকে যা উপভোগ করতে তাঁর প্রভূত সম্পদের প্রায় অর্ধাংশ ব্যয় করতে হবে, সেই আনন্দ আমি সামান্য কয়েকটি ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে উপভোগ করতে পারি। এত সঙ্গীত, এত নৃত্য, এত সৌন্দর্য !" "This is the অমরাবতী of our ancestral creed". বিদেশ থেকে ফেরার সময় কাঁধে ঝুলছে ঋণের বোঝা। সম্ভবত ভারতের মাটিতে পা দিয়ে ঐ সব তুচ্ছ বিষয়ে তাঁর বিস্মরণ ঘটেছে।

আমাকে আমার মর্যাদা অনুসারে থাকতে হবে—এই হোল তাঁর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তটি যেমন মর্যাদাপূর্ণ, তার প্রভাবে দেনার অঙ্কও ক্রমশ মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

॥ ২ ॥

যতটা উৎসাহ নিয়ে তিনি কলকাতায় এলেন, ঠিক ততটা ধাক্কা তিনি খেলেন হাইকোর্ট প্রবেশে। ১৮৬৭ সনে ২০-এ ফেব্রুয়ারি তিনি হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করার অধিকার চেয়ে দরখাস্ত করলেন। হাইকোর্টে জজ মহলে তাঁর সম্বন্ধে দু'চারটি ঝাঁঝালো খবর রটেছিল। কলকাতায় তাঁর প্রবাস জীবন সম্বন্ধে যে-কুৎসা রটেছিল, তার পিছনে সম্ভবত ক্ষেত্রমোহন দত্ত নামক জনৈক প্রবাসী ছাত্রের হাত ছিল (Khetter Mohan Dutt)। এই দত্ত উপাধিধারী ছাত্রটি বিবাহিত হয়েও বিলেতে অ-বিবাহিত বলে পরিচয় দিয়ে এক বিদেশিনী বালিকার পাণিপীড়নের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। মধু সম্বন্ধীয় যাবতীয় কুৎসার ভিত্তি ইনি।

"I have too great a regard for myself to gratify his malignity," ছোট মাপের মানুষেরা কোন যুগেই এই উক্তির মূল্য বুঝতে পারে না।

হাইকোর্টে সত্য-মিথ্যা খবর রটিয়েছিলেন পিটারসন নামক এক উকিল। মিথ্যা উপন্যাসের পাঠক সর্বদাই অগণ্য। হাইকোর্টে বাধা দিয়েছিলেন দু'জন বিচারপতি—এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সিভিল সার্ভিসের লোক। ইনি হলেন মিঃ লুইস স্টুয়ার্ট জ্যাকসন। তিনি ১৮৬২ সনের ১লা জুলাই থেকে ১৮৮০ সনের ২৩-এ জুন পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। দ্বিতীয় যে-বিচারপতি বাধা দিয়েছিলেন তিনি সিভিল সার্ভিসের লোক নন। তিনি ব্যারিস্টার। বিচারপতি মিঃ জন আর্থার ম্যাকফার্সান ১৮৬৩ সনে ২৫-এ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৭৭ সনের ১লা অক্টোবর পর্যন্ত হাইকোর্টে কর্মরত ছিলেন।[২] দেশীয়দের মধ্যে একজনই ছিলেন জজ; তিনি শম্ভুনাথ পণ্ডিত। তিনিই ত বলেছিলেন, "এ-বিষয়ে না জিতলে আর মান থাকে না।"

তখন হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার বার্নেস পিকক। ১৮৬২ সনে ১লা জুলাই থেকে ১৮৭০ সনের ২৬-এ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৩] প্রথমে প্রধান বিচারপতি মধুসূদনের দরখাস্ত মঞ্জুর করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিচারপতি ম্যাকফার্সান প্রবল আপত্তি তুলে বললেন যে, মিঃ দত্তের পূর্বতন কার্যকলাপ এবং পুলিশ কোর্টে দোভাষী হিসাবে তাঁর কাজকর্মের রিপোর্ট থেকে তাঁকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে মনে হয় না। তাঁকে যোগ্য লোক বলে সাব্যস্ত করা যায় না।

ম্যাকফার্সান প্রশ্ন তুললেন তাঁর প্রবাস-জীবনের কোন দলিল দাখিল করা হয় নি কেন; এবং আরও প্রশ্ন তুললেন বিলেত যাবার পূর্বে যে সব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে বা অধীনে তিনি চাকরী করেছেন তাঁদের কাছ থেকে গৃহীত কোন সার্টিফিকেটই বা দাখিল করা হয় নি কেন।

পিটারসন নামক এক কৌশুলি হাইকোর্ট পাড়ায় তাঁর সম্বন্ধে নানা সন্দেহজনক গল্প রটিয়েছিলেন। নীলদর্পণ মামলায় ইংলিশম্যানের সম্পাদকের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন ইনি।

তাছাড়া দেশীয় ব্যারিস্টারদের হাইকোর্ট-প্রবেশে ঝানু ইংরেজ সিভিলিয়ানরা প্রমাদ গনছিলেন, খুসি মনে নিতে পারছিলেন না।

এই প্রবল বিরোধিতার কারণে তিনি যে সৎচরিত্র ব্যক্তি এটা প্রমাণ

করার জন্য মধুসূদনকে ছুটাছুটি করতে হোল। তাঁকে সেই দিগম্বর মিত্রের কাছে ছুটতে হোল, যিনি তাঁর বিলেত প্রবাসকালে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে 'অনাহারে মারার' বন্দোবস্ত করেছিলেন, তাঁকে ছুটতে হয়েছিল সেই যতীন্দ্রমোহনের কাছে, যিনি বিলেত-প্রবাস কালের বন্ধুর অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের কথা জেনেও একটি আঙ্গুল তুলে সাহায্য করেন নি। এমন অনেক লোকের সার্টিফিকেট দাখিল ক'রে মধুসূদনকে তাঁর সচ্চরিত্রতা প্রমাণ করতে হোল, যাঁরা আদৌ কোন চরিত্র নন, শুধু মান্য ব্যক্তি।

মধু পূর্বতন বড় সাহেবের কাছ থেকে কোন সার্টিফিকেট জোগাড় ক'রে রাখা অনাবশ্যক মনে করেছিলেন। কারণ বিচারপতি রে (Wray) সাহেবের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল, সম্প্রীতি ছিল।[৩ক] বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়তে যাওয়ার প্রয়োজনে তিনি চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

নীলদর্পণ নাটক অনুবাদের সঙ্গে তাঁর পদত্যাগের কোন সম্পর্ক আছে কি না সে বিষয়ে এখনও সন্দেহমুক্ত হওয়া যাচ্ছে না। দীনবন্ধুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।" এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনে বঙ্কিমের ভুল না হবারই কথা। তবু কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত একজনের বক্তব্যে সত্য স্পষ্ট না হলেও যুক্তির সুনিশ্চয়তা আছে, একথা মানতেই হবে।[৪] কারণ যাই হোক্‌, ম্যাক ফার্সানদের বাধা দানের ফলে মধুসূদনের হাইকোর্ট অন্তর্ভুক্তি বেশ বিলম্বিত হয়ে গেল। প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে ১৮৬৭ সনে ৩রা মে তাঁকে হাইকোর্ট বারে প্রবেশাধিকার দেওয়া হোল। এক্ষেত্রে যিনি সব থেকে বেশি উদ্যোগী ছিলেন, তিনি হলেন ভারতীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত। তিনি জুন মাসে দেহত্যাগ করলেন। 'বারে' প্রবেশ করে মধুসূদন তাঁর আনুকূল্য লাভের সুযোগ পেলেন না। প্রবেশলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁর কণ্ঠে বরমালা দান করেন নি।

॥ ৩ ॥

স্পেনসেস হোটেলে আছেন।[৫] যত্র আয় তত্র ব্যয় নয়, তত্রাধিক ব্যয়। ক'মাস প্রায় ধারের উপর চলেছেন। জুড়ি গাড়ির ভাড়া, চাকরদের মাহিনা বাকি পড়ে গেছে। হোটেলের বিলও পরিশোধ করা হয় না।

তাঁর একমাত্র শুভানুধ্যায়ী বিদ্যাসাগরকে একখানা চিঠি লিখলেন আরও কিছু ঋণের বন্দোবস্ত করার জন্য। কেউ কেউ হয়তো বলছেন, "বাঃ লোকটা ত বিদ্যাসাগরের টাকায় বেশ লাটসাহেবী করছে।"

মধু তা শুনেছেন। কিন্তু বিদেশে স্ত্রী-পুত্র অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছে। 'আমি না হয় অবিবেচক কিন্তু আমার অপরাধে তারা যেন দণ্ড না পায়।' বিদ্যাসাগরকে বিদ্যাসাগরের মত আচরণ করতে হবে, সাধারণ লোকের মত নয়। এই চিঠির কোথাও কোন তারিখ নেই, কিন্তু আছে একটি মর্মান্তিক বাক্য। কথাটা ব্যক্তিগত—"চিঠিখানা পড়া হলে নষ্ট করে ফেলবে আশা করি।"

মধু গ্রহীতা, দীন নন এখনও। তাঁর রাবণের মতই আত্মসম্মান বোধ এই মহা-অভিমানী ব্যক্তিকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ত্যাগ করে নি।

সবে ব্যারিস্টারীতে বসেছেন। পেশায় ভাল করে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই ঋণ পরিশোধের জন্য ভীষণ চাপ দেওয়া হতে লাগল। তাঁর উত্তমর্ণ কেউ অধম নন, সবাই উত্তম মান্য ব্যক্তি। মধু অর্থের লেন-দেন সম্বন্ধে কি ভাবতেন, তাঁর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, তাঁদের সাক্ষ্য থেকে তা জেনে নিই আমরা।

১. নিতান্ত কষ্ট পাইলে মাইকেল আমার নিকট অর্থ কর্জ করিতেন। তাহা পুনরায় চাহিলে মাইকেল বলিতেন, "এই ক্ষণে তোমার অর্থের কোন প্রয়োজন দেখি না যে কষ্ট করিয়া আমি তাহা পরিশোধ করি। যখন তোমার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে তখন দিব। * * * ধন ব্যয়ের জন্য এবং ইহার কোন স্বামী নাই, ইহাই তিনি জানিতেন।"

২. "একদিন আমরা বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটি লোক টাকার তাগাদা করিতে আসিলেন। পরে জানিলাম, তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠাইয়াছেন। মাইকেল তখন রিক্তহস্ত। তিনি মনোবলে বলীয়ান ও প্রকৃত ধনী হইলেও বিমাতা লক্ষ্মীদেবী তাঁহার প্রতি চিরকাল প্রতিকূল ছিলেন। তিনি অতি নম্রভাবেই বলিলেন, কেন আপনারা আমাকে লজ্জা দেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, কিন্তু এখন আমার হাত সম্পূর্ণ রিক্ত। মাইকেল এই রিক্ত অবস্থাতেও আমাকে প্রসন্ন হৃদয়ে সাহায্য করিতেন।"

ব্যারিস্টারীতে ভাল করে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই মধুসূদনের উপর ভীষণ চাপ দেওয়া হতে লাগল পূর্ব ঋণ পরিশোধ করার জন্য। শেষ পর্যন্ত পৈতৃক সম্পত্তি, যা উদ্ধার করার জন্য বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল, সেই সম্পত্তি বিক্রয় করে উত্তমর্ণদের শান্ত করলেন। মধুসূদনের পরবর্তী জীবনে এই ঘটনার গুরুত্ব অসাধারণ। অর্থাগমের নিশ্চিত ও স্থায়ী সংস্থান নষ্ট করে ফেলা হোল। স্ত্রী হেনরিয়েটা কলকাতায় ফিরে আসার এক বৎসর পূর্বেই এই অবিমৃষ্য কর্মটি করলেন। বাধা দেবার কেউ ছিল না। মাই-কেলের শিল্পী-প্রতিভার গুণগ্রাহীর অভাব নেই, কিন্তু মাইকেলকে শাসন করতে পারে এমন ব্যক্তি উপস্থিত নেই। ধর্মবোধ কর্তব্যবোধ অর্থনীতির তুলাদণ্ডে মাপা হোল—মনুষ্যত্বের তুলাদণ্ডে মাপা হোল না। তাঁর প্রিয় 'বিদ' উষ্মার সঙ্গে একখানা চিঠি লিখলেন।

কবির ইউরোপ প্রবাসকালে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করে দিয়ে তাঁকে সঙ্কট-মুক্ত করেন। বিদ্যাসাগর এই টাকা জোগাড় করেছিলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

"কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূলবাবু সত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই। এক্ষণে কিরূপে আমার মানরক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনাদের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমার পরিত্রাণ করেন। পীড়া শান্তি ও স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া এবং অন্তত ছয় মাস কাল তথায় থাকা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে যাইব স্থির করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিস্তার না করিলে কোন মতেই যাইতে পারিব না।"

সংসারী মধ্যবিত্তের সাধারণ মান-অপমানবোধ এই চিঠিতে বড় হয়ে দেখা দিল। এই চিঠির সুর (বক্তব্য নয়) মধুসূদনকে বিস্মিত করেছিল। "কয়েক মিনিট আগে তোমার যে-চিঠি আমার হাতে এসে পড়ল, তা পড়ে আমি ব্যথিত হয়েছি। তুমি ত জান পৃথিবীতে এমন কাজ নেই, যা তোমার জন্য করতে আমি পিছপা হই। যে-অবাঞ্ছিত বোঝা তোমার উপর চেপেছে, তার সুরাহার জন্য তুমি যে-ব্যবস্থাই নেবে তাতে আমার ষোলো আনা সম্মতি থাকলো।"

এই সম্মতিদানের ফলে আশ্বিন মাসেই সম্ভব হোল না, মাঘ মাসে তাঁর চকমুনিয়া ও চকগদারডাঙ্গা এই দুইটি মহাল মহাদেব চট্টোপাধ্যায় ও তস্য পত্নী মোক্ষদা দেবীর কাছে মাত্র বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় হয়ে গেল।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঠিক এক বৎসর পরে এই কাজ সম্পন্ন হোল। সম্ভত গৌরদাস কলকাতায় থাকলে এই কাজ করতে দিতেন না; পরবর্তী-কালে তিনি এই ঘটনার জন্য কত আপশোস করেছেন!

পিতৃগৃহ বেচে দিয়েছিলেন বিলেত গমনের জাহাজ-ভাডা জোগাড় করার জন্য। পিতৃ-সম্পত্তি বেচলেন বিলেত-বাসের খেসারত হিসাবে।

"মধুসূদন অকৃতজ্ঞ ছিলেন না; তিনি স্বীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন।"[৫] হায় রে কৃতজ্ঞতা! হায় রে ঋণ!

কত শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে, অভাব-অনটনের মধ্যেও অবিচলিত থেকে, স্থিতধী থেকে সেই বিদেশে নানা ভাষা আয়ত্ত করে নানা সম্পদ সংগ্রহ করে আনলেন, তা কি শুধু ব্যয়ের অঙ্কের পরিমাণ ও সংখ্যা বাড়াতে? ভাগ্যদোষে আহরণ কখনও-কখনও বেহিসাবী ব্যয়ে পরিণত হয়।

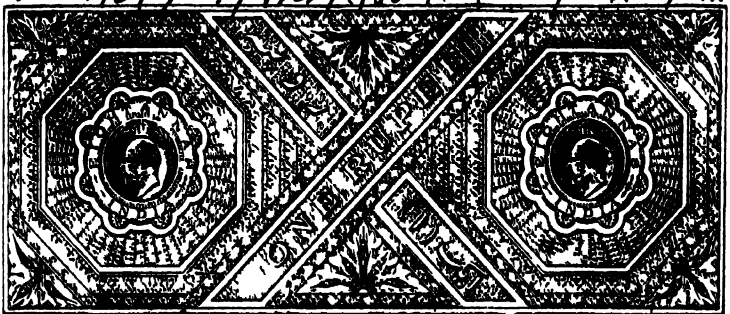
এই সময়ে পুলিশ কোর্টের জজ ফ্যাগান সাহেব চাকরী ছেড়ে বিলেত চলে যাচ্ছেন, এই সংবাদ রটে গিয়েছিল। মধু সেই খবর শুনে বিদ্যাসাগরকে লিখলেন যে, এই চাকরীর জন্য তিনি উৎসাহী; বিদ্যাসাগর যেন তাঁর বন্ধু বাংলার ছোটলাটকে মধুর সম্বন্ধে বলেন।

"আমার অপরাধের জন্য আমার বিরূপ হোয়' না; যদিও তুমি জেতে বামুন, তবু দুর্বাসা মুনির বংশধর হোয়' না।"

ফ্যাগান চাকরী ছাড়েন নি; তিনি 'ফার্লো'তে যেতে চেয়েছিলেন।[৬]

একজন ইংরেজ ব্যারিস্টার এদেশে কপর্দকশূন্য হয়েই জাহাজ ঘাটে নামতেন; কিন্তু সাদা চামড়ার সুবাদে সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন দেশীয় ব্যক্তি তাঁর 'দুবাস' বা দোভাষী হয়ে তাঁর খিদমত করত। টাকা-পয়সা সেই যোগাড় করত, বাড়ি-ঘর, গাড়ি-জুড়ি, মায় আসবাবপত্র পর্যন্ত। তার পর 'প্র্যাকটিস' জমে উঠলে সে সব ঋণ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ হয়ে যেত। মাইকেল ছোটবেলা থেকে এইসব দেখেছেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছেলের পক্ষে এই সব উঞ্ছবৃত্তির প্রয়োজন হয় নি। রামলোচন ঘোষের পুত্রের পক্ষেও নয়। উমেশচন্দ্র ১৮৬৮ সনের ১০ই নভেম্বর হাইকোর্টে প্রবেশ করলেন। তাঁর বিষয় আলাদা—দরিদ্র ঘরের সন্তান। তিনি হিন্দু কলেজে

39459/8/9 2017 Presy: 168 1. 1. 159 No. 51 1R



no 51 (Stamp one hundred fifty Rs)

Duly stamped under S 23 of sch A of stamp act
admissible under secs 21 22 23 32 & 34 of the
Registration act Fee paid Rs 4/- 13 [illegible]

[illegible]

Presented for registration between the hours of 12 & 1 P.M.
on the 25th day of July 1868 at the Presy Regy
office by Michael Madhusudan Datta the executant
of Calcutta Barrister at Law by whom also
the execution & receipt of consideration
were admitted. He is personally
known to the offg Regr

Sd Michael M Datta

Sd P C Bosal
Offg Regr
25th July 1868

Registered in Book no I
Volume I
Pages 159 to 161
Being No 51 in
that Register of
2nd March 1868

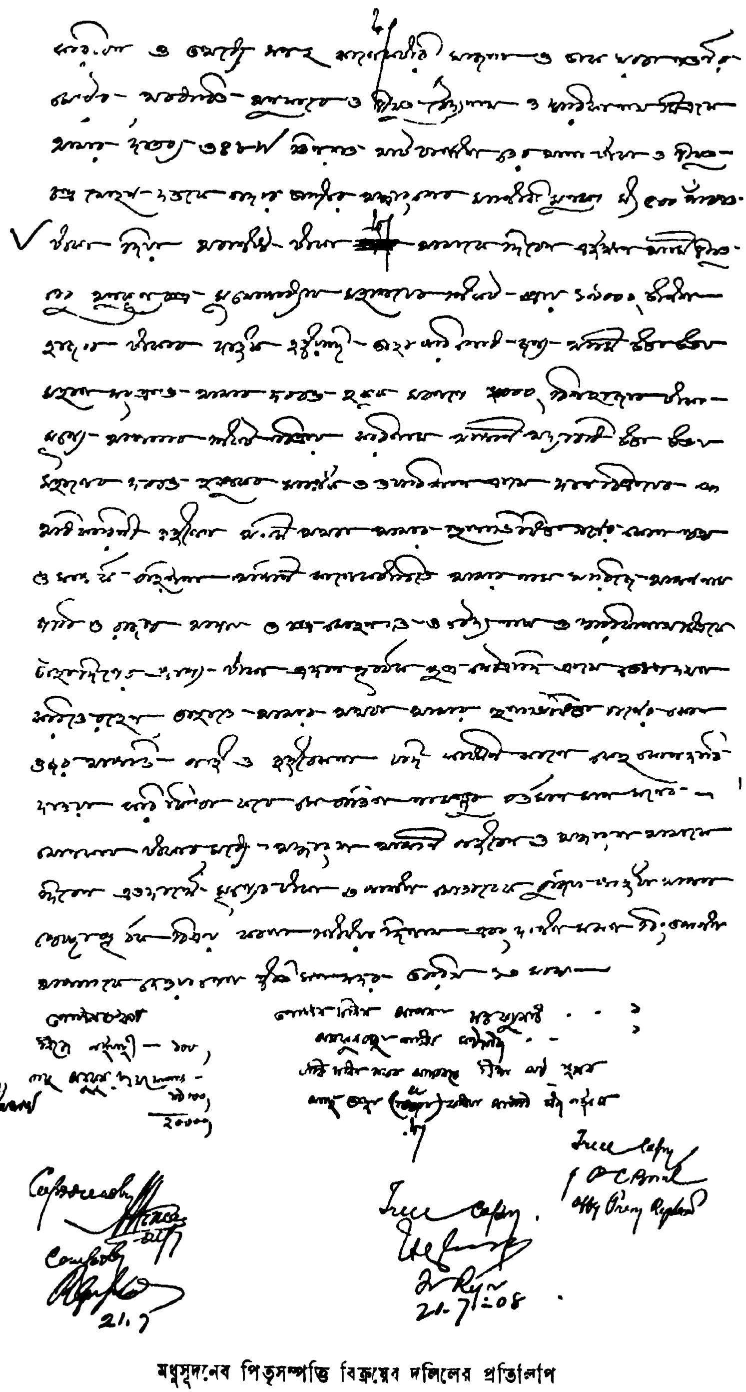
The seal of the Presy Regr Calcutta

Sd P C Bosal
Presy Regr.

Michael Madhusudan Datta

[illegible Bengali endorsement]

W1



মধুসূদনের পিতৃসম্পত্তি বিক্রয়ের দলিলের প্রতিলিপি

লেখাপড়া করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "Charity Boy" হিসাবে।[৮ক]

মধু বিত্তশালী পিতার দরিদ্র সন্তান। কিন্তু কপর্দকহীন নবীন ব্যারিস্টার—এক 'পার্টি' দিয়ে ফেললেন। দ্বারকানাথ মিত্র জজ হয়েছেন। মধুসূদন তাঁকে এক পার্টিতে আপ্যায়িত করলেন। কলকাতায় ধনী লোকের অভাব ছিল না, তবে অপব্যয়ী ক'জন ছিলেন ?

অভ্যাগত যিনিই আসুন, তাঁরই আপ্যায়নের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা। তাঁর আতিথেয়তার একটি বচন কলকাতায় প্রবচনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

"Boy, give him a peg."

উপ-অর্জন হচ্ছে, কিন্তু উপ-বর্জন তার থেকে অনেক বেশী। বিদেশে স্ত্রী-পুত্রদের বাসাখরচ নিয়মিত পাঠান হচ্ছে না। উপায়ান্তর না দেখে স্ত্রী হেনরিয়েটা পুত্র-কন্যাদের নিয়ে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে ১৮৬৯ সনের মে মাসে কলকাতায় ফিরে এলেন। স্বামীর বিলেত ত্যাগের পর তাঁরা প্রায় আড়াই বৎসর ফ্রান্সে ছিলেন। মধুসূদন ছেলেমেয়েদের "thoroughly Europeanised" করতে ছেয়েছিলেন। সে কাজ কতটা সিদ্ধ হয়েছে সে প্রশ্ন স্থগিত থাক। কিন্তু তারা যে ফরাসী ভাষায় খুব রপ্ত হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফলে বিভ্রান্তি ঘটার সুযোগ ঘটেছে। বিভ্রান্ত হয়েছেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৯ সনে আগষ্ট মাসে তাঁরা উত্তরপাড়ায় যান। তখন রাসবিহারী মধুপত্নীকে ফরাসী ভদ্রমহিলা বলে ভ্রম করেছিলেন।

আর হোটেলে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। জুন মাসে এক বাসা ভাড়া করা হোল—৬নং লাউডন স্ট্রীটে বাসা, বাসা নয়, প্রাসাদ।

"আমাকে মর্যাদা অনুসারে থাকতে হবে।" বটেই তো !

সখ মিটিয়ে সাজালেন বাড়ি—রাবণের রাজপুরী ত্রিজগতের বৈভব দিয়ে সুসজ্জিত হয়েছিল। মধুসূদনের গৃহ দেশীয় ও বিদেশীয় নানাবিধ উপকরণে বিভূষিত হোল। উদ্যানে নানা পুষ্পবৃক্ষ, লতাপাতা ঠিক যেন ইউরোপীয় প্রণালীতে উদ্যানটি সুসজ্জিত হোল—লঙ্কার উদ্যানের মত নানাবিধ ফুল সে উদ্যান আলোকিত করল। "যুবতী যৌবন যথা"। "৬নং লাউডন স্ট্রীটের সুরম্য অট্টালিকা মধুসূদন য়ুরোপের আদর্শে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। এমন বেষ্টিত উদ্যান নানা পুষ্পবৃক্ষে, লতাপাতায় পরিপূর্ণ ছিল। য়ুরোপীয়

প্রণালীতে উদ্যান রচিত হইয়াছিল। ফরাসী প্রণালীতে রচিত পুষ্পকুঞ্জ ও লতামণ্ডপের বাহার সে সময়ে প্রদেশের কাহারও উদ্যানে দেখা যাইত না। কক্ষসমূহের আভ্যন্তরিক সাজসজ্জাও বিচিত্র। প্রাচীরগাত্রে য়ুরোপীয় পৌরাণিক কাব্যসমূহ হইতে নির্বাচিত বিষয়ের চিত্রাবলী সুশোভিত। কৌচ, কেদারা, টেবিল, আলমিরা, ঝালর, পর্দা যে কত অভিনব প্রকারের ছিল, তাহা বলা যায় না। পুস্তকাধারে য়ুরোপীয় বিবিধ ভাষায় রচিত মহাকবিগণের গ্রন্থাবলী (classical works) সজ্জীভূত।

তিনি য়ুরোপ হইতে আসিবার সময় হোমর, দান্তে, ভার্জিল, তাসো, সেক্সপীয়র, মিল্টন প্রভৃতি ধাতু ও প্রস্তর প্রভৃতির দ্বারা-নির্মিত অর্ধমূর্তিসমূহ (Bust) বহু মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই প্রতিমূর্তিগুলি তাঁহার পাঠাগারের শোভা বর্ধন করিত।"[৭] তাঁর সঙ্গে গাড়ি-জুড়ি, লোক-লস্কর, এমন কি সুখাদ্য প্রস্তুত করার জন্য প্রিন্স দ্বারকানাথের প্রাক্তন বাবুর্চি পর্যন্ত নিযুক্ত হোল। এই স্বভাব জীবন-বিমুখ দেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সচেতন অন্বেষণ নীতিগতভাবে কোনদিনই সমর্থিত হয় নি। তাকে কামশাস্ত্রের অধ্যায় বিশেষ বলে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। অথচ কলকাতার সকল কৃতবিদ্যের গৃহই অনুরূপ ছাঁদেই ছন্দিত ছিল।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে বাংলার সমাজজীবনে এইরূপ পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৮২৩ সনে বিশপ হিবার তাঁর এক চিঠিতে লিখছেন, "The wealthy natives now all affect to have all their houses decorated with Corinthian pillars, and filled with English furnitures. They drive the best horses and the most dashing carriages in Calcutta." ইংরেজ বা ইউরোপীয় অনুকরণে কলকাতার বাড়িঘরের ছাঁদ আলাদা হয়ে গেল; ঘরের আসবাবপত্রে সে পরিবর্তনের ছাপ পড়ল। গাড়ি-জুড়ি নতুন জাতের হোল।

বেনিয়ান-মুৎসুদ্দী-দালাল-ফড়েদের ক্ষেত্রে এই সব বিলাস-উপকরণ সমালোচনীয় হয় নি, কিন্তু মধুসূদনের ক্ষেত্রে হয়েছে। সমালোচকেরা ভুলে গেছেন যে মধুসূদন আজ ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টারকে ব্যারিস্টারের মতই থাকতে হবে, পুলিশ কোর্টের কেরানী বা 'কোর্ট পণ্ডিতে'র মত নয়।

কাব্যে যে-ক্ষুধার অভিব্যক্তি সকলের বাহবা কুড়িয়েছে, জীবনে তার

সামান্য অনুবাদেই জীবনীকারেরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। তবু মধুসূদন নিছক ভোগবাদী নন ; ভোগকে জীবনের সর্ব প্রেরণার সঙ্গে বাঁধলে তার লোলুপতার রঙ ফিকে হয়ে যায়, বৃন্তে বৃন্তে সহাস্যতার রং ধরে।

হাইকোর্টে মামলা মোকদ্দমা পাচ্ছেন। বেশ মক্কেল পরিবৃত অবস্থায় সময় কাটছে। ১৮৬০ সনের ১০ই আগস্ট তাঁর চেম্বারে গৌরদাস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, কিন্তু ভিড় দেখে ফিরে গেলেন।

"প্রিয় গৌর,

বুঝতে পারবে না যে তুমি আমার সঙ্গে দুটো কথা না বলে শহর ত্যাগ করেছ, এতে আমি কী কষ্ট পেয়েছি! আমার চেম্বার তখন যে কত রকম মজার মজার মক্কেলে পরিপূর্ণ।" গৌরদাস বন্ধুকে বড় ব্যারিস্টার হিসাবে দেখতে চান, না বড় কবিরূপে দেখতে চান? সম্ভবত বড় কবি থেকে বড় ব্যারিস্টারের বেশি সম্মান ছিল তদকালীন সমাজে।

"তুমি কি এখন নতুন কিছু লিখছ? সেদিন দেখলাম নতুনের মধ্যে শুধু হোমারের অনুবাদে হাত দিয়েছ। আমি অনুমান করছি তোমার বর্তমান পেশা তোমাকে কাব্যচর্চার জন্য খুব বেশী অবসর দেয় না। দ্বারিক, শম্ভু বা রমাপ্রসাদের মত তুমি চুটিয়ে ব্যারিস্টারী করছ, এমন খবর ব্যতীত অন্য কোন খবরে আমি আর তেমন আনন্দ পাবো না। তুমি তাদের সবাইয়ের থেকে প্রতিভাবান অধিকতর ; ওদের সবার খ্যাতি তুমি ম্লান করে দেবে এই আমি চাই।" এই চিঠি তৎকালীন কৃতি বাঙালীর মানসিকতার একটি দলিল।

মাইকেল এই সময়ে অনন্য মন হয়ে কি ব্যারিস্টারী করছেন? কয়েকটি বড় বড় মামলায় কৌঁশুলিরূপে যুক্ত ছিলেন। শ্রীরামপুরের জমিদার গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত নন্দলাল সেনের বৃহৎ মামলায় তিনি গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর পক্ষে ব্যারিস্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন।"*

ঠাকুর বনাম ঠাকুর মামলায়ও তিনি ফরিয়াদী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পক্ষে কৌঁশুলী ছিলেন। ধর ও মিত্র ছিলেন এ্যাটর্নি। উপেন্দ্রমোহন-যতীন্দ্রমোহন ছিলেন বিবাদীপক্ষ। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পক্ষ অবলম্বন করায় যতীন্দ্রমোহন কি তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন? মাঝে মাঝে মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে মফঃস্বলে যান। একবার বারুইপুরে গেলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন হাকিম সেখানে।

ব্যক্তি-বঙ্কিম তাঁর অপরিচিত নন, কারণ মধুর সহপাঠী জগদীশনাথ রায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় সুহৃদ ছিলেন। জগদীশের বন্ধু হলেও মধু তাঁকে বন্ধুর পর্যায়ভুক্ত করেন নি, অনুজ-কল্প মনে করতেন। "একদিন জগদীশনাথ ও মধুসূদনের মধ্যে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বঙ্কিমচন্দ্র কি একটি টিপ্পনী করায় মধুসূদন তাঁহাকে বলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, বয়োজ্যেষ্ঠদিগের কথা শুনিয়া যাও, টিপ্পনী কাটিও না"।

আর এক মামলা উপলক্ষে বর্ধমানে গেলেন, সেখানে পুরাতন বন্ধু ভোলানাথ চন্দ্রের সঙ্গে দেখা হোল। উভয়ে উভয়ের দেখা পেয়ে খুব খুসি। ভোলানাথ তাঁর স্মৃতিকথায় সে স্মৃতির সুধাময় বর্ণনা দিয়েছেন। এত সত্ত্বেও ব্যারিস্টারীর উপার্জনে সংসারের ব্যয় সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হয় না। কবি আর ব্যারিস্টার একই ব্যক্তি বলে ব্যারিস্টারকে পথ ছেড়ে দিতে হচ্ছে কবির জন্য। তাই সওয়ালের মধ্যে এসে পড়ে ভারতচন্দ্রের পংক্তি—"বাঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী।" জজ একবার বললেন, "তুমি অনেক বাজে বকিয়া থাক, কেবল কবিতা বল।" আর একবার একটি সওয়ালের সঙ্গে একটি উপমা দিলেন, মাছরাঙ্গার মত বাদী ঝুঁকে পড়েছে।

কবিতা শুনে বিচারক বললেন, "দুঃখের বিষয় আইনের সহিত কবিতার কোন সংশ্রব দেখি না।"

শুধু সওয়ালে কবিতা নয়, বার লাইব্রেরীতে বা গৃহে সঙ্গীত ও নাটকের রস-আস্বাদনের সুযোগ পেলে মামলার নথিপত্র ফেলে উঠে পড়তেন। একদিন বার লাইব্রেরীতে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে দেখতে পেয়ে সব কাজ ফেলে নিজের চেম্বারে মুস্তফীকে টেনে আনলেন। কি উদ্দেশ্যে না বলাই ভালো।

সখী সংবাদ গাইতে জানেন, এমন এক মক্কেলের কণ্ঠে দশ-পনেরোটি সখী সংবাদ শুনে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁর মামলা করেছেন। উপার্জন লক্ষ্য হলেও ব্যয় হোল তাঁর ব্যসন।

একই কক্ষে কবির সঙ্গে ব্যারিস্টারের কলহ চলেছে। অপরপক্ষে মনুষ্যত্বের সঙ্গে কৌশুলীর বৃথাই তুমুল তর্ক চলছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত, অর্ধপরিচিত কত ব্যক্তির মামলা করে পয়সা নিতে চান না! যিনি ব্যারিস্টার, তাঁর অর্থ আসবে কোন সূত্র থেকে? 'আমার নিকট আত্মীয়ের একটি মোকদ্দমা ছিল। ঐ ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে করিয়া মাইকেলের

নিকট গমন করে। মাইকেল পরিচয় পাইয়া 'Brief' লইলেন, এবং তাহার নিকট হইতে fee লইলেন না। সে সময়ে মাইকেলের অর্থের অত্যন্ত অনটন, মাইকেল আমাকে বললেন, "গৃহিণী কহিতেছেন ঘরে অন্ন নাই—এবং বাড়ি ভাড়ার টাকাই নাই।" আমি কহিলাম, "আমার আত্মীয় টাকা দিতে প্রস্তুত, আপনি কি জন্য লইতেছেন না?" তিনি কহিলেন, তোমার আত্মীয়, এজন্য অর্থ লইতে পারি না এবং তুমি লইয়া দিলে আমি বিরক্ত হইব। তোমার যদি নিজের টাকা থাকে, তুমি পাঁচ টাকা গৃহিণীকে দিয়া আইস এবং কহিবে যে শীঘ্র আহার প্রস্তুত করিয়া আমাকে আদালতে বিদায় দেন।"[৮]

বাল্যবন্ধু গণেশচন্দ্রের ছোট ভাই হলেন হরিমোহন। সেই হরিমোহনের আত্মীয়ের কাছ থেকে ন্যায্য 'ফি' নেওয়া যায় না। এই অপারগতার সঙ্গে আর একটি অপারগতা যুক্ত হলে আমরা কি খুসি হতাম? হরিমোহনের কাছ থেকে ৫ টাকা ঋণ করতে মধুসূদনের অপমান নেই। না গ্রহণ না বর্জন এইরকম হিসাবী সূক্ষ্ম বেনিয়া-বুদ্ধি তাঁর ছিল না।

॥ ৪ ॥

অতএব ব্যারিস্টারী ছাড়তে হোল; চাকরী নিলেন ১৮৬৯ সন জুন মাসে। হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিলের আপীলের অনুবাদ বিভাগের পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন। শোনা যায়, বেতন মাসিক এক হাজার টাকা।

চাকরীটা কি জাতীয়, হাইকোর্টের কোন দলিল থেকে জানবার উপায় নেই। এমনকি ক্যালকাটা গেজেট, গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া গেজেট এবং বঙ্গ সরকার প্রকাশিত কোয়ার্টার্লি সিভিল লিস্ট থেকেও কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। চাকরীটি তবে কি স্থায়ী কিছু নয়? চুক্তি নিয়োগ? (Contract Service)।

"বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে
সে সাধ সাধিতে?"

—পরাভূত সৈনিকের ক্ষোভ বোধ করি এখানে আত্মগোপন করে আছে? কিন্তু ইন্দ্রজিৎ ক্ষোভ করেছিল ভিন্ন ভাষায়—

রাঘবনন্দন আমি না ডরি শমনে।
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাত মরিনু যে আজি,
পামর, এ চির দুঃখ রহিল রে মনে। (৬ষ্ঠ সর্গ)

রাজনারায়ণের পুত্র বৃত্তির ব্যর্থতায় দরিদ্র নয়, বৃত্তির দ্বিচারিতায় দরিদ্র।

হিন্দু প্যাট্রিয়ট ও ইংলিশম্যানে এই চাকুরী প্রাপ্তির খবর বেরিয়েছে, উভয় পত্রিকায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে।

জনৈক আত্মীয় সুদুর গৌহাটী থেকে এই খবর জেনে আনন্দ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন। চাকরীটি ১৮৭০ সনে জুন মাসে হয়েছিল, কতদিন বজায় ছিল, বলা কঠিন। কারণ ১৮৭১ সনে তিনি ঢাকায় গেছেন আর একটি মামলা উপলক্ষে, ১৮৭২ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে পুরুলিয়ায় গেছেন একটি মামলা উপলক্ষে, চাকরী নিয়েছেন পঞ্চকোট রাজ্যে মার্চ মাসে এবং সেই চাকরী ত্যাগ করেছেন ১৮৭২ সনে সেপ্টেম্বর মাসে। এইসব তথ্য থেকে বুঝা যায় যে মধুস্মৃতির বিবরণ নির্ভরযোগ্য নয়। আর ব্রজেন্দ্রবাবু ঐ তথ্য তাঁর পুস্তিকায় খুটিয়ে না দেখে স্থান দিয়েছেন, উদ্ধৃত করেছেন।[৮ক]

হাইকোর্টের 'চাকরী' দীর্ঘকাল করেন নি; ১৮৭১ সনে আবার ব্যারিস্টারীতে ফিরে আসেন। ঠিক কোন্ মাসে বলা যাচ্ছে না, কারণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সবই নষ্ট হয়ে গেছে।

১৮৭১ সনে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ঢাকায় এলেন। ঢাকায় এসে তিনি ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত হলেন। একেই লিভারের অবস্থা সন্তোষজনক নয়, তার উপর ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে যকৃৎ যন্ত্রটির অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। অসুস্থ হয়ে প্রায় দশ দিন ঢাকায় থাকতে হোল।

এই সময়ে ঢাকা শহরে প্রগতিপন্থী ও রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল বিরোধ ছিল। ব্রাহ্মধর্মের অনুপ্রবেশে ঢাকায় দীননাথ সেন, গোবিন্দ রায় প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুকূল হয়ে ওঠেন। ঢাকার 'প্রগতিশীল' মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁকে কাছে পেয়ে মেতে ওঠেন। অথচ এই ঢাকার সন্তান জগদ্বন্ধু ভদ্র তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে ব্যঙ্গ করে তাঁর স্ব-জেলাবাসী শিশিরকুমার ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকায় 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য' লিখেছিলেন। জগদ্বন্ধু ভদ্রের দেশে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হোল। ঢাকার অন্যান্য সামাজিক সমাবেশে তিনি যোগ দিয়েছেন।

"গত শনিবার ঢাকায় জ্ঞানকরী সভায় বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ের আন্দোলন হয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মনুর বচনে বহু-বিবাহের স্থুল ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তথায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, দত্তজ মহাশয় মন্বাদি শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া তাহা বুড়ীগঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।"[৯]

ঢাকাবাসীর এই মনোদুঃখ তিনি বেশি সময় টিকতে দেন নি। কারণ মধুর বাঙ্গাল-তোষণা বক্তৃতায় তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন।

"আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।" এর জবাবে মধুসূদন যে বক্তৃতা দেন তাতে তাঁর হৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে।

"আমার সম্বন্ধে আপনাদের যে-কোন ভ্রমই হউক আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার যেমনি লোভ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো আমি শুধু বাঙ্গালী নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।"

ঢাকার নবীন কবি—হরিশচন্দ্র মিত্র, আনন্দচন্দ্র মিত্র, গোবিন্দ রায় প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে আলাপ করে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

মধুসূদনের বাঙ্গালীত্বের প্রমাণ 'ক্যাপটিব লেডি' থেকে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' পর্যন্ত ছড়ানো। বাঙ্গালত্বের প্রমাণও বোধ হয় একই রকম সুলভ। মধ্যবঙ্গের কবির কাব্যে ভূগোলের মধ্যস্থতা অতি-প্রকট। ঢাকার সম্বর্ধনার উত্তরে একটি চতুর্দশপদী লিখেছিলেন। আনুষ্ঠানিক কবিতা এটি; তবু চমৎকৃত হবার মত একটি বাক্য আছে—

> "নাহি পায় নাম তব বেদে কি পুরাণে
> কিন্তু বঙ্গ অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
> পূর্ববঙ্গে।"

সমগ্র কবিতাটি আত্মগ্লানিতে ভরা। প্রত্যভিভাষণে যে-সরসতা আছে, এখানে তা অদৃশ্য। নিজেকে ছিন্নপক্ষ মৈনাক ও ভগ্নঊরু দুর্যোধনের সঙ্গে উপমিত করেছেন। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তারপরও কবি পঞ্চকোট গেছেন, এবং 'মায়াকানন' লিখেছেন।

পূর্ববঙ্গ থেকে কবি ফিরলেন আরও অসুস্থ হয়ে, একটানা কয়েকদিন জ্বরে ভুগেছেন কিনা। এবার লাউডন স্ট্রীটের বাসা ত্যাগ করলেন। চলে গেলেন বেনিয়াপুকুর পল্লীতে। সময়টা হোল ১৮৭১ সনের শেষ ভাগ। এবার আর হিন্দু পল্লী না। দেশ-কাল পাল্টে গেছে। বিধর্মীর একঘরে করার

নীতি শুরু হয়েছে। লাউডন স্ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে দিলেন; কিন্তু তার জন্য বহু মাসের ভাড়া বাকি। বাড়ি সাজাতে যে-আসবাব পত্র কিনেছিলেন, তার মূল্য তখনও পরিশোধ করা হয় নি। প্রিন্স দ্বারকানাথের পাচককে বাসায় রেখেছিলেন। তার বেতনও দিতে পারেন নি। কিন্তু তার চাকরীর জন্য অন্যত্র সুপারিশ করে পাঠালেন। গাড়ি বেচে দিলেন, কিন্তু গাড়োয়ান, সহিস, বাগানের মালী, পাখাওয়ালা—এদের মাহিনা মিটিয়ে দেওয়া হয় নি। মর্যাদা অনুযায়ী জীবন যাপনের দণ্ড তাঁকে পোহাতে হোল। রাজ্যচ্যুত লঙ্কেশ্বরের মূর্তি মধুসূদন আঁকেন নি, পুত্রবিয়োগে কাতর ও পতনোন্মুখ রাবণকে কেবল তিনি এঁকেছেন। সেখানে পতনের শেষ ধাপটিতে পা দিতে তার মনে কত দ্বিধা ছিল। কিন্তু কাব্যের থেকে জীবনের দাবী যে অধিকতর তীব্র।

॥ ৫ ॥

বিপর্যস্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে অসমাপ্ত হেক্‌টর বধ প্রকাশিত হোল। রচনা শুরু হয়েছিল ১৮৬৭ সনে। কিন্তু ব্যারিস্টারের জীবনে অবকাশ কম; নবীন ব্যারিস্টারের জীবনে ত আরও কম। উন্নতির আশায় তাকে অবিরত সংগ্রাম করতে হয়। "লিখিত পুস্তকখানি চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল; এমন সময় পাই নাই যে ইহা প্রকাশি। একস্থলে কয়েক খানি কপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে; সেটুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হয় এতদিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্যাস্পদ হইতে চলিলাম। ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোন ত্রুটি হইবে না, এবং অবশিষ্ট অংশও অতি শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব।" মধুর তৎকালীন জীবনের সংকট অনুমানের জন্য দ্বিতীয় কোন দলিলের দরকার করে না। এই ভূমিকা কি যথেষ্ট নয়? ১৮৬৫-৬৬ খ্রীস্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনীও কপালকুণ্ডলা আত্মপ্রকাশ করেছে। উক্ত গ্রন্থ দুখানির গল্পরসে মজে আমরা মধুর গদ্য-রীতির বিপ্লবাত্মক ভূমিকার কথা বিস্মৃত হই।

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' ও তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' ব্যতীত বাংলা গদ্যের আর কোন ধ্রুপদী উদাহরণ ছিল না। অথচ মধুসূদন পূর্বোক্ত উদাহরণ অনুকরণযোগ্য মনে করলেন না। সংস্কৃত ব্যাকরণ আনুগত্য মধুসূদনের স্বভাবের বিরোধী। মধুসূদন বাংলা 'ইডিয়ম'কে কত

গভীরভাবে জানতেন, তার প্রমাণ ইতিপূর্বেই আমরা পেয়েছি। নাটকে, প্রহসনে, এমনকি মেঘনাদবধ কাব্যেও। এখানে দেখব তিনি বাংলা ইডিয়মের চালটাকে কত সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছেন। দুই একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

১. যদি কস্মিন্‌কালে নব বরবধূর কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে আপনার সকলেই তাহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

২. সে যাহা হউক, এ-ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তোর সহিত আমার আর বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই। তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। কিন্তু যেন এই কথাটি তোব মনে থাকে যে, যদি তোর রক্ষিত কোন নগর আমি কোন না কোন বিনষ্ট করিতে চাই, তখন তোর তৎসম্পর্কীয় কোন আপত্তিই কখন ফলবতী হইবে না।

আবার ইংরেজী বাক্য রচনারীতির বঙ্গীয়করণও আছে :

১. ভবিষ্যতের বদনও ব্রীড়ায় অবনত ও মলিন হইবে। (১ম পরিচ্ছেদ)

২. যে জগতীতলে তাহার ভাগ্যহীন পুত্র আকিলীসের হ্রাসপ্রাপ্ত মানের পুনঃ পরিপূরণে যেন তাহার বিপক্ষ গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগাসেমননের অবমাননা বিলক্ষণ সম্পাদিত হয়। (১ম পরিচ্ছেদ)

৩. বীরর্ষভ ত্বোমিদ আপন শূলদ্বারা বিপক্ষের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন, বীরবর সে মহাঘাতে সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া কালনিকেতনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। (৩য় পরিচ্ছেদ)

৪. তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বীরকুলের পরাক্রমাগ্নি রণস্থলে যেন নিস্তেজ হইতে লাগিল। (ঐ)

দেশীয় ব্যাকরণে এই বাক্যযোজনা রীতির সন্ধান নেই। মধুসূদন ইচ্ছা করেই এই অসম্মতি কবুল করেছেন। এ ছাড়া শব্দের প্রচলিত অর্থ ত্যাগ করে নতুন অর্থের তিনি উদ্ভব ঘটিয়েছেন। যেমন আকর্ষণপূর্বক, নিষ্কৃতি-সাধন, ধনুষ্টঙ্কারে, দূরস্থ করা প্রভৃতি।' বহু বিশেষণ ব্যবহার করেছেন যার উৎস রয়েছে বিদেশ ভূখণ্ডে—যথা, পিত্তলপদ, ভূকম্পকারী, জলদলপতি, বন্ধ্যা সিন্ধুতট, অসাধ্য সাগরতীর, নশ্বর সমর, অহিত সংবাদ প্রভৃতি।

বহু অভিনব শব্দ সৃজন করেছেন, যার পূর্ণ নজির আছে মেঘনাদবধকাব্যে কৃতার্ত্তা, বলী (বলশালী অর্থে), রণী (রণনিপুণ সৈনিক অর্থে),

ধন্বী (ধনুকধারী যোদ্ধা অর্থে), ক্ষতপুত্র, রশ্মিশালী প্রভৃতি। নামধাতু ও একইভাবে তৈরি করেছেন—প্রকাশি, নিক্ষেপিলেন, নাশিতে, উত্তরিলেন, সম্বোধিয়া, রণিলে, নিবেদিল, প্রদানিবেন, প্রবেশিয়া, প্রভৃতি। পদ্যে এগুলির ব্যবহারের পক্ষে না হয় যুক্তি ছিল ছন্দের খাতিরে। এখন? এখন ব্যবহার করলেন বাংলা বাক্যশরীর থেকে 'কৃ'-ধাতুর অতি-নির্ভরতা লোপ করার জন্য। মধুসূদন বাক্যের গঠনে একটা বড় প্রবাহ পছন্দ করতেন—কী কাব্যে, কী গদ্যনিবন্ধে। তাই কৃ-ধাতুর সদা দুইপদ বিশিষ্টতায় তাঁর বিরক্তি ছিল। ক্রিয়াপদ সংযোগীকরণে নাম ধাতুর তৎপরতা তিনি বাড়িয়ে দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বাক্যগুলিকে দীর্ঘতর করলেন। সরল বাক্য তিনি ব্যবহার করেছেন কম। গদ্যে জটিল ও যৌগিক বাক্যের উপর তাঁর পক্ষপাতিত্ব।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী হেক্‌টার বধের গদ্য প'ড়ে বলেছিলেন, এ হোল জার্মান গদ্য। তিনি যে একটি নতুন কথা বললেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লেসিং-এর গদ্য সম্বন্ধে কার্লাইল একদা বলেছিলেন—"Pure without purism." আমার মনে হয় মধুসূদনের গদ্য সম্বন্ধে ঐ উক্তিটি পুনরুচ্চারণ করা যায়। এ গদ্য স্বচ্ছ, অথচ এতে এক স্বতন্ত্র চরিত্র ফুটে উঠেছে, অর্থের নানা মোচড় দেখা দিয়েছে। এই হোল সেই জাতের গদ্য যার অন্তরটা খোলামেলা, আর জিহ্বাটা ধারালো।

মধুসূদন শব্দ বাক্য অনুচ্ছেদ নিজের মত সাজিয়েছেন। ইলিয়াসের গল্প তাঁর ইচ্ছায় লতিয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে থমকে গেছেন, সে হোল অলংকার। নিয়ত অনটনের কঠিন কশাঘাতে যিনি জর্জরিত, তিনি সুদৃশ্য অলংকার প্রায় সব কয়টি পরদেশ থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন।

সাধারণভাবে মধু তার অনুবাদ-রীতি ব্যাখা করেছেন, "বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তকপুত্র রূপ গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদয় দূরীভূত করিতে হয়।"

অবশ্য মধু এই রীতি আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ করেন নি। তিনি হোমারকে হোমরীয় ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, কৃত্তিবাস বা ভারতচন্দ্রের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুধী হরচন্দ্র ঘোষ 'রোমিও ও জুলিয়েট' এবং 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অনুবাদ

করতে গিয়ে শেক্সপীয়রকে মঙ্গল কাব্যের ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। মাইকেল তাঁর বিষয়কে বঙ্গীয় রূপ দিলেন; মধ্যযুগীয় রূপ দেন নি। মাইকেল ঠিক অনুবাদও করেন নি, তিনি নিজে বললেন 'গোত্রান্তর'। এই অভিধা যথাযথ। নৈষ্ঠিক অনুবাদকেরা মনে করেন মূলানুগত না হলে অনুবাদ ব্যর্থ; শব্দ বাক্য অলংকার অবিকৃত রাখতে হবে। মধুসূদনের উদ্দেশ্য গ্রন্থের নামেই প্রকট। ইলিয়াদের মধ্যে ব্যাপকতা আছে, তাকে সংক্ষিপ্ত করার অভিপ্রায়ে তিনি এই ব্যবস্থা নেন নি। তিনি কাহিনীর ঝোঁক বদলে দিলেন।

ইলিয়াদের বিকল্প নাম হোল 'এ্যাকিলিসের ক্রোধ।' এ্যাকিলিসের ক্রোধ নয়, হেকটারের আত্মত্যাগ মধুসূদনের মুখ্য আকর্ষণ।

মধুসূদন যে এ্যাকিলিসকে নায়ক করেন নি, তার অর্থ ব্যাখ্যা করার কোন হেতু দেখি না। এই পোড়া দেশে হেক্‌টরের মত দেশপ্রেমিকের কী মূল্য—মেঘনাদবধ কাব্যে তা বুঝিয়েও কবির ভাগ্যে ছুটি জোটে নি।

ছয় পবিচ্ছেদে মধুসূদন ইলিয়াদের বারোটি সর্গের ঘটনা জাল ছুঁয়েছেন। দেবতাদের প্রসঙ্গ যথেষ্ট কমিয়ে দিয়েছেন। দেবকাহিনীর মত হেক্‌টার ব্যতিরেক কাহিনীর বহু অংশও পরিত্যক্ত হয়েছে। আমাদের প্রবোচনা দেন যাতে আমরা উদারতর জগৎ-সম্পর্কের সঙ্গে সীমিত মানবসম্পর্ককে যাচাই করে নিই। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লেখক ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে গ্রীক পুরাণের অনেক সাদৃশ্য দেখিয়েছিলেন। শকুন্তলার প্রসঙ্গই একাধিক বার উচ্চারিত। তবে গল্প শুরু হলে ভারতীয় প্রসঙ্গে আর অবতারণ করেন নি।

এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় এর ভাষা।

বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর গদ্য রোমান্টিক গদ্য। মধুসূদন হয়ত বুঝেছিলেন এই গদ্যে ধ্রুপদী শৃঙ্খলা প্রত্যাশা করা যায় না। ইলিয়াদ ধ্রুপদী সাহিত্য; কথাবস্তু আর তার প্রকাশরীতির মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন। কাদম্বরী, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস ব্যতীত বাংলা গদ্যে ধ্রুপদী রীতির আর দৃষ্টান্ত ছিল না।

॥ ৭ ॥

১৮৭২ সন এসে পড়ল। নতুন বৎসর কোন আশাপ্রদ বার্তা নিয়ে এলো না। তবে একটি মামলা উপলক্ষে পুরুলিয়া যেতে হোল, পুরুলিয়া

সবে তখন মানভূম জেলার সদর দপ্তরে পরিণত হয়েছে। দূরাগত ব্যবহার-জীবীদের স্বর্গ তখন পুরুলিয়া।[২ক]

চুয়াড় বিদ্রোহ প্রশমিত হয়েছে, 'সিপাহী' বিদ্রোহ মিটে গেছে। পঞ্চকোট রাজ নীলমণি সিংহ দেও স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সরকারী ভাষ্য অনুসারে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

কিন্তু পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি নেই। শান্তি কি পঞ্চকোটের রাজগৃহেই আছে!

পঞ্চকোট রাজাদের বহু সম্পত্তি হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। একবার ত এক কায়স্থ কুলতিলক, নাম নীলাম্বর মিত্র, সমগ্র পঞ্চকোট সম্পত্তি নীলামে ডেকে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য কোম্পানী জঙ্গল-মহলে অশান্তির ভয়ে সে নীলাম খারিজ করে দেয়।

সম্প্রতি আর একজন ব্রাহ্মণ পত্তনিদার নীলমণি সিংহ দেওকে অপদস্থ করছে।

পত্তনীদারের নাম শারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; তিনি ইচক পরগণা পত্তনী নিয়েছিলেন মহারাজার কাছ থেকে। জেলা কোর্টে তিনি নালিশ করেছেন যে, মহারাজা তাঁর কাছ থেকে বে-আইনীভাবে ৭৪৯৪ টাকা উসুল করেছেন, তাঁকে ঐ টাকা ফেরত দিতে হবে। মামলায় নীলমণি সিংহ হেরে গেলেন। মানভূম জেলা আদালতের ডেপুটি কমিশনার রায় দিলেন যে, ঐ টাকা ফেরত দিতে হবে, এবং তৎসহ শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ দিতে হবে। মহারাজা হাইকোর্টে আপীল করলেন, পুনর্বিচার প্রার্থনা করলেন। ঘটনাটি ঘটে ১৮৭১ সনের আশ্বিন মাসে।[১০]

এই রকম ডামাডোলের বাজারে মধুসূদন পুরুলিয়ায় এসে পৌঁছুলেন—এলেন সম্পত্তি উদ্ধারের মামলায় সওয়াল করতে। পুরুলিয়া শহর ছোট্ট—মাত্র ৫৬৯৫ জন লোকের বসবাস। ১৮৬৯ সনে এখানে একটি পৌরসভা স্থাপিত হয়েছে। রেলপথ এখনও খোলা হয় নি—বরাকরে নেমে পাল্কী করে পুরুলিয়ায় আসতে হয়। রাস্তাটিও নতুন; দুই এক বৎসর পূর্বে তৈরি হয়েছে—পুরুলিয়া-বরাকর সড়ক ৪২ মাইল দীর্ঘ। এই পথে মধুসূদন এলেন।

শহর ছোট্ট; কিন্তু মামলায় মোকদ্দমায় উপছে পড়ছে। নানা জেলার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এখানে এসে জমায়েত হচ্ছেন এবং আদিবাসীদের ভূ-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হচ্ছে।



১৮৭২ সনের ফেব্রুয়ারির শীতের এক উজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে মধুসূদন পুরুলিয়ায় পৌঁছুলেন, পথে পড়েছিল পরেশনাথ পাহাড়। জৈন-তীর্থ। তার জন্য কবির স্তুতি সে পায় নি, প্রকৃতির সুন্দর অভিব্যক্তি বলে বন্দিত।

"খচিত শিলার বর্ম কুসুমে-রতনে তোমার।"

সমতল বাংলার অধিবাসী চড়াই-উতরাই-এব দেশের নিসর্গ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন। শাল-পলাশ-মহুয়ার পুষ্পসম্ভার তাঁরই খুশির মত অট্টহাসিতে ভরা। দূরে পঞ্চকোট পাহাড়শ্রেণী, তাঁরই চিরস্পর্ধাসংকুল বাসনাসমূহের মত গগনচুম্বী। তিনি বারবার প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকেন। সাগরদাঁড়ি থেকে পুরুলিয়া!

এখানকার লৌহ-মার্জিত মিষ্ট জল তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর হোল। গত সেপ্টেম্বরে ঢাকায় গিয়ে ম্যালেরিয়া বাধিয়ে এনেছিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত এখনও চলছে। প্লীহা যকৃতের অবস্থা দিন দিন সঙ্গীন। তার সঙ্গে রয়েছে অতিরিক্ত মদ্যপান। জিহ্বায় লঙ্কা ঘষলে যকৃতের সুবুদ্ধি ফেরে না।

পুরুলিয়ার আলো হাওয়া জল তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর হোল।

মামলা উপলক্ষ্যে এলেও তিনি যে মহাকবি মধুসূদন, এখবর চাপা থাকল না। পুরুলিয়ার সুধীসমাজে সাড়া পড়ে গেল। উত্তেজিত সব থেকে বেশি হলেন এখানকার খ্রীস্টীয় সমাজ।

দুই বৎসর হোল জার্মান মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—মিশনের পুরো নাম—German Evangelic Lutheran Mission. এই মিশনের অধ্যক্ষ হলেন রেবরেণ্ড এইচ. অনাশ (Onasch)। এই মিশনের সদস্য হলেন কাঙালীচবণ সিংহ ও সুধাংশুমোহন চৌধুরী। তাঁদের উৎসাহে মিশন-প্রাঙ্গণে কবিকে সংবর্ধনা দেওয়া হোল।

মধুসূদন ছিলেন ইংলণ্ডীয় চার্চেব (Anglican Church) দীক্ষিত ব্যক্তি। জার্মান মিশন হোল লুথারীয় চার্চের (Lutheran Church) অধীন। উভয়ের মধ্যে মিলের পরিমাণ বেশি। মধুসূদনের কাছে এ সব বাহ্য। ধর্ম বিষয়ে তাঁর কোন ঔৎসুক্য নেই। তবে তিনি অ-সামাজিক নন।

ঢাকার সংবর্ধনায় দেখেছি, ঢাকাবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি কবিতা উপহার দিয়েছেন। এখানেও সংবর্ধনার উত্তরে একটি কবিতা উপহার দিলেন।

অসত্যের অন্ধকারে আবৃত পুরুলিয়ায় খ্রীস্টীয় মিশন জ্ঞানের প্রদীপ

জালিয়েছে। অজ্ঞতার লীলাসরোবরে ফুটেছে শত শত জ্ঞানের পদ্ম। তার সুবাসে আকাশবাতাস গন্ধময়; এবং এ সবই ঘটেছে প্রভুর অনুগ্রহে। মিশনারীদের আনুকূল্যে অধঃপতিত পুরুলিয়া আজ বঙ্গসমাজে সমাদর লাভ করেছে। এই সমাদর আরও বৃদ্ধি পাক্, সভ্যতার স্রোতে পুরুলিয়া আরও স্নাত হোক, এই হোল আমার প্রার্থনা।

অনুষ্ঠানের কবিতা সচরাচর যেমন হয়, এটিও তেমনি। কবির স্বভাবের সত্য পরিচয় এখানে পাওয়া যাবে না।

আদালতের কাজকর্ম শেষ হয়ে এসেছে। এবার বিদায় নেবার পালা। এমন সময় স্থানীয় খ্রীস্টীয় সমাজের পক্ষ থেকে আর একটি অনুরোধ এল। খ্রীস্টীয় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি কাঙালীচরণ সিংহের পুত্রের দীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে তাঁকে ধর্ম-পিতা (God-father) হতে হবে। প্রস্তাবটি শুনে মধুসূদন খুবই হেসেছিলেন মনে হয়।

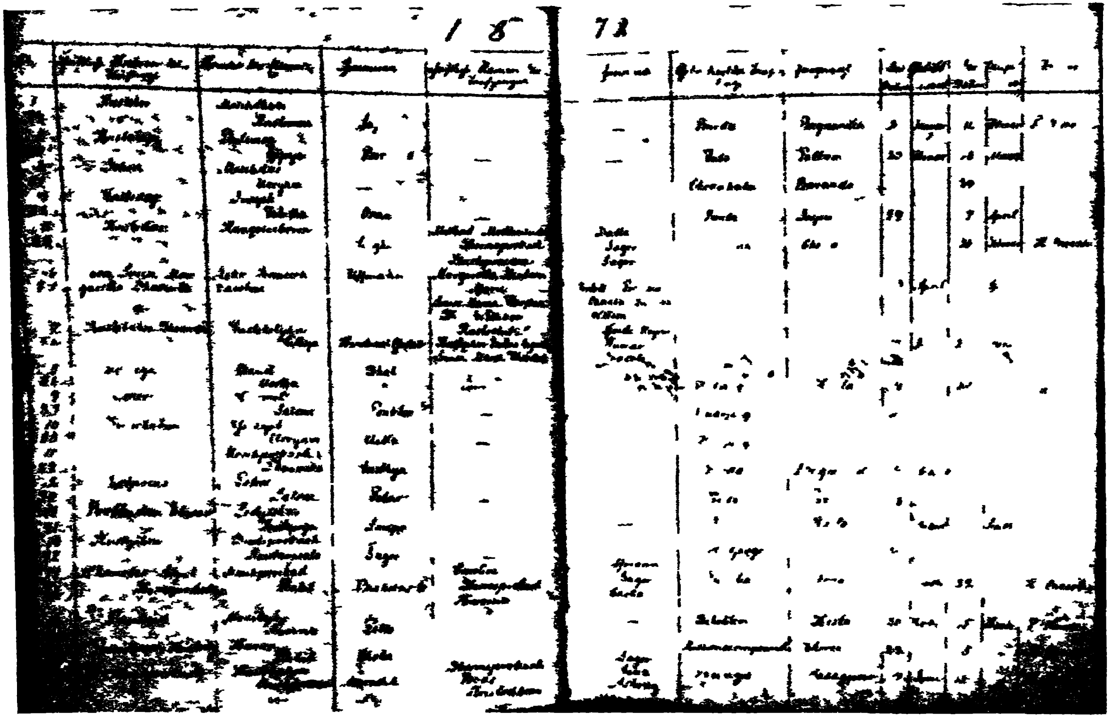
সারাজীবনে ধর্মের সঙ্গে যাঁর কোন যোগ নেই, তাঁকে হতে হোল ধর্ম-পিতা! নিজে ধর্মান্তরিত হবার ত্রিশ বৎসর পরে তিনি আবার গির্জায় ঢুকলেন। বিবাহ তো তাঁর সর্বদা অনুষ্ঠান-বর্জিত!

২৫-এ ফেব্রুয়ারির শীতের সকালে মধুসূদন গিয়ে হাজির হলেন সাহেব বাঁধের পাশে অবস্থিত জার্মান গির্জায়।

বালকটির নাম খ্রীস্টদাস নয়, কৃষ্ণদাস; দীক্ষান্তে তার নাম হয়েছিল খ্রীস্টদাস। গির্জার নথিতে মধুসূদনের নাম লেখা আছে, 'Michael Modhusudon Datta!' বানান খুবই লক্ষণীয়। গির্জার নথিতে (Register) সংখ্যা দেওয়া আছে 5/1872; তারিখ ২৫-এ ফেব্রুয়ারি; বিশপের নাম অনাশ (Onasch)।

এই উপলক্ষে মধুসূদন একটি কবিতা লিখে ফেললেন। গির্জার নথিতে এক সময়ে ঐ কবিতাটি শোভা পেত; পরে জনৈক মধু-কৌতূহলীর কৌতূহলে কবিতাটি স্থানচ্যুত হয়েছে। মানভূম বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক শ্রীশচীন্দ্রমোহন চৌধুরী বললেন, কবিতা মধুসূদন স্বহস্তে লেখেন নি, লিখেছিলেন চৌধুরী মহাশয়ের পিতামহ ৺সুধাংশুমোহন চৌধুরী।

কবি খ্রীস্টদাসকে সম্বোধন করে বললেন, বৎস, তুমি ধর্মের বর্ম প'রে জীবনস্থলে পাপরূপ রিপুকে বিনাশ করো, মাতাপিতার সঙ্গে আনন্দে জীবন যাপন করো, খ্যাতি অর্জন করো!



পুরুলিয়ার ৎজয় গড় ফ ন ব' মতুসনন

পিতৃ-দ্রোহী নাকি মধুসূদন! অথচ তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হোল এই আশীর্বাদ—

লভো নাম, আশীর্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম কুতূহলে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' মেঘনাদকে দেখেছি আদর্শ সন্তান রূপে; সে পিতৃভক্ত, মাতৃবৎসল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উনিশ শতকের দু'টি বিশেষ সদ্‌গুণ—দেশপ্রেমিকতা (শুধু বীরত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ নয়); আর একপত্নী-প্রেমিকতা। মধুসূদন উনিশ শতকের আদর্শ যুবককে একই প্রকার সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত দেখতে চেয়েছেন।

মামলা মিটে গেছে। কলকাতায় ফিরতে হবে, কলকাতা আর তাঁর আনন্দের নিকেতন নয়; অভাব-অনটনের স্থল; ঋণ-গ্রহণ ও ঋণ-পরিশোধের অবিরত তাগাদার স্থল; উপার্জনের কেন্দ্র নয়।

তবু ফিরতে হবে।

শীতের কুয়াশা তখনও পুরুলিয়া থেকে বিদায় নেয় নি। মহুয়ার ডালে তখনও আবেশ-ছড়ানো ফুল ফোটে নি, পলাশ তরু আরক্ত দেহে নৃত্যপর হয় নি; তবে তারা সবাই আত্মপ্রকাশের তাগিদ অনুভব করছিল।

জার্মান মিশনের কাছে একটি বড় বাড়ি আছে। লোকের মুখে মধুসূদন শুনেছেন এটি পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও-এর বাসাগৃহ। মামলা-মোকদ্দমা তো লেগেই থাকে। নায়েব-মহুরীদের রাজধানী কাশীপুর থেকে পুরুলিয়া জেলা শহরে হরদম ছুটোছুটি করতে হয়। পঞ্চকোট রাজের শহরে বাঁধা উকিল আছে; তাঁর সঙ্গে শলাপরামর্শ দরকার। অতএব এই আস্তানা।

নীলমণি সিংহ ১৮৫৭ সনে 'সিপাহী' হাঙ্গামার সময় ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করায় বন্দী হয়েছিলেন। দু'বৎসর কলকাতায় আটক ছিলেন; 'হাঙ্গামা' মিটে গেলে তবে ছাড়া পান।

সম্প্রতি নীলমণি সিংহ আর এক ফ্যাসাদে পড়েছেন পত্তনীদার শারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে। ভদ্রলোকের সঙ্গে মামলায় তিনি জেলা আদালতে হেরে গেছেন।

এমন সময়ে নীলমণি সিংহ শুনলেন যে, কলকাতা থেকে এক বড ব্যারিস্টার এসেছেন পুরুলিয়ায়, একটি বড মামলায় বাদী পক্ষের কৌঁশুলি হয়ে।

আরও শুনেছেন ভদ্রলোক শুধু নামী ব্যারিস্টার নন, বাঙ্গালী ব্যারিস্টার নন, বাঙ্গালী কবি—তাঁর কালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। মহারাজা নীলমণির কন্যা চন্দ্রকুমারীও কবি ; তিনি ঝুমুর গান লেখেন, যে গানের বিষয়বস্তু হোল ভাদুলীলা। (পরিশিষ্ট—দ্রষ্টব্য) মানভূম-সিংভূমের বিস্তৃত এলাকায় এই চন্দ্রকুমারীই ভাদুরানী বলে পূজো পেয়ে আসছেন। কবির পিতা নীলমণি সিংহ কবি-ব্যারিস্টারকে দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত হলেন, রাজধানী কাশীপুরে সাদরে আমন্ত্রণ করে তাঁকে আপ্যায়িত করতে চাইলেন। নীলমণি সিংহের বার্তা বহন ক'রে তাঁর গোমস্তা বা দূত পুরুলিয়ায় এসে পৌঁছুলেন, তখন মধুসূদন কলকাতায় চলে গেছেন।

দূত ভগ্ন মনোরথ হয়ে কাশীপুরে ফিরে এল। কিন্তু নীলমণি সিংহ দমলেন না ; তিনি কলকাতায় লোক পাঠালেন। দায়িত্বশীল লোক সহ আমন্ত্রনলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হোল। এবার শুধু ভ্রমণের নিমন্ত্রণ নয়, শুধু আপ্যায়নের আহ্বান নয়। এবার আমন্ত্রণ জানালেন পঞ্চকোট রাজ্যের পরিচালন-ভার গ্রহণ করতে।

কবির বহু দিনের সাধ কোন দেশীয় নৃপতি তাঁকে সভাকবি পদে বরণ করেন।

একদিন কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা সতীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ কালে মধুসূদন বলে উঠলেন, "I see Krishna Chandra followed by Bharat Chandra."

"আপনারা ভারতচন্দ্রকে ৩০০ টাকার গাঁতি দিয়াছেন, আমাকে কি দিবেন?"

একবার বর্ধমানের মহারাজাকে তাঁব সভাকবি হবার বাসনা জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন।

না-ই বা হোল সভাকবির পদলাভ! রাজার ম্যানেজারের চাকুরী! তা-ই বা মন্দ কি। সম্প্রতি পুরুলিয়া ঘুরে এসেছেন ; শীতের পুরুলিয়া মনোরম। বসন্তের পুরুলিয়া? শাল-পলাশ-মহুয়ার বন থেকে তখন এক পাগলা হাওয়া কলকাতা অভিযানে বেরিয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু কবি সম্মত হলেন। কলকাতায় নানান ঝঞ্ঝাট। রাত্রিদিন প্রার্থী আর পাওনাদার। যাঁর নিজের অভাবের কোন সীমা নেই, তাঁর কাছে অভাব-গ্রস্তেরা আসেন। স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে।

শুধু মদ্যপান তার কারণ নয়। সারা জীবনে কোন বিশ্রাম ছিল না। চার বৎসরের মধ্যে 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'কৃষ্ণকুমারী', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ',—নয়খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়াও একাধিক অনুবাদ-গ্রন্থ। তার উপর রয়েছে চাকুরী, রয়েছে সদর আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি। বিলেতে আরও ব্যস্ত ছিলেন। বহু সময় তাঁকে অর্ধাহারে-অনাহারে অতিবাহিত করতে হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানচর্চার গতি এক মুহূর্ত শিথিল হয় নি। হরধনুও অতি-বলপ্রয়োগে ভেঙে যায়, আর মানুষের শরীর! এতদিন অপচয় বোঝা যায় নি, আজ প্রকৃতি প্রতিশোধে তৎপর।

দেহ যেমন বিদ্রোহ করছে, মনও খুব বাধ্য থাকছে না। কলকাতায় বিদ্যাসাগর আজ দূরে চলে গেছেন, গৌরদাস কর্ম-ব্যপদেশে অবিরত নানা স্থানে বসবাস করছেন, যতীন্দ্রমোহন বৈষয়িক জীবনের উন্নতির জন্য বড় তৎপর, ১৮৭১ সনে ১৭ই মার্চ ইংরেজ সরকার তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' খেতাব দিয়েছেন।[১১] একটা বিচ্ছিন্নতার ভাব তিনি অনুভব করেছিলেন—যেটুকু যোগাযোগ মনু আর উমেশের সঙ্গে।

পঞ্চকোটের প্রস্তাব নিয়ে সম্ভবত ওঁদের দুজনের সঙ্গে আলাপ করে-ছিলেন; হয়তো শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পত্নীর সঙ্গে পরামর্শের পর। চাকুরী গ্রহণ করলেন—মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি কাশীপুর গিয়ে পৌঁছুলেন। বাঁধের কোলে এক বাংলো বাড়িতে তাঁর বাসস্থান নির্ধারিত হোল।

সিংহ রাজারা পঞ্চকোট ছেড়েছেন দীর্ঘকাল। কাশীপুরে পঞ্চকোটের রাজধানী গড়েছেন নীলমণি সিংহের ঠাকুরদা। সে প্রায় একশ'-সওয়াশ' বছর পূর্বের কথা।[১২] একটি টিলার মত উঁচু জমির উপরে কাশীপুর রাজবাড়ি। চারপাশে প্রাচীর ও পরিখা। পরিখার শেষে দু'টি বৃহৎ দীঘি, ওদেশে একেই বলে বাঁধ। দীঘির চতুষ্পার্শ্বে নানা পুষ্প ও লতা।

নীলমণি সিংহ দেও পরম সমাদরে নতুন ম্যানেজারবাবুকে গ্রহণ করলেন। বাবু তো নন, পুরো সাহেব। ম্যানেজারের বেশভূষা, চালচলন দেখে নীলমণি সিংহ খুব খুশি হলেন। এপাশে পাকুড়, ওপাশে সিংভূম, কার আছে এমন ম্যানেজার! প্রায় ছয় মাস কাল মধুসূদন এখানে ছিলেন। কি ভাবে সময় কাটাতেন, সমস্যা-পীড়িত ভূ-স্বামীর সম্পত্তি কেমনভাবে তদারক করতেন, এসব আজ অনুমানের বিষয়। কাশীপুরের কোন নথিপত্র নেই,

আজ আর অনুসন্ধান করে কিছু সংগ্রহ করা যায় না। তবে তাঁকে যে আচম্বিতে চলে আসতে হয়েছিল, তার প্রমাণ তাঁর বিদায়-সঙ্গীত।

কাশীপুরে পৌঁছে তিনি একান্ত হিসাব-নিকাশ পরীক্ষায় বা আইনগত কাগজপত্রের মুসাবিদায় কাল কাটাতেন, এমন অনুমান করা যেতে পারে না। তার প্রমাণ তাঁর 'পঞ্চকোট গিরি' ও 'পঞ্চকোট রাজশ্রী' কবিতা দু'টি। পঞ্চকোট গিরি কাশীপুর থেকে দৃশ্যমান নয়; কবি রাজাদের পরিত্যক্ত রাজধানীতে গিয়ে পঞ্চকোট গিরি দেখেছিলেন।

তেয়াগি তোমায়
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌনভাব তোমার!

লক্ষ্মী স্থান ত্যাগ করেছেন, তাই রাজধানী শ্রীভ্রষ্ট। রাজার প্রতি ভালবাসা কতটা তা অনুমান করা সুসাধ্য নয়, কিন্তু স্বভাবপ্রেমিক কবি এই স্থানটিকে ভালবেসেছিলেন, এই রাজ্যটিকে ভালবেসেছিলেন। কল্পনায় কবি দেখতে পেলেন, দু'টি হাতী হাঁটু গেড়ে ব'সে শুঁড়ে শুঁড়ে ধ'রে রয়েছে রত্নকলস। কানে শুনতে পেলেন বাগ্‌দেবীর দৈববাণী—তোর ছিল বহু পুণ্যফল, হৈমবতী যেরূপে পঞ্চকোটে প্রকট, তোর কাছে সেই রূপেই তিনি দেখা দিলেন।

মধুসূদনের কাছে সুদৃশ্য নগরী হোল মানুষের সৃষ্টি-শক্তির উত্তম প্রকাশ। কবির ইচ্ছা ছিল লক্ষ্মীর কৃপায় পঞ্চকোটের লুপ্ত গরিমা আবার ফিরিয়ে আনবেন।

ভাঙ্গা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি-কুতূহলে।

ভগ্নস্বাস্থ্য মধুসূদন; তবু অমিত মানসিক শক্তির বলে রাবণের প্রতিভূরূপে দেখা দিলেন; বিধ্বস্ত লঙ্কানগরী তিনি পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের গতি তিনি ভুলে গেছেন। সে রাবণ নেই—সে লঙ্কাও আর পুনরুজ্জীবিত হতে পারে না। আজ নতুন যুগ, স্থপতি নতুন আসবে।

বিদেশীর শাসনভারে শৃঙ্খলিত ভারতের ভাগ্যবিধাতা সেদিন নতুন আর পুরাতনের মধ্যে যে সঙ্গত ভেদ, তা স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। তাই 'মধুসূদনকে বিভ্রান্ত হ'তে হয়েছিল, বিভ্রান্ত হ'তে হয়েছিল উনিশ শতকের

অপরাপর মহৎ ব্যক্তিদের মতই। নব্যযুগের দশাননেরা সামান্য এক ক্ষৌরকারের পরামর্শে ম্যানেজারকে পদচ্যুত করতেন কিনা, তা বলা কষ্ট-সাপেক্ষ। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তাঁদের মন্ত্রদাতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কালনেমি, বশিষ্ঠ নন।

• নীলমণি সিংহ সাধারণ ভূস্বামী ছিলেন না, সিপাহী হাঙ্গামার সময় ডেপুটি কমিশনার ক্যাপটেন ওকস (Oakes)-এর সঙ্গে সহযোগিতা না করার অপরাধে তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছিল। অথচ পাশের ভূস্বামী গড়জয়পুরের রাজা সহযোগিতার পথ বেছে নিয়ে দিব্যি রাজসুখ ভোগ করেছে।[১৩]

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া আদিবাসী মহলে যে-'ছাতা-পরব' অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দু'টি ছাতা পূজিত হয়—একটি গজপতির ছাতা অপরটি নীলমণি সিংহের ছাতা। গজপতি উড়িষ্যার দূর অতীতকালের নৃপতি।[১৪]

এমন এক ভূস্বামী সামান্য এক ক্ষৌরকারের পরামর্শ শুনে তাঁর ব্যারিস্টার-ম্যানেজারকে কর্মচ্যুত করবেন, একথা মনে করা যুক্তিসম্মত নয়। অন্য কোন গুরুতর কারণে তাঁকে পঞ্চকোট ত্যাগ করতে হয়েছিল।

শারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর যে মামলা হাইকোর্টে আপীল বিভাগে ঝুলছিল, তার রায় বেরুল ১৮৭২ সনের ২রা সেপ্টেম্বর। হাইকোর্ট পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দিল। রাজাকে টাকা ফেরত দিতে বলা হোল, এবং শতকরা ৬ টাকা হারে সুদও পরিশোধ করতে বলা হোল।

মধুসূদন এই মামলা সুষ্ঠু পরিচালনায় কোন ত্রুটি করেন নি। ব্যারিস্টার দিয়েছিলেন, তখনকার হাইকোর্টের সর্বাপেক্ষা কুশলী কৌঁশুলি মিঃ আর. টি. এ্যালেন (Mr. R. T. Allen); তাঁর সহকারী ছিলেন উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও ভবানীচরণ দত্ত।

বিরোধী পক্ষ শারদাপ্রসাদ উকিল নিয়োগ করেছিলেন সে যুগের ডাকসাঁইটে ব্যবহারজীবী শ্রীনাথ দাসকে; তাঁর সহকারী ছিলেন বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।[১৫]

এই মামলার রায় বের হয় ২রা সেপ্টেম্বর। আর এই সেপ্টেম্বর মাসেই মধুসূদনকে পঞ্চকোট ত্যাগ করতে হয়। এই মামলার পরাজয়ের জন্য নতুন ম্যানেজারকে দায়ী করা অস্বাভাবিক নয়। এছাড়া আরও একটি কারণ থাকতে পারে। পঞ্চকোটের উত্তরাধিকার আইন জীমূতবাহনের বিধান দ্বারা শাসিত নয়। তাঁরা দায়ভাগ নয়, মিতাক্ষরা মেনে চলেন; বিজ্ঞানেশ্বরের

বিধান অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ পুত্র সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। অন্য পুত্রেরা সামান্য কিছু অর্থ ও ভূসম্পত্তি পিতার কাছ থেকে স্নেহসূত্রে পেতেন। এর ফলে জ্ঞাতি-বিরোধ পঞ্চকোটে একটা স্থায়ী ব্যাধি। নীলমণি সিংহের সময়েও তা চাপা থাকে নি, রাজবাড়ির পাশেই 'লাল' দের বাড়ি। এই 'লালে'রা হলেন রাজ্যহীন কুমার।

ইংরেজ শাসক এই জ্ঞাতিবিরোধকে ব্যবহার করত। ১৮৭৩ সনে পুরুলিয়ায় অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হোল। নিযুক্ত হলেন রাসবিহারী লাল সিংহ ও কাশীনাথ সিংহ, নীলমণি সিংহ নন। অথচ সিংহভূমের রাজা চন্দ্রধর সিংহ দেও বাহাদুর এই 'সম্মান' পেলেন।[১৩] ইংরেজ সরকার তাঁকে ক্ষমা করতে পারে নি। মধুসূদন দত্ত এই জ্ঞাতিবিরোধের জট ছাড়াতে গিয়ে কি সন্দেহভাগী হয়েছিলেন। তাঁকে রাত্রির অন্ধকারে পালাতে হোল।

অথচ পঞ্চকোটের চাকুরী তাঁর কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল। এখানকার প্রসন্ন প্রকৃতি আর মানুষের অবারিত স্নেহ তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর ছিল। এই চাকরী তাঁকে আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেছিল, পাওনাদারদের তাগিদের হাত থেকে পরিত্রাণ করেছিল।

নতুন পরিবেশ সব সময় মধুসূদনকে নতুন কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। পঞ্চকোটের সবুজ বন, হলুদ নদী, ধূসর পাহাড়, উন্মুক্ত তরঙ্গায়িত প্রান্তর তাঁর কাছে অনেক প্রতিশ্রুতির ডালি সাজিয়ে ধরেছিল।

কিন্তু গৃহে আগুন লাগলে গৃহস্বামী উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে। তখন গৃহ ত্যাগ করাই বিবেচনার কাজ। নীলমণি সিংহের এক জ্ঞাতি-ভাই কবিকে ফাঁসি পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে রঘুনাথপুরের মধ্যদিয়ে রাঁচি রোডে তুলে দিয়ে এলেন। সেদিন রাজকন্যা কবি চন্দ্রকুমারীর মনে কি ভাব জেগেছিল, তা জানবার উপায় নেই। সুখ্যাত কবির অপমানে অখ্যাত নারীকবি নিশ্চয় স্বজন-অপমানের ব্যথা অনুভব করেছিলেন। চন্দ্রকুমারীর এই ঘটনার অল্পকাল পরেই মৃত্যু হয়। কেউ বলেন আত্মহত্যা, কেউ বলেন স্বাভাবিক মৃত্যু।

কাশীপুর থেকে কলকাতা পৌঁছুতে কবিকে দারুণ বিপত্তি ভোগ করতে হয়েছিল। অথচ যে-কবিতাটি লিখলেন, তাতে তার চিহ্নমাত্র নেই। শুধু আছে আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ। আমাদের দুঃখ এই রৌদ্রজ্বলা পুরুলিয়ার উন্মুক্ত প্রকৃতি তাঁর কাব্যে তেমন কোন দীপ্তি দিতে পারে নি, দাহিকা শক্তি জোগাতে পারে নি। সমতল বঙ্গের তিনি অধিবাসী;

রাঢ় অঞ্চলের পাহাড়, বন, প্রান্তর, নদী—সকলের অস্তিত্বের আনন্দদহে তিনি স্নান করে এলেন ; কিন্তু তাঁর উত্তর-সাধকের মত তাঁর কাব্যে মধ্য বাংলা ব্যতীত পশ্চিম বা প্রত্যন্ত বাংলার ভূগোলের উপস্থিতি তেমন থাকল না।

ফিরে এসে মধুসূদন দেখলেন হাইকোর্টে তাঁর স্থান আরও অনিশ্চিত।

নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন,
তার হতে সুখীতর অন্য কোন্ জন।
(ময়ূর ও গৌরী)

স্বপ্ন-অভ্যস্ত কবি বড বিলম্বে সত্যের স্বরূপ খুঁজে পান। পঞ্চকোট তাঁর নির্ভরতার শেষ স্তম্ভটি নড়িয়ে দিয়ে গেছে।

তাই বাঁচবার জন্য কয়েকটি শিশুপাঠ্য কবিতা লিখবেন—সেখানে আদর্শ এক ফরাসী কবি। কিন্তু লা ফঁতের রচনায় যে-বাস্তব সমালোচনা ছিল তার চিহ্ন এখানে নেই। কার সমালোচনা আর তিনি করবেন ?

বাঁচবার আর উপায় নেই। অতএব শিশুপাঠ্য কবিতা। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মদনমোহন এঁরা তো বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই-এর কল্যাণে অর্থ-স্বাচ্ছল্য ভোগ করছেন।

কলকাতায় মধুসূদন এসেছেন, এ-খবর জেনে পাওনাদারেরা তাঁকে ছেঁকে ধরল। পঞ্চকোট থেকে যে তিনি তাঁর পাওনা বেতন পর্যন্ত আনতে পারেন নি, কে শোনে সে-কথা! স্ত্রীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সামনে অনিশ্চয়তার দুস্তর মরুভূমি, সিক্ত হয় কেবল সুরায়। উপায়ান্তর না দেখে বিদ্যাসাগরকে নতুন করে ঋণের ব্যবস্থা করার জন্য অনুনয় ক'রে এক চিঠি লিখলেন। এ-চিঠির উত্তরে বিদ্যাসাগর যা লিখলেন, তার মূল্যায়ন করা কঠিন। চিঠিতে বাস্তববোধ আছে, মমতা আছে, কিন্তু নেই বিদ্যাসাগরের সেই বিদ্যাসাগর-মূর্তির উদ্ঘাটন। কেমন যেন নৈরাশ্য-পীড়িত ব্যক্তির কৈফিয়ৎ। বিদ্যাসাগর বাংলাতেই চিঠি লিখতেন, কিন্তু এ-চিঠি লিখেছেন ইংরেজীতে।

My dear Dutt.

I have tried my best and am sadly convinced that your case is an utterly hopeless one—no exertion of mine or that of anybody else who is not a moneyed man, however strenuous it may be, can save you. It is too late to mend

matters by patch works. I am very unwell and am therefore unable to write more."[১৭]

১৮৭২ সনের ৩০-এ সেপ্টেম্বর এই চিঠির রচনা তারিখ। ইংরেজীতে লিখেছেন কেন? হয়তো ভেবেছিলেন মাতৃভাষায় লিখলে আরও নিষ্ঠুর শোনাবে। কারণ প্রার্থী যে মাতৃভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

ভার্সাই থেকে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে মধু লিখেছেন, "আমি যাঁর কাছে আবেদন করছি তিনি প্রাচীন ভারতীয় ঋষির ন্যায় প্রতিভাবান ও জ্ঞানী, একজন ইংরেজের ন্যায় উৎসাহী, এবং এক বঙ্গজননীর ন্যায় হৃদয়বান।"

আজ সেই ব্যক্তি ঐ চিঠি লিখলেন। করুণাসাগরের সাগর কি শুকিয়ে গেছে? চিঠিব উত্তর-লেখকের স্বাস্থ্যও ভালো নয়, উত্তরপাড়া থেকে ফেরার পথে গাড়ি উলটে সেই যে আহত হয়েছিলেন, তার জের কিছুতেই যাচ্ছে না। আর তাছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক নানা কোন্দলে তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের মুদ্রানীতির স্তাবক নন; তাই তাঁর উপার্জনের বড় অংশ পরহিতে ব্যয়িত হোত। যদিও সেকালে বহু বাঙ্গালীর সদাশয়তা স্থিতি-স্থাপকতার চরণ ধরে কাকুতি মিনতি করত।

ঐ পত্র প্রাপ্তির পর মধুসূদনকে আর কোনদিন বিদ্যাসাগরের শরণাগত হতে দেখি না। অর্থের সম্বন্ধ ভেঙে গেল, থাকল অন্তরের সম্পর্ক।

একদিন দুপুরে স্নেহের মনু তাঁর কক্ষের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখেন সমস্ত জানালা বন্ধ ক'রে তিনি সুরা পান করছেন, একেবারে নির্জলা সুরা।

"এ কী করছেন আপনি! এ-যে আত্মহত্যা।"

"হাঁ, এ-ও একটা পদ্ধতি, একই রকম নিশ্চিত, তবে অপেক্ষাকৃত কম বেদনাদায়ক।"

এ কি পূর্ব-গৃহীত সঙ্কল্প? না অসতর্ক ব্যক্তির হঠাৎ-উচ্চারিত উক্তি?

হয় এ-প্রদীপ বুক ভ'রে আলো দেবে, না হয় নিজের বুক পুড়িয়ে যজ্ঞ শেষ করবে।

তবে কি মধুসূদন আত্মহনন ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন উপায় দেখতে পান নি?

॥ ৭ ॥

বেঙ্গল থিয়েটারের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্র ঘোষ কবির সঙ্গে দেখা করতে

গেলেন। তাঁর কাছে চাইলেন একখানা নাটক। কবির পুরু ঠোঁট দু'টিতে ছোট্ট এক টুকরা হাসি ফুটে উঠল, কৃষ্ণপক্ষের নিভন্ত চাঁদের মত।

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে"

না, দোষ আর কাকে দেবেন!

নিজ কর্ম ফলে

মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।"

আজ চিত্রাঙ্গদার ভর্ৎসনাই সত্য।

বললেন, দেব, দেব। নাটক আমার প্রথম প্রেম, শত অবহেলায় তার সব রূপ ফুটতে পারে নি। আমার রিজিয়া, আমার কৃষ্ণা, আমার পদ্মা—মেঘের আড়ালে শুভ্র তারার মত সব ক'টি লুকিয়ে আছে। তাদেরই এক দোসরকে দেখাব। দেখাব নতুন ক'রে। জীবনের নবীন অঙ্কের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে তিনি এক গল্প ফাঁদলেন। সদ্য-অর্জিত অভিজ্ঞতা এই নাটকের চারপাশ বেষ্টন ক'রে ধরল। 'মায়াকাননে'র প্রাসাদে, পাহাড়ে, অরণ্যে, প্রান্তরে পঞ্চকোট হাজির হয়েছে—শুধু স্থূলভাবে নয়, গূঢ় শরীরেও। পাহাড়, অরণ্য, আর মানুষের নির্বোধ আত্মহনন এই নাটকের ভিতরে ও বাইরে অবাধে সঞ্চরণ করছে।

'পদ্মাবতী'তে ছিল পুরাণের নবীনীকরণ, এবার নবীনের পুরাণীকরণ। আঘাতে-আঘাতে কবি বুঝেছেন, মৃত্যুর মধ্যেও অমরতার ঘোষণা থাকে। আত্মহননের মধ্যে আত্মরক্ষা। হালের ডেসডিমোনা, লিয়র, ওফেলিয়ারা আজ দূর কালের ইফিগেনিয়া, আন্টিগোনের পাশে দাঁড়িয়ে কবিকে ভরসা দিচ্ছেন। প্রশান্ত-সুন্দরের বুকে নৃত্যপরায়ণ ভয়ঙ্কর।

ভাবতে বিস্ময় হয় যে, দীর্ঘ তের বৎসর বাদে তিনি নাটক লিখছেন। মঞ্চস্থ না হওয়ার জন্য তাঁর নাটক লেখা বন্ধ হয়ে যায়। অথচ মঞ্চ বন্ধ হয় নি।

মায়াকাননে যে-পুরাণ আছে, তা নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। অর্থাৎ এ-গল্প কলিকালের গল্প, মধুসূদনের সমকালের গল্প। রাজা-উজীরেরা এসেছেন শুধু ধূম্রাবরণ সৃজনের কারণে। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে এই প্রকার ধূম্রাবরণ আছে—'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'ফাল্গুনী', বা 'মুক্তধারা'। তারা কেউই সেকালের নয়, বরং দারুণভাবে একালের।

নাট্যকার মধুসূদন রাজপুত্র অজয়ের কাছ থেকে আমাদের জেনে নিতে

বলেছেন, বর্তমান সমাজেও মধ্যযুগীয় জীবনাদর্শ কী ভীষণভাবে প্রভাবশালী! হোক না প্রভাবশালী! অজয় তার চরণে শির নোয়ায় নি। দূরের জীবন-নাটকের একটি ছত্র সসঙ্কোচে অস্ফুটধ্বনি উচ্চারণ করছে—

"The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete."

অজয়ের কবির মত এই বক্তব্য অজয়ের বক্তব্য। যৌবনের সত্য-উপলব্ধি আজ অর্থহীন স্পর্ধা ব'লে কবি অভিহিত করলেন। মানুষের মুখে এতবড অহঙ্কার কী মর্মান্তিক পরিণতি পায়! সত্য এক জীবন থেকে তুলে আর এক জীবনে আরোপ করলেন। তাই 'মায়াকানন' পিতৃদ্রোহিতার গল্প নয়, রামকথার প্রতিবাদ নয়। সামন্ততন্ত্রের বন্ধ্যা আবেষ্টনীতে 'মায়াকাননে' উদ্ঘাটিত হয়েছে ব্যক্তি-পুরুষের অপমৃত্যুর অটবী, ব্যক্তি-পুরুষের উন্মোচন-উদ্যান নয়। 'মূঢ়, কভু স্ব-ইচ্ছায় চালিত হবে না'—এই অনুশাসন পাহাড়ে-পাহাড়ে, অরণ্যে-প্রান্তরে ধ্বনিত হয়েছে। পঞ্চকোটের স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতা তাঁকে এই বোধে উপনীত হতে আরও বেশি সহায়তা করল। নীলমণি সিংহ দেও-এর বিদুষী কন্যা বিদ্যার বলে আত্মমুক্তি অর্জন করতে পারল না; হয় ভাতুরানী হয়ে শ্রদ্ধার প্রস্তরীভূত মূর্তিতে তার কৌমার্যের ব্যথিত অবসান, না হয় তাকে আত্মঘাতিনী হতে হবে। আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোষণা হোল দেবদ্রোহিতা, সমাজদ্রোহিতা।

সারাজীবন যে-যন্ত্রণায় মধুসূদন ঝলসিত হয়েছেন, 'মায়াকাননে' এসে তারই চরম দহনরূপ প্রত্যক্ষ করলেন।

'মায়াকানন' তাই যেমন তাঁর আত্ম-ইতিহাস, তেমনি সমকালের আত্ম ইতিহাস।

সোপেনহাওয়ের বলেছিলেন, মানবজীবন হোল কতিপয় দর্পের সমষ্টি, আর ট্র্যাজেডি হোল সেই দর্পের 'প্যারাবেল'। মায়াকানন হোল উনিশ শতকের নবীন যুবকের স্পর্ধার ও দর্পের 'প্যারাবেল'।

যুগের সামীপ্য-অর্জনে রাবণের মতই অজয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।

নাটকের বর্ণনায় সদ্য-পরিচিত ভূগোল ছদ্মবেশে দর্শন দিয়েছে—

"ঐ সকল পর্বতের শিরে, কত কত মেঘ নীলবর্ণ হস্তীর ন্যায় পড়ে রয়েছে। বৃক্ষে বৃক্ষে সেইরূপ ফুল সেইরূপ ফল! সেই বায়ু—সেই সুগন্ধ! (৫।২)

মনে পড়ে পঞ্চকোটের সেই বর্ণনা—

হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে
পদ্মাসন উজলিত শত রত্ন-করে,
দুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
রবির পরিধি যেন।

অজয়ের আর একটি সংলাপ উৎকলিত করছি—

"হে রাজনগরি! আজ দুই বৎসর তোমাকে নানাবিধ প্রাসাদালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছি। এমন কি যেমন পিতা, বিবাহ-সভায় আনবার পূর্বে আপন দুহিতাকে বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করে, তেমনি আমি তোমাকে করেছি।"

(৫/২)

পঞ্চকোট-গিরি বিদায় সঙ্গীতে মধুসূদন লিখেছিলেন—

ভেবেছিনু, গিরিবর। রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়া বলে,
ভাঙ্গা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি-কুতূহলে।

জীবন আর কাব্যের মধ্যে কেমন বাক্যবিনিময় হোল, তা জানলাম।

॥ ৮ ॥

কিন্তু 'মায়াকানন' লিখেও বাস্তব জগতের অস্থিরতা তিনি থামাতে পারলেন না। তাঁর চারিদিক ঘিরে শুধু বিশৃঙ্খলা (তার প্রতিশব্দ উচ্ছৃঙ্খলা নয়)। বাড়ি ভাড়া বাকি, ভৃত্যদের বেতন বাকি, আসবাবপত্রের দোকানে বাকি, মুদিখানায় বাকি, এমন কি শরাবের দোকানে বাকি।

শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে জ্বরে ভুগছেন—যকৃতের অবস্থা শোচনীয়। গলায় ঘা দেখা দিয়েছে। জিহ্বায় কোন স্বাদ নেই। হৃদযন্ত্র এইসব উপসর্গের সঙ্গে তাল রেখে অন্য তালে চলতে চাইছে।

মনুকে যে-কথা বলেছিলেন, 'হাঁ, এ-ও একটা পদ্ধতি, একই রকম নিশ্চিত, তবে অপেক্ষাকৃত কম বেদনাদায়ক।'

তবে কি সবটাই অভিমানবশত? শরীর একেবারে অচল হয়ে উঠেছে এবং কলকাতায় বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ

মুখুজ্জেকে চিঠি লিখলেন, তাঁর লাইব্রেরী গৃহে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতে চান। জয়কৃষ্ণবাবু অত্যন্ত খুসি মনে সম্মতি জানালেন।

কবি সপরিবারে উত্তরপাড়া এসে পৌঁছুলেন। কিন্তু পলিতা বাড়ালে প্রদীপের আয়ু বাড়ে না।

রাসবিহারীবাবু লিখেছেন, কবি এবার সর্বদাই ইজি-চেয়ারে চোখ বুজে বসে থাকতেন। অনুতাপের জন্য. নয় সম্ভবত, নিজেকে আরও গুটিয়ে নিচ্ছিলেন। যৌবনে লিখেছিলেন—

"Tho' ours the home of want—

I ne'er repine,"

কারণ 'তুমি' পাশে আছো।

আজ হেনরিয়েটা পাশে রয়েছেন; পারস্পরিক বিশ্বাস ও আনুগত্যের অনটন নেই। কিন্তু এত তীব্র আর্থিক অনটন সহ্য করতে পারছেন না কবি! তবে কি নোঙর মাটিতে গভীর ক'রে ফেলা নেই?

উত্তরপাড়ার গঙ্গার তীরের আকর্ষণ আছে। শুধু সেই আকর্ষণে কবি এখানে আসেন নি, এখানে পাওনাদাবদের হাত এড়ান যায়। অর্থ ব্যয় করে এত দূরে কেউ এসে আর নির্যাতন করবে না। সবাই তাঁর কাছে উত্তমর্ণ; এই পোড়া দেশে তাঁরই কেবল কারও কাছে কিছু পাওনা নেই। 'কড়াক্রান্তি' হিসাবের রেনেসাঁস কি এ-যুগের প্রকৃত রূপ? বিধবা বিবাহ করেছেন যাঁরা চাকুরীর লোভে, আর সেই পত্নীর মৃত্যু হলে যাঁরা প্রায়শ্চিত্ত করে স্ব-সমাজে স্থান লাভ করেছেন; তাঁদের সঙ্গে মধুর পৃথকধর্মিতা আছে। আর তাঁরাই যুগের সকল কুশীলব নন।[১৮]

গঙ্গার তীর, মুক্ত হাওয়া—তবু শরীর সুস্থ হ'তে চায় না; বরং উত্তরোত্তর খারাপ হ'তে লাগল।

সম্প্রতি গৌরদাস কলকাতার কাছে হাওড়ায় বদলী হয়েছেন।[১৯] বন্ধুকে দেখতে এসে তিনি কেঁদে ফেললেন। জোর করে কলকাতায় নিয়ে চললেন, অবিলম্বে সুচিকিৎসা চাই। ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়া নিরাপদ নয়, তাই বজরায় নদীপথে বাবুঘাটে গিয়ে নামলেন তাঁরা।

প্রথম যেদিন কলকাতায় এসেছিলেন সেদিন বেলেঘাটা খাল পথে এসেছিলেন। আজ সর্বশেষ কলকাতায় প্রবেশ গঙ্গাপথে।

কলকাতায় এসে দেখা গেল স্ত্রী হেনরিয়েটাও দারুণ অসুস্থা। মনোমোহন,

উমেশচন্দ্র উদ্যোগী হয়ে কলকাতার সেরা হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন কবিকে। ১৮৭৩ সনের জুন মাসে ২০।২১ তারিখে। হাসপাতালের নাম জেনারেল হসপিট্যাল।

অসুস্থা হেনরিয়েটা রইলেন জামাতার গৃহে। মৃত্যুর জন্য তাঁকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হোল না—২৬-এ জুন পুত্রকন্যা জামাতার মায়া কাটিয়ে তিনি পরপারে পাড়ি দিলেন ; তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৯ বৎসর। যেতে কি আর তিনি চেয়েছিলেন—কারণ ঐ বেহিসাবী অনাচারী লোকটিকে তিনি ভালবাসতেন। আর তা এক তরফা নয়। এই কবিতা ছিল তাঁর বীজ মন্ত্র।

দূরে কি নিকটে

যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে।

*　　　　*

প্রেমের প্রতিমা তুমি আলোক আঁধারে।

অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—

সতত সঙ্গিনী মোর সংসার মাঝারে।”

এমন লোকের সঙ্গ কি কেউ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ? “She forgot everything, as she stood by his side, as she looked upto his face, the face of the idol of her heart, the idol she adored and worshipped with all the fondness of womanhood”.

মৃত্যুর দু’দিন পূর্বে তিনি বলেছিলেন “আমাকে ছাড়িয়া উহাকে দেখুন, উহার শুশ্রূষা ও যত্ন করুন, আমি মরিতে ভয় করি না।” কোন্ শক্তি তাঁকে এই অভয় মন্ত্র দিয়েছিল ? মরতে তাঁর স্বামীও ভয় করেন নি। হাসপাতালে মাত্র আট দিন ছিলেন। সেই আট দিন হাসপাতালে সেবারতা পরিচারিকাকে পুরস্কৃত করার জন্য আটটি টাকাও তিনি চেয়েচিন্তে যোগাড় করেছিলেন। দিতে তিনি ভালবাসতেন। ভাই-পো ত্রৈলোক্যমোহন দেখা করতে এলে অতীত জীবন নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেন। জীবনের সর্বোত্তম পর্বে লিখেছিলেন—

যশোলাভ লোভে আয়ু　　কত যে ব্যয়িলি হায়

কব তা কাহারে।

‘বড় কবি হতে হবে’ এই ইচ্ছার বদলে যদি সেদিন বলতে পারতেন, “বড় উকিল হব” তাহলে আজ রাজনারায়ণের ঐতিহ্য রক্ষিত হোত! যশের

৪. চতুষ্কোণ—মধুসূদন-সংখ্যা, ১৯৭২, নীলদর্পণ নাটকের অনুবাদ ও মধুসূদন সম্বন্ধে শ্রীতপোবিজয় ঘোষের প্রবন্ধ।

৫. মধুসূদন দত্ত—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃঃ ৮৭।

৬. Calcutta Gazette—2nd September, 1871.

৬ক. Unpublished Records of the Hindu College, 1848. A Letter from D. N. Tagore to Russomoy Dutt, Secretary of the Hindu College.

৭. মধু-স্মৃতি—পৃঃ ৪৯৫।

৭ক. High Court Records—Original Section. Gopee Kissen Gossain Vs. Nundalal Sien—(6312)-1868.

৮. মধু স্মৃতি—পরিশিষ্ট। পৃঃ ৬২৫-৬২৬।

৮ক. মধুসূদন দত্ত—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৮৮। ১৮৭০ সনে ৩০ জুলাই হাইকোর্টের ছয়জন জজের স্বাক্ষরিত এক আদেশনামা থেকে অনুমান হয় যে, এই পদে কাজের পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হোত, কোনরূপ বাঁধা মাহিনা ছিল না। Gazette of India, 30 July, 1870.

৯. এডুকেশন গেজেট, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৭১; ঢাকার হরিশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'হিন্দু হিতৈষিণী' থেকে উদ্ধৃত।

১০. Law Observer, 1873.

১১. Gazette of India, 17 March, 1871. যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৭০ সনে বাংলার লাটসাহেবের শাসন পরিষদের সদস্য হন, সেই বিতর্কিত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালও সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। Calcutta Gazette—9 April, 1870.

১২. Bengal District Gazetteers—Manbhum. Vol. 28. H. Coupland, I.C.S. 1911.

১৩ ঐ পৃঃ ৬৬।

১৪. বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃঃ ১২৬।

১৫. Law Observer, 1873.

১৬. Gazette of India—Notification, 1 January, 1873.

১৭. বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার। ৩য় সংস্করণ। পৃঃ ৩৪২-৩৪৩। বিদ্যাসাগর চরিত —চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ষ্ঠ সংস্করণ। পৃঃ ৪৮১।

১৮. মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়—অমলেন্দু দে। ১৯৬৫; পৃঃ ৯।

১৯. Gazette of India—1 January, 1873.

পরিশিষ্ট—১

আজ থেকে পনের বৎসর পূর্বে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মধুসূদনের বিবাহ বিষয়ে মাদ্রাজে খোঁজ করেছিলেন। এ বিষয়ে মাদ্রাজ মিশনের চিঠি এখানে উদ্ধৃত হোল।

The Diocesan Office,
Post Box No. 702
Cathedral P.O.
Madras-6.

Dear Sir,

The information you ask for is unfortunately not available with us. The relevant papers may have been among those destroyed during the 'Evacuation'.

Yours faithfully,
Sd/- G. S. Fraderich
P. A. to the Bishop in
Madras

D. N. Ghosh, Esq.,
Professor
13/1, Ritchie Road,
Calcutta-16.

[মাইকেল-জীবনীর আদি পর্ব—ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃঃ ১৫৪ ।]

Mussalmans in India.

Allison has written nothing to excell the foregoing passage and the history of Akbar like the history of great Sovereigns, represents him as endowed with lofty virtues and, but disgraced by enormous vices. Such was the chracter of Alexander, of Hannibal, of Caeser among the ancients,—such that of Constantine the Great, of Frederick the Great, of Napoleon the Great—among the moderns. Soloman, the wisest man was a disgrace to humanity. Was George the Fourth any better? Turn to the history of England, was there a monarch more infamous than the Eighth Henry or more bloody than his daughter, Mary? India under the Moslem rule was more prosperous than the Leadenhall rule. Sir Charles may disguise the fact, but history is against him. Again, going back to a period anteriar to the incursious of the followers of the Prophet of Mecca, what do we read? Of the governing powers of India before the Mussalman incursious and conquests, we know little indeed, but from the genius and disposition of the people, we are led to conclude that their sway was sufficiently mild and tolerable and perhaps the best suited to the time, and condition of the people and country. .There can be no doubt of this, and has such a thing as railways been known in those days, the whole country would have been intersected by them, for, see the stupendous temples and magnificent artificial lakes bequeathed to posterity by the ancient sovereigns of India! Here we have a railway that has been under incubation for the last fifteen years, and although it has been received the sanction of the Home Government, the local agents are sleeping over!

(—Circulator, 29 July, Quoted in Madras Examiner, 2 August, 1853.)

উত্তর-পূর্ব ভারতীয় সাহিত্যে মধুসূদন

॥ ১ ॥

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার অন্য নাম মধুসূদন। ভারতীয় সাহিত্যে তিনি প্রায় সমমর্যাদার অধিকারী।

ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে মনুষ্যত্বের অবমাননা নির্বিচারে চলেছিল। গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, সতীদাহ, বহুবিবাহ, অকালবৈধব্য, শিশুবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথা ভারতীয় সমাজ-জীবনের প্রাণরস শুষে নিচ্ছিল। নব্য দর্শন-চিন্তায় ও সমাজ-সংস্কারে মহাত্মা রামমোহন রায় প্রভৃতি সরব হয়েছিলেন। কিন্তু কাব্যের জগতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার প্রতিধ্বনি হোল বিলম্বে। রামমোহনের তিরোভাবের ত্রিশ বৎসরের পর সাহিত্যজগতে মধুসূদনের আবির্ভাব। মানবিকতা, সম-অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, ও গণতন্ত্রের মন্ত্র তিনি শোনালেন। দুর্দান্ত তেজের সঙ্গে। পরবর্তী বাংলা কাব্যকে নতুন পথে চলতে আর ইতস্তত করতে হয় নি।

যাঁরা তাঁর সমসাময়িক, তাঁরা অনেকে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু চলার ভঙ্গি নকল করেছেন।

'বৃত্র সংহারে'র কবি ও 'পলাশী যুদ্ধে'র কবি উভয়েই মধুসূদনের ছায়ায় বয়স্ক হয়েছেন। তাঁদের সাহিত্যে সর্বত্র মধুসূদন অধিষ্ঠিত।

কিন্তু গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলেন ঈশ্বর গুপ্তের ছত্রছায়ায়; অনুজকল্প রঙ্গলালও তাই। মহেশচন্দ্র শর্মা তাঁর 'নিবাতকবচ বধ' কাব্যে (১৮৬৯) সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র অনুসরণ করলেও দৈত্যজীবনীকে ঘৃণা করেন নি। এর পিছনে আছে মধুসূদনের প্রভাব। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'শক্তি-সম্ভব কাব্যে'র (১৮৭০) নামকরণ থেকেই মধুর অনুসরণ। দীননাথ ধর মধুসূদনের একান্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। যদিও 'কংসবিনাশ কাব্যে' (১৮৬১) তিনি পয়ার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু নামধাতু ব্যবহারের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন নি।

অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অভিমন্যুবধ' (১৮৬৮) লিখলেন; অভিমন্যু চিরকালই সহানুভূতির পাত্র। কিন্তু নায়ক হবার অধিকার ঐ বালকবীর

এই প্রথম অর্জন করল। অপ্রধান বা অবহেলিত যুবক মধুসূদনের আদর্শে আদৃত হয়েছে।

শুধু 'মহাকাব্য' রচনার হিড়িকে মধুর প্রভাব লক্ষ্যগোচর নয়, নানা 'বিলাপ' কাব্যে মধুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধা বিলাপ' (১৮৭২) ও 'বঙ্গাঙ্গনা' (১৮৭৬) কাব্যদ্বয়ে মধুর দুই 'অঙ্গনা' কাব্যের প্রভাব থাকল।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র 'কীচকবধ কাব্য' (১৮৬১) লিখেছেন, আবার 'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা' (১৮৬৩) ও 'নির্বাসিত সীতা' লিখেছেন। এ দু'টিও 'অঙ্গনা'-কাব্যের সমগোত্রীয়। অনাথবন্ধু রায় লিখেছেন 'বৈদেহীবৈধব্য কাব্য' (১৮৭৩)। এই নারী-সহানুভূতির জগৎ মধুসূদন তৈরি করেছেন।

মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'ও বাঙ্গালী কবিদের প্রভাবিত করেছে। রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ রায় নানাভাবে ঐ কাব্যরীতি ব্যবহার করেছেন। অক্ষয় বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথ সেন ঐ প্রভাব থেকে বাইরে থাকতে পারেন নি, যদিও তাঁরা উভয়ে ছিলেন মানসিকতার দিক থেকে বিহারীলাল-শিষ্য। অক্ষয় বড়ালের নারীস্তুতি শুধু বিহারীলালের ইসারায় নয়, মধুসূদনও তাঁর পথ-নির্দেশক। মধুসূদন তাঁর রচনা-রীতিতেও আছেন। তাঁর 'প্রদীপ' কাব্যের (১৮৮৪) শব্দ-যোজনায় ও স্তবক-নির্মিতিতে মধুসূদন তাঁর লেখনী নিয়ন্ত্রিত করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'ফুলবালা' (১৮৮০) ও 'ঊর্মিলা' (১৮৮১) কাব্য দু'খানির শব্দ-নির্বাচনে ও স্তবক-রচনায় মধুসূদন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছেন। প্রথম কাব্যে তাঁর ব্রজাঙ্গনা ও দ্বিতীয় কাব্যে তাঁর বীরাঙ্গনা প্রভাব ফেলেছে। মধুসূদনের প্রভাব গৌড়দেশের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মধুচক্রের রস আস্বাদনে উত্তর-পূর্ব ভারতের সকল কাব্য-প্রেমিকদের আগ্রহ দেখতে পাই।

॥ ২ ॥

উত্তর-ভারতের নানা নবীন সাহিত্যে 'বধ'-কাব্যের সংখ্যাবাহুল্য এর প্রমাণ। এই 'বধ'-কাব্য নবীন কাব্য ও জীবন-চেতনার সঙ্গে জড়িত। আধুনিক-পূর্ব ভারতীয় কাব্যে সব আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি ছিল মিলনে—হয় ইহলোকে, না হয় পরলোকে। যেহেতু বর্ণিত বীর বা নায়কেরা ছিলেন সর্বদা শাপভ্রষ্ট। কাব্যের পরিণতি অবিমিশ্র মৃত্যুতে পৌঁছালে, তার দেব

ভাগ পরিত্যক্ত হয়। মৃত্যুতে আমরা শোক করি মানুষের জন্য, দেবতার বা অপ-দেবতার জন্য কোন শোক করি না, কারণ তাঁদের কোন মৃত্যু নেই। মধুসূদনের প্রভাবে মৃত্যু এই প্রথম মর্মান্তিক হোল। নারীর মূল্য সমাজে নাই বা থাকুক, কাব্যে আজ মর্যাদা পেল। আর দেবতা ব্যতীত অন্য স্তর থেকে নায়ক-নায়িকা নির্বাচন করা সুসম্ভব হোল ; গণতন্ত্রীকরণ শুরু হোল। এতাঁবৎ অল্লাদৃত বা অনাদৃত চরিত্র আজ নায়কের মর্যাদা পেল। তারা সাধারণ কুশীলব না থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠল। তারা যেমন বীর বা বিশ্বাসঘাতক বলে বিদিত হোল, তেমনি তারা কেউ পিতা, কেউ খুড়ো, কেউ পুত্র, কেউ স্বামী, কেউ ভ্রাতা বলে স্বীকৃতি পেল। রাজসিক পরিচয়ের বর্ণাঢ্য উত্তরীয়খানি ত্যাগ ক'রে তারা আমাদের অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় একান্ত কাছের মানুষের মত হাজির হোল।

ইংরেজ শাসনের দাবি মেটাতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হোল। অন্য প্রদেশেও ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রাদুর্ভাব হোল। তাঁরা নতুন সাহিত্য চাইছিলেন, যেমন নতুন সমাজ তাঁরা গড়ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ, প্রার্থনা-সমাজ সর্বত্রই গড়ে উঠছিল। এঁদের কাছে মধুসূদনের সাহিত্য জীবনের সঙ্গে সমমনস্কতা এনে দিল।

হিন্দী সাহিত্যের নবীন যুগ শুরু হয়েছে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-১৮৮৫) থেকে। বারাণসী থেকে কলকাতা পর্যন্ত রেলপথের প্রসার হলে একদা তিনি কলকাতায় এলেন এবং কলকাতার কাব্য-নাটক আস্বাদ করে পরিতৃপ্ত হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। তিনি নতুন নাটক লিখলেন, বোম্বাই-এর আদর্শে নয়, কলকাতার আদর্শে, এ-খবর তিনি আত্মকথায় বিনা দ্বিধায় বলেছেন। তিনি 'ম্যাকবেথে'র অনুসরণ করে 'নীলদেবী' নামে এক নাটক রচনা করেছিলেন। নাটক যেমন নতুন ঠাট নিল, কাব্যও তেমন। অম্বিকা দত্ত ব্যাস (১৮৫৮-১৯০০) সম্ভবত হিন্দীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। ছন্দের মত তিনি বিষয়েও নবীনত্ব এনেছেন। তাঁর কাব্যের নাম 'কংসবধ' কাব্য। কংস এই কাব্যে নিন্দিত নন ; তাঁর শৌর্য-বীর্য সবিস্তারে উল্লিখিত।

কবি অযোধ্যা সিং উপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৩৮) 'হরিঔধ' ও 'প্রিয় প্রবাস' নামে দু'খানি কাব্য লিখেছিলেন। পড়লে মনে হবে কবি হয়তো ভক্তের চোখে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ বলছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, এই দৃষ্টি

বৈষ্ণব রসসাহিত্য অনুমোদিত নয়। মধুসূদনের রাধা বিষয়ক পদাবলীর প্রতিধ্বনি এখানে। কবি অযোধ্যা সিংহ তাঁর কাব্যের নাম 'ব্রজাঙ্গনা বিলাপ' রাখতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত প্রত্যক্ষ মাইকেল-প্রভাব স্বীকার করতে বিবেকে বেধেছিল; তাই ঐ কাব্যের নাম হোল 'প্রিয়-প্রবাস'। অমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, যদিও তার মূল আঙ্গিক তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি; তাঁর অমিত্রাক্ষর শুধু মিলহীন, প্রবহমান নয়।

মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী (১৮৭০-১৯৩৮) তাঁর 'সরস্বতী' নামক পত্রিকায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের পক্ষে তীব্র প্রচার করেছেন; সম্পাদক হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন কাব্যের বিষয় পরিবর্তিত হয়ে গেছে, কাব্যের ভাষা ও ছন্দ সমান তালে পা না মেলালে ছন্দোপতন (শব্দপতনও বটে) ঘটবে। কবি জয়শংকর প্রসাদ (১৮৮৯-১৯৩৭) কাব্য ও নাটক উভয় ক্ষেত্রে আধুনিকতার উৎসাহদাতা হয়েছেন। তাঁর 'ভারত' কাব্যের বিষয়ে নবীনতা আছে; ছন্দেও নবীনতা। তাঁর নাটক 'করুণালয়'ও আধুনিক ভাব সমৃদ্ধ। দু'খানি গ্রন্থেই অমিত্রাক্ষর ব্যবহৃত, যদিও তিনি মাত্রাগত সৌষম্য রক্ষা কবতে পারেন নি।

হিন্দী সাহিত্যে মাইকেলের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেন কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৬৪)। তিনি মধুসূদনের কাব্য হিন্দীতে অনুবাদ করার জন্য স্বয়ং 'মধুপ' ছদ্মনাম পর্যন্ত ধারণ করেন। মধুচক্রের ভাগীদার তাই শুধু গৌড়জন নয়। তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ১০২৭ সনে অনুবাদ করেন। অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি একটি বিপত্তির সম্মুখীন হলেন। তিনি দেখলেন, চতুর্দশ অক্ষরে বা চোদ্দ মাত্রায় হিন্দী অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাঁধন তৈরি করা যাচ্ছে না। হিন্দীতে বিভক্তিচিহ্ন শব্দের মধ্যে নয়, শব্দের গায়ে বসে। তাই তিনি এক মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন।

ডাঃ রামবহাল সিংহ তেওয়ারীর মতে, "বাংলা অর্ধকলাবৃত্ত রীতির পয়ার বন্ধের মতো হিন্দী অর্ধকলাবৃত্ত রীতি বা ঘনাক্ষরীর ১৫ মাত্রার পংক্তি বন্ধে তিনি প্রবাহ এনেছেন।" (চতুষ্কোণ, মধুসূদন সংখ্যা, ১৯৭২, পৃঃ ২১৩)। মৈথিলীশরণ নিজে যখন মৌলিক মহাকাব্য লিখলেন, তখন তিনিও মধুসূদনের রীতি মেনে চলেন নি। তাঁর 'সাকেত' মহাকাব্যে রামায়ণের কাহিনী বিশেষ বর্ণিত হয়েছে; এ-ব্যাপারে মধুসূদন তাঁর আদর্শ। কিন্তু প্রতি সর্গে তিনি পৃথক পৃথক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এমন কি, সংস্কৃত শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ পর্যন্ত তিনি আমন্ত্রণ করেছেন। বিষয়ের সঙ্গে ছন্দ ও ভাষার একাত্মতা

থাকল না। মৈথিলীশরণ 'জয়দ্রথবধ কাব্য'ও লিখেছেন নতুন কাব্য আদর্শ অনুসরণে।

তাঁর মত আরো অনেকে 'বীর'-জীবনী অবলম্বনে কাব্য লিখেছেন—হরদয়াল সিংহের 'রাবণ' ও 'দৈত্যবংশ', লছমী নারায়ণ মিশ্রের 'সেনাপতি কর্ণ', দিনকরের 'কুরুক্ষেত্র', জগদীশ নারায়ণ তেওয়ারীর 'দুর্যোধন বধ', রামচন্দ্র শুক্লের 'অভিমন্যু বধ', শ্যামলাল পাঠকের 'কংসবধ'। কোন কোন কাব্যের অবলম্বন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তবে তাঁদের ছন্দোকুশলতা মৈথিলী-শরণের সমপর্যায়ে পৌঁছুতে পারে নি।

পরবর্তী যুগে হিন্দী কবিরা অমিত্রাক্ষর ছন্দ সমিল ব্যবহার করতে শুরু করলেন। কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা—১৮৯৬-১৯৫১) ও কবি সুমিত্রানন্দন পন্থ (১৯০০-) এই সমিল প্রবহমান ছন্দ ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন। হিন্দী সাহিত্যে সনেটও মধুসূদনের আদর্শে রচিত হয়েছে।

॥ ৩ ॥

আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যে আধুনিকতা দেখা দিয়েছে উনিশ শতকের শেষ ধাপে। বঙ্গ-বিহার-ওড়িষ্যার শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্র ছিল কলকাতা; ওড়িষ্যার উপর বাংলাদেশের প্রভাব আরও ব্যাপক ছিল। অবশ্য তার সব প্রসঙ্গ শুভ বা সঙ্গত নয়। বাঙ্গালী আমলা ও বাঙ্গালী জমিদার উভয়ে মিলে ওড়িষ্যার শিক্ষার মাধ্যম বাংলাভাষা করার অপচেষ্টা করে। স্বভাবত এই উদ্যোগ ওড়িয়া শিক্ষিতসমাজ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। আজ একশত বৎসর পরে ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে ব'সে ওড়িয়ার মান্য লেখক শ্রীমায়াধর মানসিংহ অনুযোগ প্রকাশ করেছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃতবিদ্য ওড়িয়া সন্তান কলকাতায় শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের অনেকের মাতৃভাষার স্থলে বাংলাকে 'vernacular' রূপে পড়তে হয়েছিল। তার ফল যাই হোক, বাংলা সাহিত্যের নবীনতার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল। মায়াধর মানসিংহ তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে ওড়িয়ার উপর কোন বাঙ্গালী কবির প্রভাবের কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করেন নি।

মায়াধর উচ্চারণ না করুন, ওড়িয়া কাব্য ও নাটক সে কথা চেপে রাখতে পারে নি।

রাধানাথ রায় (১৮৪৮), মধুসূদন রাও (১৮৫৩), চিন্তামণি মোহান্তি, গদাধর মেহের-সবার সাহিত্যে মধুনিরপেক্ষ সাহিত্যবোধ ফুটে ওঠে।

ফুটে ওঠে 'বধ' কাব্য; নবীন 'বীর'দের সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাব। ধিক্কৃত বীর অনেক সহানুভূতি কুড়িয়ে নিল। লাঞ্ছিত নারীচরিত্র কাব্যের নায়িকা রূপে দেখা দিল। রাধানাথ রায় 'দুর্যোধনের রক্তনদী সন্তরণ'; 'বাণ-হরণ', গদাধর মেহের রচিত 'কীচক বধ', 'তপস্বিনী' মাইকেল-স্বীকৃতির চিহ্ন বহন করে এসেছে।

হরিহর রায় লিখেছেন 'রাবণবধ কাব্য', যে-কাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অনুসরণে লেখা।

ওড়িয়া সাহিত্যে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র আদর্শে চিন্তামণি মোহান্তি লিখেছেন 'সপ্তসতী' কাব্য।

সম্ভবত বাধানাথ রায়ের 'মহাযাত্রা' মহাকাব্যে মাইকেল অনুসরণ সর্বাপেক্ষা সার্থকতার সঙ্গে নিষ্পন্ন হয়েছে। রাধানাথ তাঁর কাব্য ত্রিশটি সর্গে শেষ করতে চেয়েছিলেন। পৌরাণিক আখ্যান বস্তুর অন্তরে তিনি তাঁর স্বকালের কথা প্রতিবিম্বিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাব্যে ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রসঙ্গ অত্যন্ত সোচ্চার হয়ে ওঠায় তিনি মাত্র সাতটি সর্গ প্রকাশ করেন।

কবি রাধানাথের বাহন হোল অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাঁর হাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ চোদ্দ মাত্রাতে সম্পূর্ণ। হিন্দী অমিত্রাক্ষরের ন্যায় এক মাত্রা তাঁকে বেশি দিতে হয় নি। ওড়িয়া ভাষায় বিভক্তি ব্যবহারের রীতি এ-বিষয়ে আনুকূল্য করেছিল কি?

একই প্রকার চিত্র দেখতে পাই অসমীয়া সাহিত্যে। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার মতে "অসমত বঙালী ভাষা প্রবর্তনর ফলতেই বঙালী সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুবিধা লাভ করিছিল।" তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজী সাহিত্য-পাঠের অভিজ্ঞতা। "এই দ্বৈত প্রভাবর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হৈ শিক্ষিত ডেকাসকলে সৃষ্টি-ধর্মী সাহিত্যর রচনা করিবলৈ প্রয়াস করে।"

বাংলা ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার ফলে অসমীয়া ভাষায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' কেউ অনুবাদ করার প্ররোজন বোধ করেন নি।

অসমীয়া সাহিত্যে এই সময়ে স্বদেশানুরাগ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ দেখা যায়। জাতীয় অধঃপতনের জন্য আক্ষেপও শোনা যেতে লাগল।

রমাকান্ত চৌধুরী ও ভোলানাথ দাসকে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের স্রষ্টা বলা হয়েছে।

রমাকান্ত চৌধুরী (১৮৪৬-১৮৮৯) 'বধ' কাব্য রচনা করে নতুন যুগের সূচনা করলেন। তাঁর 'অভিমন্যু বধ' কাব্যে, অভিমন্যু ও উত্তরা, যথাক্রমে ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার আদর্শে রচিত। অমিত্রাক্ষর ছন্দেই রচিত। তিনি নাটকেও আধুনিকতার সূত্রপাত করেন; তাঁর 'সীতা হরণ' নাটক অসমীয়া অংকীয়া নাটকের সমজাতীয় নয়। ভোলানাথ দাস (১৮৫৮-১৯২৯) কলকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্র ছিলেন। মধুসূদনের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে তিনি কলকাতায় আসেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আদর্শে এবং প্রায় একই বিষয় নিয়ে তিনি 'সীতাহরণ কাব্য' রচনা করেন। 'সীতাহরণ কাব্যে'র প্রস্তাবনায় তিনি তাঁর পথপ্রদর্শক কবি মধুসূদনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

সেই রামায়ণ গীত,
গাইবে বাঞ্ছিছো আমি মূঢ় আকিঞ্চন,
অমিত্র-অক্ষর ছন্দে, হে মাতঃ বাগ্দেবী।
যি ছন্দে গাইলা বহু মধুময় গীত
তব অনুগ্রহে অতি প্রিয়পুত্র তব
শ্রীমধুসূদন বঙ্গকবিকুলমণি।

ড. বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া এ-কাব্যকে প্রথম অসমীয়া মহাকাব্য বলেছেন; এ-কাব্যের উপর মধুসূদনের প্রভাব সম্বন্ধে ডঃ বরুয়া ও ডঃ শর্মা ঐক্যমত হয়েছেন। (শর্মা—অসমীয়া সাহিত্যর ইতিবৃত্ত। পৃ-২৩১; বরুয়া—A History of Assamese Literature. p-15)

ভোলানাথ দাস তাঁর কাব্যে বহুল অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন; নামধাতুও ব্যবহার করেছেন। সমালোচকদের কেউ কেউ মনে করেছেন, এর ফলে ভাষা কিঞ্চিৎ কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। শুধু আখ্যান-কাব্য বা মহাকাব্য রচনায় নয়, অন্যবিধ কাব্যরচনাতে মধুসূদনের প্রভাব সমানভাবে দেখা যায়।

হিতেশ্বর বরবরুয়া (১৮৭১-১৯০৯) লিখিত দু'খানি কাব্যে মধুসূদনের

প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কামতাপুরধ্বংস কাব্য (১৯১২) অনেকটা 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র লঙ্কা অবরোধের আদর্শে কল্পিত। 'বিরহিণীবিলাপ' কাব্য "মাইকেল মধুসূদন দত্তর ব্রজাঙ্গনা কাব্যর অহিত রচনা করা যেন লাগে।" (শর্মা ; পৃঃ ২৫২) কামতাপুরধ্বংস কাব্য ১৫ সর্গে সম্পূর্ণ ; অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। চোদ্দ মাত্রার পয়ারে ৮+৬ পর্ব বিভাগও মেনে চলা হয়েছে।

নহওঁ মালীয়া আই ! নাজানোঁ গাঁথিব
ভালকই মালা মই,—নাজানোঁ গাঁথনী
মনপ্রাণ মুগ্ধকর। তুমি দয়া করি
শিকাই দিয়াছেঁ, আই ! মুই যাঁও গাঁথি।
গাঁথিম নতুন মালা, যদি কৃপা করা
তুমি আজ অধমক। কঁও সকাতরে,—
করাঁ মাতৃ ! কৃপা সোকো—মোকো সি চিকুরে
চোঁরা—চালা যি চকুরে কবিকুলগুরু
বাল্মীকিক, আরু মাতৃ, চাদি, হাফেজক।

ঋণ স্বীকার তিনি আরও অনেকের কাছে করেছেন কালিদাস, চেক্সপীর ; কিন্তু যাঁর কাছে ঋণ সর্বাধিক, তাঁর নাম উল্লেখ করাও প্রয়োজন বোধ করেন নি।

হিতেশ্বরের 'বিরহিণীবিলাপ' মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র আদর্শে রচিত। 'বিরহিণীবিলাপ' কাব্য শুরু হয়েছে জয়দেবের উদ্ধৃতি দিয়ে। অথচ 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধিকার মত এখানেও বিরহিণী নায়িকা মেঘ, সূর্য, পাখি প্রভৃতি দেখে বিলাপ করেছেন। ছন্দে ও স্তবক-নির্মিতিতে মধুসূদনের প্রত্যক্ষ অনুসরণ আছে।

হিতেশ্বর বরবরুয়া 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র আদর্শে ২১টি কবিতা লিখে ২১ জন শোক সন্তপ্তা নারীর আলেখ্য রচনা করেছিলেন। অসমীয়া ভাষায় তিনি 'চনেটে'রও অন্যতম লেখক।

বরবরুয়া অসমীয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম সার্থক শিল্পী। "এঁওর লেখনীত অমিত্রাক্ষর ছন্দই নিভাঁজ অসমীয়া রূপত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।" (শর্মা—পৃঃ ২৫৩)

কবি হেমচন্দ্র গোস্বামী অসমীয়া সাহিত্যে রোম্যান্টিক সুর প্রথম আনেন।

তিনিও মধুর কাছ থেকে সনেট রচনারীতি শিখেছেন। তাঁর 'প্রিয়তমার চিঠি' মাইকেল অনুসারী এবং রোম্যাণ্টিক।

চন্দ্রধর বরুয়া (১৮৭৪-১৯৬১) 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র অসমীয়া ভাষায় নাটারূপ দিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য চৌদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন নি, ব্যবহার করেছেন গৈরিশী ভাঙা অমিত্রাক্ষর।

ধীরে ধীরে মহাকাব্য রচনার যুগ শেষ হয়ে আসছে। তবু রঘুনাথ চৌধারী (১৮৭৯-১৯৬৮) কারবালার মর্মান্তিক যুদ্ধ-ইতিহাস নিয়ে ১৯২৩ সনে 'কারবালা' নামে এক মহাকাব্য লিখে ফেললেন। মধুসূদনও কারবালার যুদ্ধ নিয়ে মহাকাব্য লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে যুগের বাঙ্গালী হিন্দু তাতে সম্মতি দেয় নি।

চৌধারী মহাশয় সর্গ বন্ধে কাব্য লেখেন নি, ঘটনার নামানুসারে এক এক অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন, যেমন হাচান বধ, হুচেন বধ প্রভৃতি। কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

> যে দেবী আনন্দরূপা, বিশ্ববিমোহিনী
> মায়াময়ী মরুবালা অনন্ত বিস্তারি
> আহা কি অপূর্ব ধরিছা মোহনী রূপ।
> মানব দৃষ্টির সীমা ব্যপে যতদূর
> কেবল বালিরে ভরা দিক দিগন্তর,
> প্রস্তর কঙ্করময় মরুভূমি খালি।

মাঝে মাঝে হোঁচট খেতে হলেও কবি চৌদ্দ মাত্রা এবং তার ৮+৬ পর্ব-বিভাগ বিশ্বস্ততার সঙ্গে মেনে চলেছেন।

॥ ৫ ॥

অসমীয়া সাহিত্যের মত মণিপুরী সাহিত্যেও মাইকেল সমাদৃত। আধুনিক মণিপুরের জন্ম প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তর কালে। নতুবা মণিপুর তার প্রাচীন সাহিত্য-অনুষঙ্গ রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়েই আত্মমগ্ন ছিল।

অন্য বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই, শুধু 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কথা বলছি।

হাওয়াইবাম নবদ্বীপচন্দ্র সিং মণিপুরী ভাষায় প্রথম 'মেঘনাদবধ কাব্য' অনুবাদে এগিয়ে আসেন। তিনি ছয় সর্গ পর্যন্ত অনুবাদ করেছিলেন।

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চারিত্র ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতি অনুবাদকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল! অনেকটা আক্ষরিক অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন।

ইম্ফল জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বাবু সিং-এর মতে "The attempt is very suceessful and one of greatest success of the translator, in this respect is the use of very rich, pregnant and meaningful Manipuri language."

শ্রী এ. মীনকেতন সিং নবদ্বীপচন্দ্রের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নেন।

মীনকেতনও বিশ্বস্ততার সঙ্গে মধুসূদনকে অনুবাদ করতে চেয়েছেন। তবে তাঁর ভাষা সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে চলে গেছে।

পরবর্তী অনুবাদক ইয়োইমা সিং সমগ্র কাব্যখানি স্বতন্ত্রভাবে অনুবাদ করেন। তিনি মণিপুরী শব্দের পাশাপাশি অজস্র সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। ডঃ বাবু সিং এর মতে "The weakness in this translation is too much adherence to keeping the original blank verse and the use of too many words in the tradition of Sanskrit. There is less of flexibility here and too rigid to be true to the original text."

আর এক অনুবাদ প্রকাশ করেন শ্রী এন. ইবোবি সিং। তিনি সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য' অনুবাদ করেন।

মণিপুরী ভাষায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-ও অনূদিত হয়েছে। টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে নিয়ে যে-সব গাথা-কবিতা রচিত হয়েছে, সে সব রচনার পিছনে মধুসূদনের রচনারীতির প্রভাব আছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়েছে।

নবদ্বীপচন্দ্রই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ মণিপুরী রূপদাতা। তাঁর অনুবাদের প্রথম স্তবকটি উৎকলিত করা গেল—

> ময়োক্লবা লানকমদা, অকনবগী লুচিংবা,
> শিবা মতম চাদনা, বীরবাহু তুপ্রগা,
> হায়ু ইমা ভারতী রাঙাং খোইহী তৈরবী
> হিংচা-শাগৈ-য়াই-ওইবা, রাঘব তাথি অথোইবা,
> সেনাপতি হাপতুনা লান্দা কনা থাথিবা!

(নবদ্বীপ চন্দ্র সিংহ "মেঘনাদ তুবাকাব্য" ১ বা সর্গ)

মা/য়োক/নবা/লান/কমদা/ই/কন/বগী/লু/চিংবা
শি/বা/ম/তম/চা/দনা/বীর/বাহু/তু/ওগা
হা/য়ু/ই/মা/ভা/রতী/রা/ঙাং/খোই/ঐী/তৈ/রবী
হিং/চা/শা/গৈ/য়াই/ওই/বা/রা/ঘব/তা/খি/অ/থোইবা
সে/না/পতি/হাপ/তুনা/লান/দা/ক/না/থা/খিবা !

রাজকুমারী চন্দ্রকুমারী দেবীর কবিতা

(১)

এলে গো এলে গো আমার ভাদু জননী
আমি সন্ধ্যার পরে পেলাম রাতুল চরণ দুখানি।
বল বল কেমন আছেন কার্ত্তিক গণেশ বলো
কেমন আছেন বলো আমার সুরধনী জননী।

(২)

সায়ংকালে কুতূহলে সুরসিক নারিগনে।
ভাদু পূজার ছলে করে প্রেমব্রত উদ্দিপন।
বক্ষরত্ন বেদি পরে ঘট জুগ সংস্থাপন
পানের খিলি হাতে করে
সংকেতে সন্তি বচন
দ্বারে পশিল প্রহরি করে ভুজ প্রসারন
ভাদুর গুনগান ছলে করে মন্ত্র উচ্চারন।
গন্ধ-মধু-পর্ক ছলে আতর মৃদু হাসি
বিহরে ভাদুরে লয়ে সে সারা নিশি।

(মহারাজাধিরাজ ৺নীলমণি সিংহের কন্যা
চন্দ্রকুমারী দেবী কর্তৃক রচিত।
চন্দ্রকুমারী দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীধনীলাল সিং দেও
সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

[শ্রীমান অজিতকুমার মিত্র, এম-এ. কর্তৃক সংগৃহীত]

নির্ঘণ্ট

	পৃষ্ঠা
অক্টরলোনী (জে)	১০৪-১০৫, ১২৮, ১৩২
অক্ষয়কুমার বড়াল	১১৭
অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৭৩
অন্তর্জলী	৯০
অন্নদামঙ্গল	২৩
অমৃতবাজার পত্রিকা	২৫০
অসবর্ণ বিবাহ বিল	৪, ৬, ২৭১
আত্মবিলাপ	১১৬, ২৭১-২৭২
আনন্দচন্দ্র মিত্র	২৫১
আনন্দনারায়ণ রায়	৫৫
আবদুল লতিফ (নবাব)	১১৯
আবর্থনট (জে)	১৭১
আয়ার বার্টন পাওয়েল	১২৮
ইউরেশিয়ান	৯১, ১০৬ ১০৮, ১০৯, ১১৬, ১২০
ইণ্ডিয়ান চার্চ হিস্টরী রিভিউ	৮৬
ইলিয়াদ	২৫২-২৫৫
ইয়ং বেঙ্গল	৬৮, ৭৬, ১০৪, ১২২, ১২৫
ইয়ং মেনস্ লিটরারী সোসাইটি	১০৬
ইংলিশম্যান	৮৮
ইষ্টার্ন গার্ডিয়ান	১৩০
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২, ৩, ১১২, ১১৯
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল	৩২, ৩৩, ১১৯, ২৭৪
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৩, ৪, ৫, ১৩, ১৪, ৫১, ৬০, ৭৫, ১২২, ১৩৪, ২১২, ২১৭-২২৮, ২৬৬, ২৭৩
উড (Wood)	১৩০
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee)	৭৫, ২২৪, ২৩৪-২৪৫
একেই কি বলে সভ্যতা	৫২, ১৫৯, ১৭২-১৭৩
এথেনিয়াম	১০৪, ১০৫, ১০৬, ১১০, ১২৩, ১২৭
এমিনেন্ট ভিক্টোরিয়ানস্	১
এশিয়াটিক জার্নাল	৩২
এশিয়াটিক সোসাইটি	১৬২
এ্যাংলো স্যাকসন এণ্ড দি হিন্দু	১১৩, ১৩৭
ওবিদ	৪৭
ওয়ার্ডসওয়ার্থ	২১৬
ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন	৪৩, ৪৫, ৭৮
কপালকুণ্ডলা	৩, ১৮৩
কবি সাদী	২৩
কমলমণি	৬৪-৬৭
কবিকঙ্কন	২১৯
করিস (বিশপ)	৩৮
কাদম্বরী	২৬৫
কাম্বা রামায়ণ	১৯৫, ১৯৬, ১৯৭
কার সাহেব (Kerr)	৩৮
কার্লাইল	১৬২, ২৫৪
কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৭
কালীপ্রসাদ ঘোষ	১১০
কালীনাথ নন্দী	৭৭
কালীপ্রসাদ বসু	৫২
কালো কানুন	৪
কাশীরাম দাস	২৩, ৪০, ৮৭
কিং পোরাস	৭৮, ১০৬
কিনেট (সি)	৯২
কিশোরীচাঁদ মিত্র	৩৩, ৫৯, ৭৭, ১৫৬
কিশোরীলাল হালদার	১৫৮
কীটস্ জন	৪৪, ৪৭
কুইন ম্যাব	১৩৩
কুইন সীতা	১৪১
কৃত্তিবাস	২৩, ৪০, ৮১, ৯৫, ২১৯
কৃষ্ণকুমারী নাটক	৩, ১৩, ১৫৯-১৬০, ১৭০-১৭১
কৃষ্ণনগর কলেজ	৫৮
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৯, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৩, ৭৯-৮০, ১১৯

পৃষ্ঠা

কেনরিক (জে. আর) ১৪০
কেরী সাহেব (রেঃ উইলিয়াম) ৪৩
কৈলাসচন্দ্র বসু ৭৪
কোয়ার্টার্লি সিভিল লিস্ট ২৪৯
ক্যাপটিব লেডি ৯৭, ৯৮, ১০০, ১১০, ১১১-১১৩, ১১৪, ১১৫, ১৩৫, ২৫৯
ক্যাম্পবেল টমাস ৭
ক্যালকাটা খ্রীস্টিয়ান অবজারভার ৭০
ক্যালকাটা গেজেট ২৪৯
ক্যালকাটা রিভিউ ৩, ১৮৮
ক্যালকাটা লিটরারী গেজেট ৪১
ক্যালকাটা স্টার ৭৫

ক্রিস্টোফার ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১
ক্রিসেন্ট ১০০, ১২১, ১২২
খ্রীষ্টিয়ান ইনস্ট্রাকটার ১৩১
খ্রীষ্টিয়ান এ্যাডভোকেট ১০১
খ্রীষ্টিয়ান রেকর্ডার ১০৩
খ্রীষ্টিয়ান হেরাল্ড ৮৭

গজালু লক্ষ্মীনরসু চেট্টী ১০৩, ১০৯, ১২১, ১২৬
গডউইন মেরী ৬০
গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫, ৮৪
গীতাঞ্জলি ১১৫
গুজরাটী জ্ঞান প্রচারক সভা ১২১
গুরুচরণ দত্ত ১১০
গেজেট অব ইণ্ডিয়া ২৪৯
গোপালকৃষ্ণ ঘোষ ৩৩
গোপালচন্দ্র মিত্র ৭৬, ৭৭
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ১, ৩৩, ৩৯, ৮৪, ১১৯
গোবিন্দ রায় ২৫১
গোলাম কাদের ৭৭
গোলাম গস্ ৭৭
গৌরীচরণ ঘোষ ২১

পৃষ্ঠা

গৌরদাস বসাক ৪, ৯, ১৪, ৩৪, ৩৬, ৪১, ৫৪, ৬১, ৬২, ৭৩, ৭৫, ৮৯, ১১৯, ১৩৫, ১৪১, ১৪৬, ১৫৫, ১৫৬, ১৬১, ২০৯, ২১৭, ২২১, ২২৯, ২৭৭
গ্রে'জ ইন ২১৬, ২৩৮
গ্র্যামার স্কুল (ক্যালকাটা) ৩০, ১৩১
ঘনরাম চক্রবর্তী ২১৯
ক্ষেত্র গুপ্ত ৪৩
চণ্ডীদাস ২
চণ্ডীমঙ্গল ২৩
চন্দ্রকুমারী ২৬৩, ২৬৪, ২৬৮
চন্দ্রমোহন ঠাকুর ৭৩
চতুষ্কোণ ২৪১
চতুর্দশপদী কবিতাবলী ২৩, ২২১, ২২২, ২৩১-২৩৫
চর্য্যাগীতি ২
চার্চ ম্যাগাজিন ৭২
চিত্রাঙ্গদা ১৭৭
ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য ২৫০
জগদীশনাথ রায় ৮৯, ১১৯
জগদ্বন্ধু ভদ্র ২৫০
জন বুল ৫৯
জর্জ আন্‌ড্রি হুইলার্স ৭৬, ৭৭
জগন্নাথ শংকর শেঠ ১২০
জর্জ টমসন ৮৩
জর্জ স্মিথ ৬৮
জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জে ১৫৪
জয়দেব ২৭
জীবনচরিত ৮১
জীবনানন্দ দাশ ১১৫
জুলিয়েন জেমস কটন ১৪৫

	পৃষ্ঠা
জেমস প্রিন্সেপ	১৯৪
জ্ঞানান্বেষণ	৫২, ৫৯, ৬৭
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৩৩, ৬৩-৬৭, ৮১, ১১৯ ২৪৪, ২৪৭
টম পেইন	১৬৩
টিমথি পেনপোয়েম	৯০
টিলিয়ার্ড (অধ্যাপক)	১
টুকার	১৫৬
ট্যাসো	২২৯
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৪
ডার্বি (স্যার হামফ্রি)	৭১
ডিকেন্স চার্লস	১৫
ডিরোজিও	৩০, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৪৭, ৪৮, ৫৯, ১৩৮
ডেভিড ড্রামণ্ড	৩১, ৩৪
ডেভিড হেয়ার	৪৯, ১৬
তত্ত্ববোধিনী সভা	৩৩
তারাচাঁদ চক্রবর্তী	৭৫
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	৩, ৪, ১৭,-১৮, ৩, ২৭, ৪৬
থীরু বেঙ্কট নাইডু	১২৮
দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি	৯, ৩৭, ৩৯, ৫৯, ৭৫, ১১৯
দত্ত ও. সি	১১০
দয়ালচন্দ্র রায়	৩৩
দাদাভাই নোরজী	১২৫
দিগম্বর মিত্র	৪২, ৫০, ৫৯, ৭৫, ১১২
দীননাথ ধর	৪০
দীনবন্ধু মিত্র .	৩২, ১৮১
দুর্গেশনন্দিনী	৩, ১৮৩, ২৫৫
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী	২৫৪
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০, ১১৯
দেবেন্দ্রনাথ সেন	১৭৭
দৈবকী	৬৪, ৬৫
দ্বারকানাথ অধিকারী	৫০
দ্বারকানাথ মিত্র	২৪৫
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর	২৩৫
ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	১১, ৩৮
ধ্রুপদী	১৪৬
নগেন্দ্রনাথ সোম	৮-৯
নবীনকৃষ্ণ মিত্র	৫৮
নর্টন জর্জ	১১৫-১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২৭, ১২৮
নর্টন জন কস	১০৪, ১২৭, ১২৮
নারায়ণ স্বামী	১৫৩
নিউটন স্যার আইজাক	৬০, ১২৫
নীরেন্দ্রনাথ রায়	১২
নীলদর্পণ	১৪১, ১৫৯, ২০৯, ২৪০
নীলমণি সিংহ দেও	২৫৬-২৬৪, ২৬৮
নেটিব এসোশিয়েশন	১০৩
নেটিব সার্কুলেটর	১০১
নেলর জে. আর.	২০৭
পচাইয়াপ্পা স্কুল	১০৪, ১০৫
পদ্মাবতী নাটক	১৩, ১৭৯, ১৬৬-১৬৯
পদ্মিনী উপাখ্যান	১৭৬
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন	১০৭, ১০৬, ১১৯
পার্সিকিউটেড	
পিল্লে শ্রীনিবাস	১৩৯
পূর্বাশা	২৩৭
পুলিশ রাঘবাচারী	১৩১
পেরেন্টাল একাডেমিক ইনস্টিটিউশান	৩০
পোপ (আলেকজাণ্ডার)	৫৭
প্রবোধচন্দ্রোদয়	৩৮
প্রতাপাদিত্য চরিত	৮১
প্রমথনাথ বিশী	১০-১১

পৃষ্ঠা

প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২৪৪
প্রাণনাথ বিশ্বাস (রেবরেণ্ড) ১৩৯
প্রেসিডেন্সী কলেজ (মাদ্রাজ) ১৩০
প্যারীচরণ সরকার ৪১, ২১৭
প্যারীচাঁদ মিত্র ৩, ৩৭, ৫৯

ফার্গুসন ১৯৪
ফ্যাগান (George Smoult Fagan) ২৪৪
ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ৭৫, ১২৭

বনফুল ৬৪, ৬৭
বঙ্কিমচন্দ্র ১, ৩, ৫, ৭, ১১, ৫১, ৬০, ১৮৮, ২৪৮
বঙ্কুবিহারী দত্ত ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১,
বঙ্গদর্শন ৩, ৭,
বাইবেল ১২৪
বাইরণ জর্জ গর্ডন ৪৭, ৪৮, ৭৩, ৯০ ১৬২
বাটলার স্যামুয়েল ১২৫
বাংলা কবিতার ছন্দ ২৩৭
বিদ্যাপতি ২৩
বিপিনচন্দ্র পাল
বিবিধ প্রবন্ধ ২১৩
বিবিধার্থ সংগ্রহ ২১৩
বিশপ্‌স কলেজ ৮, ৩১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৯, ৯০, ১০৭, ১০৮
বিন্দুবাসিনী দেবী ৬৪, ৭৫
বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৭৭
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮
বীরচন্দ্র দে ৭০, ৭১
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ ১৫৯, ১৭১
বেকন স্যার ফ্রানসিস্‌ ১২৫
বেঙ্কট রয়লু নাইডু ১০৩, ১০৪, ১০৯, ১২৬, ১২৭
বেঙ্গল ডিরেক্টরী ৩০, ১৪০
বেঙ্গল থিয়েটার
বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট

পৃষ্ঠা

বেঙ্গল হরকরা ১১৪, ১৩৩, ১৩৪
বেঙ্গল স্পেকটেটার ৫৯, ৬৭
বেঙ্গল হেরাল্ড ৪৩, ৪৯
বেতাল পঞ্চবিংশতি ৪
বেথুন সাহেব ৫, ৯
বেণীমাধব বসু ৭৫
ব্রজলাল ঘোষ ৩৯
ব্রজাঙ্গনা কাব্য ১৫৯
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১, ৩২, ৮০, ২৫০
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ৮৩

ভলটেয়ার ১৬৩
ভারতচন্দ্র ২, ৩, ৪০, ১৭৬, ২১৯
ভারতী ১৮৭
ভাস্কর রামায়ণ ১৯৫
ভিশন্‌স অব দ্য পাস্ট ১৭, ৯৬, ৯৭
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৯, ৩৪, ৩৭, ৩৯, ৫৪, ৭১, ৭৪, ৭৫
ভোলানাথ চন্দ্র ৩৩, ৩৪, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৭৭, ১১০, ১৫৯, ১৮৮, ২০৯

মধুসূদন দত্ত ৩১-৩৩
মধু-স্মৃতি ৬৭, ১১৬, ১৪৭, ১৪৮, ২০৮, ২৩৭, ২৫০
মনুসংহিতা ৭৩
মনোমোহন ঘোষ ২১৫, ২২২-২২৬
মহারাষ্ট্র পুরাণ ২৭
মাইকেল-জীবনীর আদিপর্ব ৩০
মাদ্রাজ একজামিনার ৯২, ১২২, ১২৯, ১৩০
মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি ১১৮, ১১৯, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৮, ১৩৯
মাদ্রাজ ফিমেল অরফ্যান এ্যাসাইলাম ৯১, ৯৫
মাদ্রাজ সার্কুলেটার ৯০, ৯৪, ৯৬, ১০৪
মানসী ১৭৭
মাধবচন্দ্র মল্লিক ৯, ৩৫, ৬০

পৃষ্ঠা

মায়াকানন ২৬৭-২৬৭
মিশনারী হেরাল্ড ৭০
মিল্স (রেঃ এইচ) ৭৬
মিলটন ২০২
মুথুস্বামী আযার ১৩১
মুর টমাস ১, ২৯, ৩৮, ৪৭, ৪৮, ৭৩, ১৬২, ১৬৮
মৃণালিনী ৩
মেইল (The Mail) ১৩৫
মেট্রোপলিটান কলেজ ১৩৩
মেমযার্স অব মাই লাইফ এণ্ড টাইম ১৬
মেরী গডউইন ১৪৩
মোহিতলাল মজুমদার ৯-১০, ১৭৭, ১৮৩
মেঘনাদবধ কাব্য ৩, ২৩, ২৬, ২৭, ৭৯, ৪০, ১১৬, ১৫৯, ১৬০, ১৮৫-২০৪
ম্যাসন ১

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৪, ৭৫, ২১৭, ২৪৭, ২৭৩
যদুনাথ ঘোষ (রেবরেণ্ড) ৩২
যোগীন্দ্রনাথ বসু ৪-৬, ৭, ৮, ৮১

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৪
রত্নাবলী ১৪১, ১৬০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮, ১৭৭, ১৮৯, ২৩৫
রমানাথ ঠাকুর ৭৩
রমাপ্রসাদ রায ২৯, ৫১
রসিককৃষ্ণ মল্লিক ৯
রসেটি দান্তে গ্যাব্রিয়েল ১
রাইজিং সান ১০০, ১২৭
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪২
রাজনারায়ণ দত্ত ৩, ১৫৯, ২১৪
রাজনারায়ণ বসু ৩৭, ৫১, ৫৪, ৭৫, ৮৯, ১৫৪, ২১১, ২১২, ২১৭, ২২৬, ২২৭
রাজনারায়ণ দত্ত (কবি) ১১০
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৭৫, ২১৭, ২২৬
রাধাকান্ত দেব ৫২, ১০১

পৃষ্ঠা

রাধানাথ শিকদার ৩৫
রামগোপাল ঘোষ ৯, ৩৫
রামতনু লাহিড়ী ৯, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৫৯
রামনিধি গুপ্ত ১৯
রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৬২, ২১১-২১২, ২১৪
রামমোহন রায ২৯, ৫০, ৬০, ১২৫, ১৩১, ১৩৮, ১৪৯, ২৭২
রামলোচন ঘোষ ২৪৪
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায ১৫৪
রিচার্ডসন (ডি. এল.) ৩৪, ৩৫, ৪১-৪২ ৭৪-৭৫
রিজিযা ১৭, ২০, ১১৬ ১১৮, ১২৩
রিফর্মার ৬৭
রীজ সাহেব ৩৭
'রূপক' কবিতা ২৩৫
রুশো ৬০
রেবেকা ৪, ১৩, ৩১, ৩৫, ৩৮, ১০০, ১০২, ১০ , ১১১, ১৩৫-১৩৬, ১৪২-১৪৫, ১৪৯ ১৫০, ২০৭

লক (জন) ১০৯
লক্ষ্মীনারায়ণ রায ৫৫
লঙ জন (রেবরেণ্ড) ২০৭
লালবিহারী দে ১৮৯
লিটন স্ট্র্যাচি ১১
লিটরারী গ্লীনার ৪১, ৪৯, ৭৮
লিটরারী গেজেট ৭২
লেটার্স ফ্রম ইটালী ৫৭
লোক-রহস্য ১৪৬

শকুন্তলা ৭, ২৫৫
শর্মিষ্ঠা ১৪১,১৫৯, ১৬৪-১৬৬
শম্ভুনাথ পণ্ডিত ২৪১
শরৎচন্দ্র ঘোষ ২৬৬
শশধর তর্কচূড়ামণি ৭
শশাঙ্কমোহন সেন ৮-৯

	পৃষ্ঠা
শশিচন্দ্র দত্ত	১০৭
শারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২৫৩, ২৬৩
শিবচন্দ্র দেব	৩৫
শিবনাথ শাস্ত্রী	৫১, ৬০
শিশুপাঠ্য কবিতা	২৬৫
শিশিরকুমার ঘোষ	২৫০
শীতাংশু মৈত্র	১২
শেলী পি. বি.	১৩০, ১৪৩
শ্রীনিবাস পিল্লে	১২৬
শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়	৩৬
শ্যামাচরণ বসু	৭০, ৭৩
সত্যচরণ ঘোষাল	৭০
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১৩, ২২৩, ২২৬
সধবার একাদশী	৫২
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা	৫৯, ৬৭
সিমকিন্‌স এণ্ড কোং	১০৬
সীতার বনবাস	২৫৫
সুভদ্রা হরণ	২৩৫
সুশীল রায়	১৪৬
সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী	১৩৭
সুশোভন সরকার	১২
সেক্সপীয়র	৭৩
সোপেনহাওয়ের	২৬৮

	পৃষ্ঠা
স্পেকটেটর	১৩৩, ১৩৪
স্যালমন	১০৫
হরচন্দ্র ঘোষ	৩৫
হরচন্দ্র দত্ত	৩৩
হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২১২
হরিহর শেঠ	৩০
হরিশ মুখোপাধ্যায়	১১৭
হরিশচন্দ্র মিত্র	২৫১
হরিমোহন সেন	৫২
হার্বার্ট রীড	১
হিউম ডেভিড	১৩
হিন্দু কলেজ	৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৬৩, ৭২, ১২৫, ১২৯
হিন্দু ক্রনিকল	১২০-১২৩, ১২৭, ১৩৫
হিন্দু ইনটেলিজেন্সার	১১৪
হিন্দু ডিবেটিং সোসাইটি	১০৪
হিন্দু প্যাট্রিয়ট	২১৭
হেকটার বধ	২৫২-২৫৫
হেনরি পটিন্‌জার	১৪৯
হেনবিয়েটা	১৪২, ১৫০-১৫৬, ১৭৭-১৫৮, ২৪৫, ২৭০, ৭৭১
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১
হোরেস	৯৩
হ্যারিশ (লর্ড)	১৪৯